প্রকাশক :
আশীষকুমার ঘোষ দস্তিদার
বাণী পীঠ
৩৫ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
চৈত্র—১৩৬৭

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায় :
গোপাল ঘোষ
[মুদ্রক : শ্রীকৃষ্ণ প্রেস]

পুস্তক প্রকাশে সাহায্য করেছেন :
রবি বসু

বই বাঁধাই করেছেন :
খলিলার রহমান অ্যাণ্ড কোং
১৬ পাটোয়ার বাগান লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
অনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
ও
রতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯-এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

দাম : চৌদ্দ টাকা

নন্দিনী

ও

শ্রীমতী রেখা মুখোপাধ্যায়কে

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

আনন্দবাজার পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

শ্রীমোনা চৌধুরী

ভূমিকা

প্রকাশ যে, আততায়ীরা যখন হেমন্তদাকে হত্যা করার জন্য তাঁর ঘাড়ের উপর ভোজালির কোপ উদ্যত করেছিল, তখন এই আকস্মিক ও অভাবনীয় আক্রমণে বিমূঢ় হেমন্তদা বিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আমাকে মারছো কেন? আমি তো তোমাদের কোন অনিষ্ট করি নি।" মাটিতে রক্তাক্ত ও বিক্ষত দেহে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে হেমন্তকুমার বসুর মুখে এই শেষ কথা কয়টি উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু আর্তকণ্ঠের এই অন্তিম জিজ্ঞাসা কেবল হেমন্তদার নয়। এই জিজ্ঞাসা গত কিছুকাল যাবৎ সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এমন কি গত ২১শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কলকাতার আকাশবাণীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনেও এই কথা কয়টি উচ্চারিত হয়েছিল। বেদনায় নীল ও গভীর শোকে স্তব্ধ সমস্ত দেশবাসীর, বিশেষভাবে চিন্তাশীল দেশবাসীর এই জিজ্ঞাসা—'আমাকে মারছো কেন? আমি তো তোমাদের কোন অনিষ্ট করি নি।'

সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও সর্বজনপ্রিয় শ্রীহেমন্তকুমার বসুকে এভাবে হত্যা করা হতে পারে, তা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। যখন টেলিফোনে দুপুরবেলা এই খবর পেলাম, তখন প্রথমটা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। সারাদিন এবং পরের দিন রবিবার রাত্রি পর্যন্ত সারা দেহে মনে কেমন একটা অস্থিরতা, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা আমাদের বাড়ির সকলের মানসিক স্বস্তি হরণ করে নিল। কেবল আমার বাড়ির নয়, কলকাতা শহর ও শহরতলির হাজার হাজার মানুষ সেদিন রাত্রে ঘুমুতে পারে নি, একথা হলপ করে বলতে পারি। কেবল কলকাতায়ও নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে যখন এই ভয়াবহ দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো তখন লক্ষ লক্ষ নরনারী ঘটনার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতা ও বর্বরতায় একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। ঘটনাটা যতই চিন্তা করা যাবে, ততই যেন বিহ্বলতা বাড়বে। কারণ, গত ১৯৩৯ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে এবং বিশেষভাবে কলকাতায় মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত ও উপদ্রব ভয়ানকভাবে বেড়ে গেলেও এবং ইতিমধ্যে অনেক জঘন্য ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হওয়া সত্ত্বেও হেমন্তদার মত একজন দেশবরেণ্য বর্ষীয়ান নেতাকে এভাবে তাঁর দেশবাসীরাই খুন করবে,

এমন একটা নৃশংস কাণ্ডের কথা কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। যদিও রাজনৈতিক জগতে, সাহিত্যক্ষেত্রে, খেলার মাঠে, অর্থাৎ সর্বত্র কুৎসিত দলাদলি, তবু আশ্চর্য, হেমন্তদা ছিলেন এই মেছোহাটার কদর্যতার উর্ধ্বে, অথচ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে (এবং আমাদের ছোটবেলা থেকেই দেখেছি) তিনি ছিলেন আত্মসমর্পিত দেশসেবক এবং রাজনৈতিক পার্টির কর্মী ও নেতা। গান্ধীজির নৈতিক জীবনের বিশুদ্ধ আদর্শ ও আচরণের পবিত্রতা ভারতবর্ষের বহু রাজনৈতিক কর্মী ও দেশসেবককেই প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং হেমন্তকুমার বসু তথাকথিত গান্ধীবাদী না হওয়া সত্ত্বেও (বরং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুগামী ও সহকর্মী হওয়ার জন্য গান্ধীবাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সামান্যই ছিল) তাঁর চরিত্রে, আচরণে ও জীবনচর্যায় যে সারল্য, যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা এবং মাধুর্য দেখেছি, তা অনেক গান্ধীবাদীর জীবনেও দুর্লভ। বহু বছর ধরে আমি সংবাদপত্র ও জনজীবনের সঙ্গে জড়িত আছি এবং এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এমন কোন নেতা বা কর্মীর কথা খুব কমই জানি, যাঁর বিরুদ্ধে কোনও না কোন নিন্দা কিংবা চাপা কণ্ঠের কুৎসার আলোচনা না শুনেছি। কিন্তু এই দুর্নীতিদুষ্ট অধঃপতিত সমাজে হেমন্তকুমার বসু ছিলেন বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। কোন দিন কোন দুর্নীতির অভিযোগ বা কালিমার স্পর্শ তাঁর নির্মল চরিত্রে ছায়াপাত করতে পারে নি। এমনকি, হাজার রকম ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কোনও লোকের সঙ্গে ব্যবহারে কোনদিন কোন অভদ্রতা বা কর্কশতার অভিযোগ পাওয়া যায় নি। তাঁর জীবনযাপন ছিল একেবারেই সরল অনাড়ম্বর, এমনকি সাধারণ দরিদ্র মানুষের মত। এক কথায়, তাঁকে অনায়াসে ঋষিতুল্য মানুষ বলে বর্ণনা করা যায়। তিনি ছিলেন অকৃতদার, কোনপ্রকার সাংসারিক সুখসম্ভোগ এবং আরাম ও বিলাস তাঁর ছিল না। অনেক সময় এই ধরনের মানুষেরা কঠোর প্রকৃতির এবং 'একসেনট্রিক' বা বাতিকগ্রস্ত হন। কিন্তু হেমন্তদা ছিলেন ভালো মানুষ, নরম মানুষ এবং দয়ালু মানুষ। সুতরাং তিনি ছিলেন আমাদের ভালোবাসার পাত্র। অনেক নামকরা মানুষকেই শ্রদ্ধা করা যায়, কিন্তু ভালোবাসা যায় খুব কম মানুষকে। সেই স্বল্পসংখ্যক মানুষদের অন্যতম ছিলেন হেমন্তদা। কারণ, তিনি আমাদের আপন জন ছিলেন। আমার মত অসংখ্য লোকের সঙ্গে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক ছিল। তিনি যেন সকলেরই দাদা ছিলেন। এবং দাদা কোন কোন সময় তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে দূত পাঠাতেন—ছোট্ট

চিরকুট হাতে দিয়ে। সেই ছোট্ট চিরকুটে প্রায়ই লেখা থাকতো—"ভাই বিবেকানন্দ, অমুক জায়গায় একটা মিটিং আছে, তুমি গেলে ওরা খুশি হবে।" কিংবা—"এই ছেলেটিকে পাঠালুম, বেকার বিপন্ন, একটা ব্যবস্থা করতে পারো?"—আজ সেই মানুষটি আর নেই! কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁর কাছে (শ্যামপুকুরের বাড়িতে) আমাদের পাড়ার একটি ছেলেকে ছোট্ট একটু চিরকুট হাতে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম একটা চাকুরির খোঁজে। সেই ছেলেটির কাছে হেমন্তদা নির্বাচনের মুখেও বসুমতী খুলবে না শুনে খুব আফসোস করলেন এবং বললেন—"এই সময় বিবেকানন্দের লেখার প্রয়োজন ছিল।" আবার যখন হেমন্তদার সঙ্গে সেই ছেলেটির দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের কথা, তখন সেই শনিবার সকাল ১০টা ৫৭ মিনিটে হেমন্তদার দেহে জল্লাদের ছুরিকাঘাত ও ভোজালির কোপ! পরে জানা গেল সেই ছেলেটি সেই অভিশপ্ত সকালবেলা হেমন্তদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল এবং নিহত হেমন্তদার বুক পকেটের নোট বইতে তার রেফারেন্সও পাওয়া গেছে।

হত্যাকাণ্ড সর্বদাই নিষ্ঠুর ও বর্বর। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় হত্যার বর্বরতারও রকমফের আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যিনি আপসহীন সংগ্রাম করেছেন এবং সমগ্র জীবন জনগণের সেবায় (বিশেষভাবে গরিব, দুঃখী, উদ্বাস্তু ও ফেরিওয়ালা) নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন, যিনি নিষ্কলঙ্কচরিত্র ও সর্বত্যাগী এবং যিনি ৭৬ বছর বয়সের বার্ধক্যের গণ্ডীকেও পেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তেমন একজন মানুষকে প্রকাশ্য দিবালোকে উত্তর কলকাতার বুকের উপর একটি জনবহুল রাস্তায় এবং যে অঞ্চলে তিনি বহু বছর যাবৎ বসবাস করেছেন—যেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে জানতো, সেখানে তাঁকে ৭।৮ জন যুবক একযোগে অতর্কিত আক্রমণ করে কুপিয়ে মেরে ফেললো! আরও মনে রাখা দরকার ঠিক সেইমুহূর্তে তিনি অন্যত্র যাওয়ার জন্য ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিলেন—আকাশে তখন উজ্জ্বল সূর্যালোক, আর চারপাশে দোকানপাট, স্কুল ও পথচারীদের যাতায়াত—ঠিক এই অবস্থার মধ্যে বৃদ্ধ হেমন্তদাকে হত্যা করা হলো! তাঁকে কেউ আঘাত করতে পারে, তাঁর গায়ে কেউ হাত দিতে পারে, একথা কোনদিন তিনি ভাবতে পারেন নি। অতএব তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিষ্ঠুর, বর্বর আততায়ীর দল তাঁর প্রাণনাশে উদ্যত। কিন্তু কেন, কেন এই হত্যা? সুতরাং জীবনদীপ নিভে

এমন একটা নৃশংস কাণ্ডের কথা কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। যদিও রাজনৈতিক জগতে, সাহিত্যক্ষেত্রে, খেলার মাঠে, অর্থাৎ সর্বত্র কুৎসিত দলাদলি, তবু আশ্চর্য, হেমন্তদা ছিলেন এই মেছোহাটার কদর্যতার ঊর্ধ্বে, অথচ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে (এবং আমাদের ছোটবেলা থেকেই দেখেছি) তিনি ছিলেন আত্মসমর্পিত দেশসেবক এবং রাজনৈতিক পার্টির কর্মী ও নেতা। গান্ধীজির নৈতিক জীবনের বিশুদ্ধ আদর্শ ও আচরণের পবিত্রতা ভারতবর্ষের বহু রাজনৈতিক কর্মী ও দেশসেবককেই প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং হেমন্তকুমার বসু তথাকথিত গান্ধীবাদী না হওয়া সত্ত্বেও (বরং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুগামী ও সহকর্মী হওয়ায় জন্য গান্ধীবাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সামান্যই ছিল) তাঁর, চরিত্রে, আচরণে ও জীবনচর্যায় যে সারল্য, যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা এবং মাধুর্য দেখেছি, তা অনেক গান্ধীবাদীর জীবনেও দুর্লভ। বহু বছর ধরে আমি সংবাদপত্র ও জনজীবনের সঙ্গে জড়িত আছি এবং এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এমন কোন নেতা বা কর্মীর কথা খুব কমই জানি, যাঁর বিরুদ্ধে কোনও না কোন নিন্দা কিংবা চাপা কণ্ঠের কুৎসার আলোচনা না শুনেছি। কিন্তু এই দুর্নীতিদুষ্ট অধঃপতিত সমাজে হেমন্তকুমার বসু ছিলেন বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। কোন দিন কোন দুর্নীতির অভিযোগ বা কালিমার স্পর্শ তাঁর নির্মল চরিত্রে ছায়াপাত করতে পারে নি। এমনকি, হাজার রকম ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কোনও লোকের সঙ্গে ব্যবহারে কোনদিন কোন অভদ্রতা বা কর্কশতার অভিযোগ পাওয়া যায় নি। তাঁর জীবনযাপন ছিল একেবারেই সরল অনাড়ম্বর, এমনকি সাধারণ দরিদ্র মানুষের মত। এক কথায়, তাঁকে অনায়াসে ঋষিতুল্য মানুষ বলে বর্ণনা করা যায়। তিনি ছিলেন অকৃতদার, কোনপ্রকার সাংসারিক সুখসম্ভোগ এবং আরাম ও বিলাস তাঁর ছিল না। অনেক সময় এই ধরনের মানুষেরা কঠোর প্রকৃতির এবং 'একসেনট্রিক' বা বাতিকগ্রস্ত হন। কিন্তু হেমন্তদা ছিলেন ভালো মানুষ, নরম মানুষ এবং দয়ালু মানুষ। সুতরাং তিনি ছিলেন আমাদের ভালোবাসার পাত্র। অনেক নামকরা মানুষকেই শ্রদ্ধা করা যায়, কিন্তু ভালোবাসা যায় খুব কম মানুষকে। সেই স্বল্পসংখ্যক মানুষদের অন্যতম ছিলেন হেমন্তদা। কারণ, তিনি আমাদের আপন জন ছিলেন। আমার মত অসংখ্য লোকের সঙ্গে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক ছিল। তিনি যেন সকলেরই দাদা ছিলেন। এবং দাদা কোন কোন সময় তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে দূত পাঠাতেন—ছোট্ট

চিরকুট হাতে দিয়ে। সেই ছোট্ট চিরকুটে প্রায়ই লেখা থাকতো—"ভাই বিবেকানন্দ, অমুক জায়গায় একটা মিটিং আছে, তুমি গেলে ওরা খুশি হবে।" কিংবা—"এই ছেলেটিকে পাঠালুম, বেকার বিপন্ন, একটা ব্যবস্থা করতে পারো?"—আজ সেই মানুষটি আর নেই! কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁর কাছে (শ্যামপুকুরের বাড়িতে) আমাদের পাড়ার একটি ছেলেকে ছোট্ট একটু চিরকুট হাতে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম একটা চাকুরির খোঁজে। সেই ছেলেটির কাছে হেমন্তদা নির্বাচনের মুখেও বসুমতী খুলবে না শুনে খুব আফসোস করলেন এবং বললেন—"এই সময় বিবেকানন্দের লেখার প্রয়োজন ছিল।" আবার যখন হেমন্তদার সঙ্গে সেই ছেলেটির দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের কথা, তখন সেই শনিবার সকাল ১০টা ৫৭ মিনিটে হেমন্তদার দেহে জল্লাদের ছুরিকাঘাত ও ভোজালির কোপ! পরে জানা গেল সেই ছেলেটি সেই অভিশপ্ত সকালবেলা হেমন্তদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল এবং নিহত হেমন্তদার বুক পকেটের নোট বইতে তার রেফারেন্সও পাওয়া গেছে।

হত্যাকাণ্ড সর্বদাই নিষ্ঠুর ও বর্বর। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় হত্যার বর্বরতারও রকমফের আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যিনি আপসহীন সংগ্রাম করেছেন এবং সমগ্র জীবন জনগণের সেবায় (বিশেষভাবে গরিব, দুঃখী, উদ্বাস্তু ও ফেরিওয়ালা) নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন, যিনি নিষ্কলঙ্কচরিত্র ও সর্বত্যাগী এবং যিনি ৭৬ বছর বয়সের বার্ধক্যের গণ্ডীকেও পেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তেমন একজন মানুষকে প্রকাশ্য দিবালোকে উত্তর কলকাতার বুকের উপর একটি জনবহুল রাস্তায় এবং যে অঞ্চলে তিনি বহু বছর যাবৎ বসবাস করেছেন—যেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে জানতো, সেখানে তাঁকে ৭।৮ জন যুবক একযোগে অতর্কিত আক্রমণ করে কুপিয়ে মেরে ফেললো! আরও মনে রাখা দরকার ঠিক সেইমুহূর্তে তিনি অন্যত্র যাওয়ার জন্য ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিলেন—আকাশে তখন উজ্জ্বল সূর্যালোক, আর চারপাশে দোকানপাট, স্কুল ও পথচারীদের যাতায়াত—ঠিক এই অবস্থার মধ্যে বৃদ্ধ হেমন্তদাকে হত্যা করা হলো! তাঁকে কেউ আঘাত করতে পারে, তাঁর গায়ে কেউ হাত দিতে পারে, একথা কোনদিন তিনি ভাবতে পারেন নি। অতএব তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিষ্ঠুর, বর্বর আততায়ীর দল তাঁর প্রাণনাশে উদ্যত। কিন্তু কেন, কেন এই হত্যা? সুতরাং জীবনদীপ নিভে

যাওয়ার আগে একটা তীক্ষ্ন দ্যুতিময় জিজ্ঞাসা সেই আসন্ন অন্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো—"আমাকে মারছো কেন? আমি তো তোমাদের কোন অনিষ্ট করি নি!" কিন্তু হত্যাকারীর দল নিরস্ত হলো না, একজন নিরস্ত্র, নিরপরাধ, বৃদ্ধ দেশসেবকের ঘাড়ের উপর ধারালো ভোজালির কোপ বসাতে গিয়ে সেই বর্বরদের বিবেক মুহূর্তের জন্যও কাঁপলো না, এতটুকু কুণ্ঠা, এতটুকু সংকোচ তারা বোধ করলো না। দেশপ্রেমিকের রক্তে দেশের মাটি ভিজে গেল। কলকাতা শহরের সাম্প্রতিক ইতিহাস আর একবার কলঙ্কিত হলো। আর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত স্তম্ভিত দেশবাসী এই হিংস্র পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে হতবাক হয়ে গেল! কারণ, এমন ঘটনা অবিশ্বাস্য, কল্পনারও অতীত। কারণ, হেমন্তদার কোন শত্রু ছিল, এমন কথা কারুর জানা ছিল না।

কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডগুলি যেমন নৃশংসতা তেমনি কাপুরুষতারও পরিচায়ক। একজন নিরস্ত্র অসহায় লোককে পাঁচজন সশস্ত্র লোক অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা হত্যা করছে, এর মধ্যে সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা কোথায়? এর মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শের মর্যাদা কোথায়? সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—কেন এই বর্বরতা, কেন এই খুনখারাপি? বিমূঢ় হেমন্তদা মৃত্যুর আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেন আমাকে মারছো? এই প্রশ্নের তিনি কোন জবাব পেয়ে যান নি। তথাপি এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলির দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্নই বার বার হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হবে—"কেন আমায় মারছো? কেন এই খুন? আমি তো তোমাদের কোন অনিষ্ট করি নি।" বিশেষত, হেমন্তদার মত একজন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ও জনগণের মুক্তিকামীকে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন নির্বিকারচিত্তে খুন করার পর এই প্রশ্ন আরও গভীরভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্পষ্টতই মনে হয় এগুলি রাজনৈতিক খুন। কিংবা দলগত বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের খুন। কিন্তু এই খুনের রাজনীতি কি ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের বীভৎসতা ছাপিয়ে উঠে গণমুক্তির বাহন হয়ে উঠবে? কিংবা এই প্রকার 'টেরর' সৃষ্টির দ্বারা কোন পার্টি কি জনগণের মুক্তিদূতরূপে ইতিহাসে বন্দিত হবে? ব্যক্তিগত সন্ত্রাস কি আজ পর্যন্ত কোন দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন বিপ্লবের হাতিয়ার হতে পেরেছে? ব্রিটিশ আমলের বাংলা দেশ তো হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কয়েকজন সাহেব খুনের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ ঘটানো যায় না। তবু এই অন্ধ মূঢ়তা এবং এই

ছিন্নমস্তার রাজনীতি কেন? অথচ পশ্চিমবঙ্গে আজ হিংস্রতার পাগলামি চরমে উঠেছে। কিন্তু কোন সুস্থ মাথার রাজনৈতিক দল কি নির্বাচনে বাধা দেওয়ার জন্য এমন অমানুষিক কাণ্ড করতে পারে? যে কোন বালকও বুঝতে পারে যে, হেমন্তদার মত বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর একজন নেতাকে হত্যার দ্বারা জনচিত্ত জয় করা কোনমতেই সম্ভব নয়। ফলে ভোট পাওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং পার্টিগতভাবে এতে কতটুকু লাভ?

এই প্রসঙ্গে প্রশাসনের দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা দরকার এবং তা এই যে, পশ্চিমবঙ্গে আজ পুলিশ ও মিলিটারির রোশনাই চলছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই একটা প্রহসনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ, মিলিটারির টহলদারি ও পুলিশের ধরপাকড় সত্ত্বেও প্রতিদিন নৃশংস খুনখারাপি বেড়ে চলেছে। জেল থেকে কয়েদি পালানোর সংখ্যা বেড়েছে এবং সশস্ত্র প্রহরীদের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। সুতরাং কেবল প্রশাসনিক দুর্বলতা ও ঔদাসীন্যই নয়, এর পিছনে গভীর কোন মারাত্মক চক্রান্ত আছে কি? সমস্ত প্রগতিশীলতা, সমস্ত বামপন্থী আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য কোন শক্তিশালী এজেন্সি কি গোপনে গোপনে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভীষণ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের পকেটে কারেন্সি নোট, হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। অন্যথায় প্রতিক্রিয়াশীল শয়তানেরা যখন রাজনৈতিক মঞ্চে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন বামপন্থী কর্মী ও নেতারা নিহত হচ্ছেন কেন? এবং কেনই বা হেমন্তদার শেষ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে না—"তোমরা আমাকে মারছো কেন?"

আসলে এই প্রশ্ন কেবল হেমন্তদার নয়, এই প্রশ্ন গোটা ভারতীয় গণতন্ত্রের যে গণতন্ত্রকে আমরা সবাই মিলে সাবাড় করছি, অথচ নতুন গণতন্ত্রেরও জন্ম দিতে পারছি না। ফলে, অন্ধ আক্রোশে এবং বিকৃত বুদ্ধির তাড়নায় আমরা ছিন্নমস্তা রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছি। হেমন্তকুমার বসু এই ছিন্নমস্তা রাজনীতিরই নির্মম শিকার—যে ছিন্নমস্তা রাজনীতি নিয়ে বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীকৃত্তিবাস ওঝা সাম্প্রতিক কালে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর এই লেখাগুলি আমি গভীর আগ্রহ সহকারে পড়েছি। ইদানীং কালের বাংলা সংবাদপত্র জগতে এমন তীক্ষ্ণ, অথচ সরস রাজনৈতিক রচনা সত্যিই দুর্লভ—একমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীবরুণ সেনগুপ্তের রাজ্য-রাজনীতি শীর্ষক রচনাগুলির সঙ্গেই এর তুলনা দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে শ্রীকৃত্তিবাস

ওঝা একজন ছদ্মনামা সাংবাদিক। কিন্তু বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ হলেও লেখার মুন্সিয়ানায় ইনি প্রবীণদেরও দূরে সরিয়েছেন। এঁর লেখার এমন একটা বিশেষ স্টাইল ও ভঙ্গী আছে যেটা অন্য পাঁচজন বাজার চলতি লেখকের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। আসলে লেখার এই বিশেষ চরিত্রই কোন লেখকের সত্যকার শক্তির পরিচয় এবং যে লেখা পড়ামাত্র মনে হবে এটা নিশ্চয় অমুকের রচনা। কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর লেখার মধ্যে কবিতা, নাটক, উপন্যাস বা ইতিহাসের যে সমস্ত উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, সেগুলি তাঁর রচনাকে একটা নতুন স্বাদে ও রসেই পূর্ণ করে তোলে না, পাঠকদের কাছে একটা নতুন কৌতুহলের রহস্যদ্বারও খুলে দেয়। অথচ লেখাগুলি বাঙ্গালীসুলভ উচ্ছ্বাসে ভরা নয়। বরং উচ্ছ্বাস ও ফেনার বদলে আছে নতুন নতুন অজানা বা ভুলে যাওয়া তথ্য, ঘটনাপঞ্জী এবং সেগুলির ঘাত প্রতিঘাত জনিত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের জগতে কৃত্তিবাস ওঝা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। যে নক্ষত্রের আলো দেখতে পাওয়া যাবে হেমন্তদার সম্পর্কে লিখিত এই অপূর্ব পুস্তকটিতে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এবং গরীব ও বঞ্চিত মানুষদের সংগ্রামে হেমন্তকুমার বসুর গৌরব-জনক ভূমিকা ইদানীং কালের অনেকেরই জানা নেই, জাতীয়তা ও বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় হেমন্তদার অবদানের কথাও আমরা অনেকেই মনে রাখিনি। কৃত্তিবাস ওঝা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন স্বদেশী যুগের আশ্চর্য জাতীয় জাগরণ থেকে যুক্তফ্রণ্ট আমলের ভাঙ্গা হাটের রাজনৈতিক মারামারি পর্যন্ত সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও অধিক কালের ইতিহাসের কথা, যে ইতিহাসের সঙ্গে হেমন্তদার ৭৬ বছরের জীবন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। কিন্তু দেশের জন্য দশের জন্য উৎসর্গীকৃত এই সর্বত্যাগী মানুষটিকে আমরা যেভাবে খুন করেছি, একদিন সেই রক্তের মূল্য দিতে হবে, কেবল শহীদ বেদী তৈরি করে সেই মূল্য শোধ করা যাবে না। শ্রীকৃত্তিবাস ওঝা তাঁর বইতে এই সাদা কথাটি শেষ পর্যন্ত স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁর লেখা সার্থক।

ইতি—

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

The Tribute of A Friend's Tear

I was shocked that fateful morning to hear of the murder of Sri Hemanta Kumar Bose. I was shocked, and I have not been able yet in this lapse of time to get over this shock. He is one among many in the crop of murders that has adorned the tale of our social and political life these last many months. These murders, stabwounds, and bombs and pistol shots are shocking, and equally shocking are the sanctimonious hypocrisies which as prologues and epilogues encumber this gruesome drama.

For full fifty years Sri Hemanta Kumar Bose has been synonymous with political North Calcutta. When he died he strode on the all-India political scene as chairman of the All India Forward Bloc, but in essence and in spirit, the hard core has always been North Calcutta.

During the latter half of the first world war he had seen war fronts and fighting in Bosra and Mesopotamia. He came back to India in 1920-21, and found India in ferment. The country from end to end was convulsed with a mighty upheaval. He threw himself into the non-cooperation struggle and that was the beginning of a life-long devotion to and since in the country's struggle for freedom. The immediate leadership in North Calcutta was offered by Dr. Indra Narayan Sengupta, Sri Amar Bose, Sri Suresh Majumdar and Sri Makham Sen. That was the story of a life long comradeship. Since then he has been in it, and there has been no break in his service. There has often been a shuffle of group loyalties, but his service of the country know no break. In the mid-twenties Hemanta Babu found himself under the bannar of what was known as Sri J. M. Sengupta's faction in Bengal political life. He was a driving force in Karmi Parishad led by Sri Amarendranath Chatterjea. His most

fruitful association with Netaji Subhas Chandra Bose was in 1928, when Netaji was G. O. C. of the militant Bengal Volunteers, and Hemanta Bose was one of the Chief Officers. That comradeship was deep and abiding. Deshbandhu was no more. J. M. Sengupta was no more. Netaji Subhas Chandra Bose found himself in combat against an array of the All-India Congress High Command. The Simon Commission, the Round Table Conference, the Gandhi-Irwin Pact, and then, the Civil Disobedience movement (1930—34) infused a new life into our struggle and made the national pulse throb quicker. The motive power and the driving force now is Netaji Subhas Chandra Bose. Sri Hemanta Kumar Bose was in the thick of the fight, in the servied rank behind Netaji. Step by step, Hemanta Babu was in the "Rebel" B.P.C.C. and in the Forward Bloc. Only after the War was over did Hemanta Babu find himself for a spell in the Congress and under the leadership of Dr. B. C. Roy.

As of common sense, the common man is almost everywhere amazingly uncommon. Sri Hemanta Kumar Bose has no purple patches, no meteric brilliance. Rupert Brooke has a famous phrase—"the long littleness of life", and in Hemanta Babu, this "long littleness", is nowhere really little. He possessed astounding qualities as self-confidence, impulse for all ventures and heroic deeds, strength, courage, a go-ahead spirit, and power for practical execution and leadership in all persuits. He was the most well-behaved political friend I have ever meet with. He never suffered from a sickly cast of thought but ever went ahead. Languor was not in his heart, weariness not on his brow. He is always at his post. He was at his post till the last breath. To him I owe the tribute of a tear, not a drop for a dazed moment, but rivers of tears. Bengal has lost a devoted angel.

It must be conceded that this mad orgy of destruction is primarily a social, economic, political and administrative problem, and only secondarily a law and order question. The

bunch of people who pretend to rule and lead may talk endlessly and mellifluously, and get on playing with the problem. For the citizen it is a world of mere shreds and patches. To-day around him there is no will but what is revengeful, and an order that is far from beneficent. The common man is floundering in a meaningless context. He is asphyxiating. We do not live, we exist only by flying from overselves. Common man, if he is to live, must dare to become more than life-size.

To Hemanta Kumar Bose, the tribute of a friend's tear. May he stand yet as the unwearied sentineal of our afflicted people.

Satya Ranjan Baksi

প্রারম্ভ

যে ভদ্রলোক গোটা জীবন মানুষের উপকার করে গেলেন, যে মানুষটি মানুষের দুঃখ দেখলে কেঁদে ফেলতেন সেই লোককে ছুরির আঘাতে প্রাণ দিতে হল। অচেনা অজানা কোনও এলাকায় নয়, খোদ শ্যামপুকুরে—যেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁকে চিনতেন, শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন। ঘাতকের ছুরির আঘাতে শ্যামপুকুরের রাস্তায় হেমন্তদার দেহ লুটিয়ে পড়েছে, এ দৃশ্য ভাবাও যায় না। কলেজে যখন পড়ি তখন থেকেই হেমন্তদার সঙ্গে আমার পরিচয়। চিনতাম তারও আগে থেকে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। ট্রামে মাঝে মধ্যে দেখতাম তাঁকে। সঙ্গীরা বলত, ওই দেখ হেমন্ত বোস, অত বড় নেতা কিন্তু সব সময় সেকেণ্ড ক্লাসে চড়েন। কলেজে পড়ার সময়ও অনেকদিন দেখা হয়েছে ট্রামে, সেই সেকেণ্ড ক্লাসে। ওঁকে দেখে অনেকেই উঠে দাঁড়াতেন আসন ছেড়ে; অনেকেই বলতেন, আসুন হেমন্তদা, এখানে বসুন। হেমন্তদা সবাইকে বলতেন, না, না, তোমরা উঠবে কেন? একটা সিট পেয়েছ, বস। আমি দাঁড়িয়েই যাব, এই তো এত লোক দাঁড়িয়ে। কতটুকু বা রাস্তা। এক-আধ মাইল রাস্তা হলে হেমন্তদা হেঁটেই চলে যেতেন। সাদামাটা ঢিলেঢালা খদ্দরের জামা-কাপড় পরতেন। নিজের জামা-কাপড় নিজেই রোজ কাচতেন। তেলেভাজা আর মুড়ি খেতে খুব ভালবাসতেন।

নেতাজীর জন্মোৎসব কমিটিতে কাজ করতে গিয়ে প্রথম ঘনিষ্ঠভাবে হেমন্তদার সংস্পর্শে আসি। প্রায়ই সকালে যেতাম তাঁর রাজবল্লভ পাড়ার বাড়ীতে। গিয়েই দেখতাম ঘর ভর্তি লোক। একখানা কাঠের চেয়ারে হেমন্তদা বসে। সামনে চৌকিতে মহিলারা। বাইরে দাঁড়িয়ে পুরুষরা। হেমন্তদা একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করতেন, কী ব্যাপার, কী হয়েছে? যে যার নিবেদন জানাতেন। কারু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য চিঠি চাই, কারুর বা চাকুরির জন্য চিঠি চাই, কারুর স্কুলে বা কলেজে ফ্রীশিপের জন্য চিঠি চাই, কারুর বা স্রেফ ক্যারেকটার সার্টিফিকেট চাই। হেমন্তদা সবাইকে চিঠি লিখে দিতেন। দূর দূরান্ত থেকে আসতেন সবাই। অধিকাংশকেই চিনতেন না। যিনি যেমন বলতেন উনি কিন্তু তাঁকে তেমনিই লিখে দিতেন। প্রথম

প্রথম অন্যদের জিজ্ঞেস করতাম ব্যাপারটা, তারপর একটু ঘনিষ্ঠ হতে নিজেই জিজ্ঞেস করেছি ওঁকে—আচ্ছা হেমন্তদা, এই যে সবাইকে লিখে দেন অনেককে তো আপনি চেনেন না, জানেন না, আপনাকে মিথ্যে বলে যদি লিখিয়ে নিয়ে যায়? হেমন্তদা হাসতেন; বলতেন—চেহারা দেখে বোঝ না ওরা সব গরীব লোক। কার কাছে যাবে বল, কার কাছেই বা যাবে এই শহরে। কে চিঠি লিখে দেবে। ওদের তো আমি পয়সা দিয়ে উপকার করতে পারছি না। যদি সার্টিফিকেট দিয়ে, চিঠি লিখে দিয়ে কিছুটা উপকার করতে পারি তাহলেই যথেষ্ট। আর তোমরা বোঝ না, সবাই যদি বলে না চিনলে চিঠি দেব না তাহলে তো সাধারণ গরীব মানুষ চিঠি আর সার্টিফিকেট যোগাড়ই করতে পারবে না।

মাঝে মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে এগোতাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে হেমন্তদার সঙ্গে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে। প্রায়ই দেখতাম ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম পড়ছে। হেমন্তদা চিনতে পারতেন না অনেককেই। জিজ্ঞেস করতেন—তুমি! প্রায়ই জবাব শুনেছি, সেই যে আপনি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, চাকরিটা হয়ে গিয়েছে। এখন চাকরি করছি। হেমন্তদা সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন—বেশ, বেশ, ভাল ভাল। অথবা জবাব শুনতাম, সেই যে আপনি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, টি. বি. হাসপাতালে একটা সিট পেয়েছিলাম, সেরে এসেছি। হেমন্তদা একই জবাব দিতেন—বেশ বেশ, ভাল ভাল। কারু টি.বি. হয়েছে শুনলেই তিনি ভীষণ কাতর হয়ে উঠতেন। বলতেন বাড়ীর আর সবাই দু'কোয়া করে রসুন খাবে। ওটা সস্তায় ভাল প্রতিষেধক। শেষ দিকে দু-একবার বিপদে পড়েছিলেন অচেনা লোককে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিয়ে।

তারপর থেকেই নিয়ম করে দিয়েছিলেন, চেনা কেউ সঙ্গে না নিয়ে এলে বা লিখে না দিলে অচেনা লোককে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দেবেন না। চাকুরির চিঠি লেখা, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্যে চিঠি দেওয়া তিনি কোনদিনই বন্ধ করেন নি। মন্ত্রী হয়েও হেমন্তদা এ জিনিস বন্ধ করতে পারেন নি। পার্টি থেকে বলেছিল, এখন আর ওভাবে সবাইকে চিঠি দেবেন না, ওটা বন্ধ রাখুন। হেমন্তদা কিন্তু তাতে রাজী হননি। সেই এক জবাব দিয়েছিলেন, ওরা গরীব মানুষ, ওদের দেখবে কে?

উনি যখন মন্ত্রী তখন মাঝে মধ্যে রাইটার্সে যেতাম ওঁর ঘরে। একই দৃশ্য। সকলেই আবেদন নিয়ে এসেছেন হেমন্তদার কাছে। কাউকে ফেরাতেন না,

সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। হুকুম ছিল—যে আসবে ঘরে ঢুকতে দেবে। কাউকে আটকাবে না। মাঝে মধ্যে তাই অসুবিধা হত অফিসারদের। তাঁরা ঘরে ঢুকে দেখতেন, ঘর বোঝাই লোক। মন্ত্রীর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগই পেতেন না।

একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল রাইটারসে। ঘর ভরতি লোক, এই সময় বিভাগীয় সেক্রেটারী একটা জরুরী প্রয়োজনে ফোন করলেন হেমন্তদাকে, বললেন, স্যার একটু কনফিডেনসিয়াল কথা ছিল আপনার সঙ্গে। হেমন্তদা জবাব দিলেন, তাইত, ঘরে যে অনেকে আছেন!—খুবই জরুরী? সেক্রেটারী বললেন—হ্যাঁ স্যার। হেমন্তদা নিজেই উঠে গেলেন সেক্রেটারীর ঘরে। দু'একজন আমাকে বললেন ঘটনাটা দু-তিনদিন পরে। আরও অনুরোধ জানালেন, তুমি একবার হেমন্তদাকে বল, এটা ভাল দেখায় না—মন্ত্রী কখনো অফিসারদের ঘরে যান না। আমি একদিন একা পেয়ে হেমন্তদাকে বললাম কথাটা—হেমন্তদা, যারা আপনার ঘরে ছিলেন তাঁদেরই একবার বললে পারতেন উঠে যেতে, আপনি কেন উঠে গেলেন? হেমন্তদা হাসলেন: তোমাদের সব অদ্ভুত কথা। আমার ঘরে লোক এসেছে, আমি তাদের উঠে যেতে বলব। তা হয় নাকি। ওরা সব গরীব লোক, কত আশা করে এসেছে। আর কি হয়েছে সেক্রেটারীর ঘরে গিয়েছি তো, তোমরা বড় বেশী বাজে নিয়ম-কানুন নিয়ে মাথা ঘামাও; সবাই তো মানুষ।

সেই হেমন্তদা মানুষের হাতেই প্রাণ দিলেন। —ইতি

বরুণ সেনগুপ্ত

নিবেদন

হেমন্তদা মারা গেলেন। আততায়ীর হাতে নির্মম ও নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হলেন হেমন্তদা। হাসপাতালে দেখতে যাইনি। মর্গেও যাইনি। মহাজাতি সদনেও না। দেখলাম—সহস্র-সহস্র মানুষের চোখের জলে যখন তিনি শেষ বিদায় নিচ্ছেন। না—তাঁর মরদেহবাহী লরিতে নয়, লরির কাছেও নয়। অনেক দূরে—ভীড়ের মধ্যে—হেঁটেছিলাম মিছিলের সঙ্গে। হেমন্তদার মৃতদেহ দেখিনি—দেখতে চাইনি, দেখতে পারিনি। শুধু দেখেছিলাম ফুলে ফুলে ঢাকা তাঁর দেহটিকে।

দশদিনে লেখা শেষ করেছি বইখানি। হেমন্তকুমার বসুর জীবন একজন রাজনৈতিক নেতা বা স্বাধীনতা আন্দোলনের অক্লান্ত যোদ্ধা, নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী,—এইসব কথা মনে রেখেই চেষ্টা করেছি গত প্রায় সত্তর বৎসর যে রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে হেমন্তকুমার বসু নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ধারাটি তুলে ধরতে। এই প্রায় সত্তর বৎসরের বাংলাদেশের,—পরবর্তীকালে খণ্ডিত বাংলার,—রাজনৈতিক ইতিহাস—সে সন্ত্রাসবাদীই হোক, গান্ধীবাদীই হোক অথবা সংসদীয়ই হোক—তার সঙ্গে হেমন্ত বসুর সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ এবং যে জীবনের শেষ হল রাজ্য-রাজনীতির নূতন ধারা ছিন্নমস্তা রাজনীতির মধ্যে। সত্তর বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাসের মালায় হেমন্তকুমার বসু ছিলেন একটি ফুল—আমি সেই মালাটিকেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছি—বিচ্ছিন্নভাবে ফুলটিকে নয়।

মাত্র দশদিনের মধ্যে বইটি শেষ করাতে অপরিমিত ত্রুটি থেকে গেছে। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে ত্রুটিগুলি সংশোধনের চেষ্টা করব। সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি হেমন্তকুমার বসুর অনেক অনুরাগী সহকর্মী, বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে। সকলের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইতি—

কৃত্তিবাস ওঝা

যে সমস্ত পত্রপত্রিকা এবং পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :—

বিপ্লবের সন্ধানে—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান—ভগৎরাম তলওয়ার
India wins Freedom—আবুল্ কালাম আজাদ
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র—নেপাল মজুমদার
পত্রাবলী—সুভাষচন্দ্র বসু
আত্মচরিত—জওহরলাল নেহরু
ব্যাঘ্র কেতন—হিউ টয় (সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত)
স্মৃতিকথা—মৃণালকান্তি বসু
মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ—অনন্ত সিংহ
আমি সুভাষ বলছি—শৈলেশ দে
Cross Roads—সুভাষচন্দ্র বসু
আনন্দবাজার পত্রিকা—কংগ্রেস সংখ্যা
মৃত্যুঞ্জয়ী—মহাজাতি সদন হইতে প্রকাশিত
দৈনিক বসুমতী—সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা
জয়শ্রী—লীলা রায় জন্মবার্ষিকী সংখ্যা (১৩৭৫)
বিপ্লবের কিছু কাহিনী—ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়
যুক্তফ্রন্ট বিরোধী ষড়যন্ত্রের ইতিহাস—সমীক্ষা পরিষদ প্রকাশিত
সপ্তাহ—সাপ্তাহিক পত্রিকা
দেশ—সাপ্তাহিক পত্রিকা
আনন্দবাজার পত্রিকা
যুগান্তর পত্রিকা
কালান্তর পত্রিকা
গণশক্তি পত্রিকা
নেতাজী—অরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—জীবনকৃষ্ণ হালদার
ফরোয়ার্ড ব্লক ও তার যৌক্তিকতা—সুভাষচন্দ্র বসু

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর
অধিনায়ক হেমন্তকুমার বসু

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায়, কংগ্রেস সভাপতি পদত্যাগ ক'রে বেরিয়ে আসছেন, পাশে হেমন্তকুমার বসু।

রামগড়ে অনুষ্ঠিত ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে আপোষবিরোধি সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু।
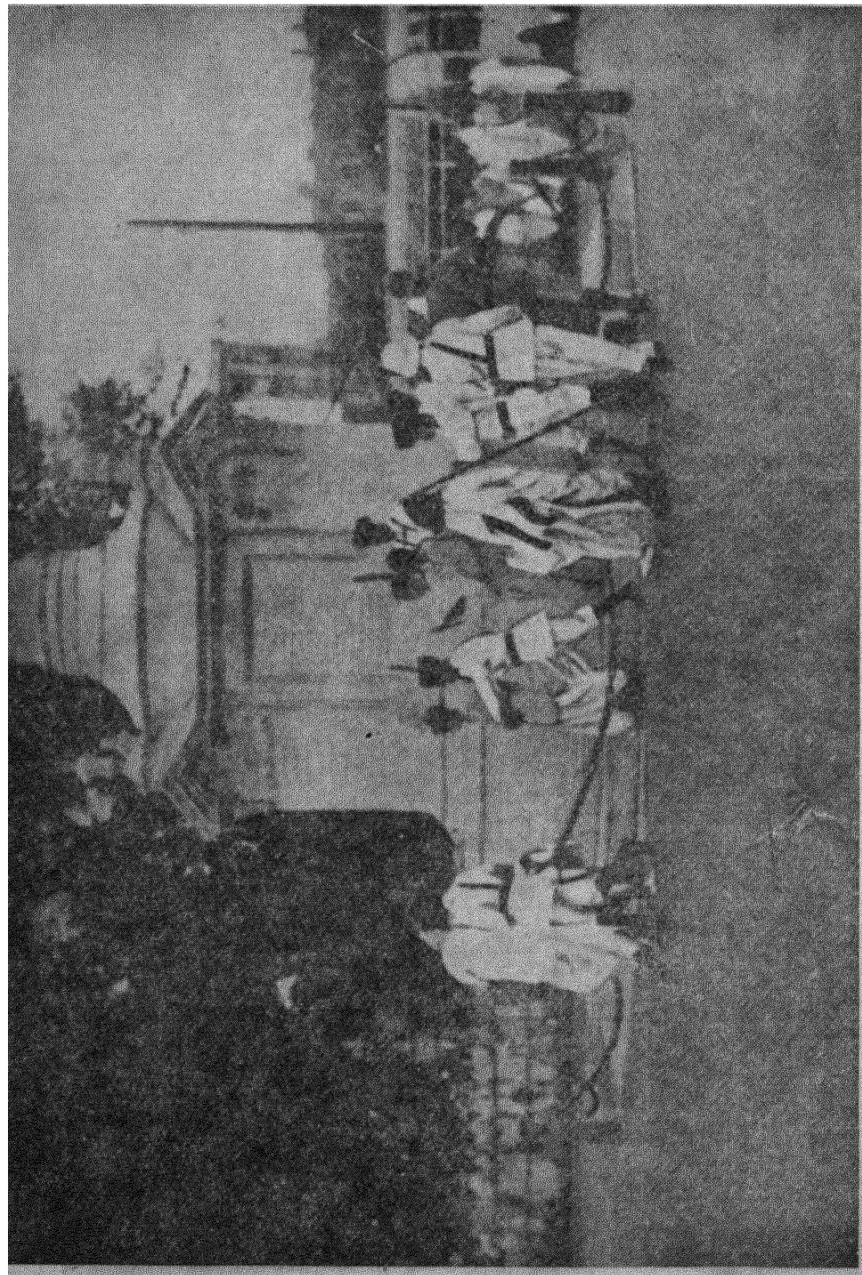
১৯৪০ সাল, জুলাই, হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকদের পুলিশ গ্রেপ্তার করছে

১৯৪৯ সালে, কংগ্রেস থেকে পদত্যাগের দিন এক অনুষ্ঠানে গৃহিত চিত্র। পিছনে লেখক।

বিধানসভা ভবনের লবিতে রাজ্যের খাদ্য সংকট মোচনের দাবিতে অনশনের পর লেবুর রস পান ক'রে অনশন ভঙ্গ করছেন হেমন্তকুমার বসু ; পাশে বসে আবাল্য সুহৃদ. অমরবসু, ডাঃ নারায়ণ রায়, অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ, নিখিল দাশ, ভক্তি মণ্ডল, যামীনি সাহা প্রমুখ।

রাজভবনে রাজ্যপাল শ্রীমতি পদ্মজা নাইডুর কাছে
মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করছেন শ্রীহেমন্তকুমার বসু।
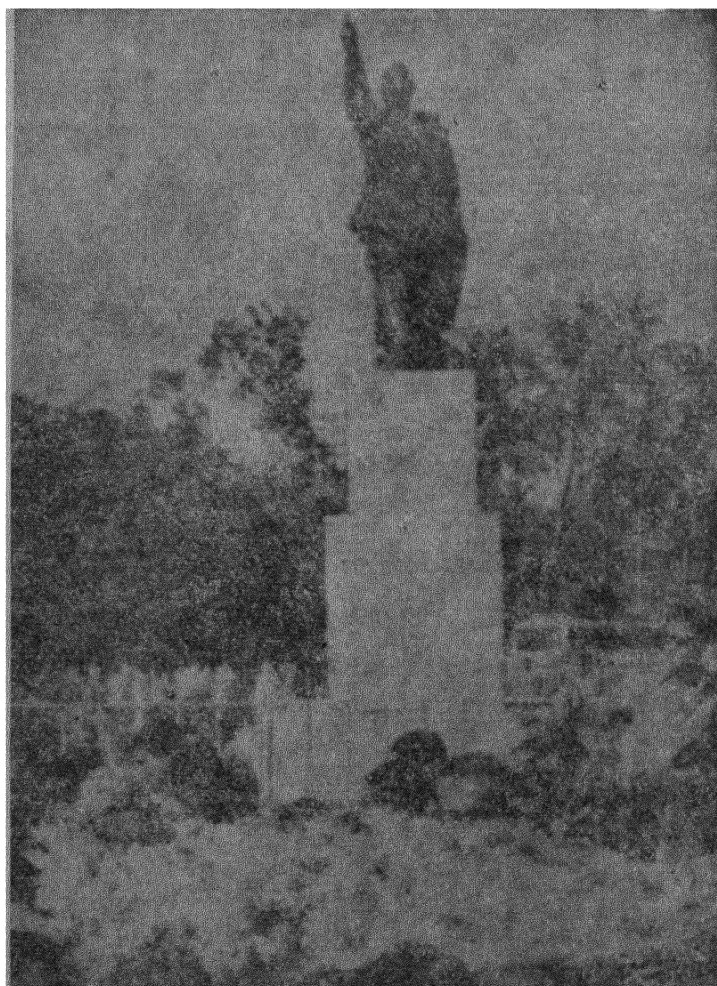
বিদায় নেতাজী বিদায়! ময়দানে নেতাজীর মূর্ত্তির পাদদেশে
গুরুশিষ্য দুজন অপলক।

বিদায় নেতাজি ভবন থেকে।   নেতাজি ভবনের সামনে, হেমন্ত বসুর মরদেহে মালা দিতে গিয়ে, সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ, সুরেশচন্দ্র বসু কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

জননেতার শেষ বিদায়। জনপথে লক্ষ জনতা এগিয়ে চলেছে, জননেতার মরদেহ নিয়ে।
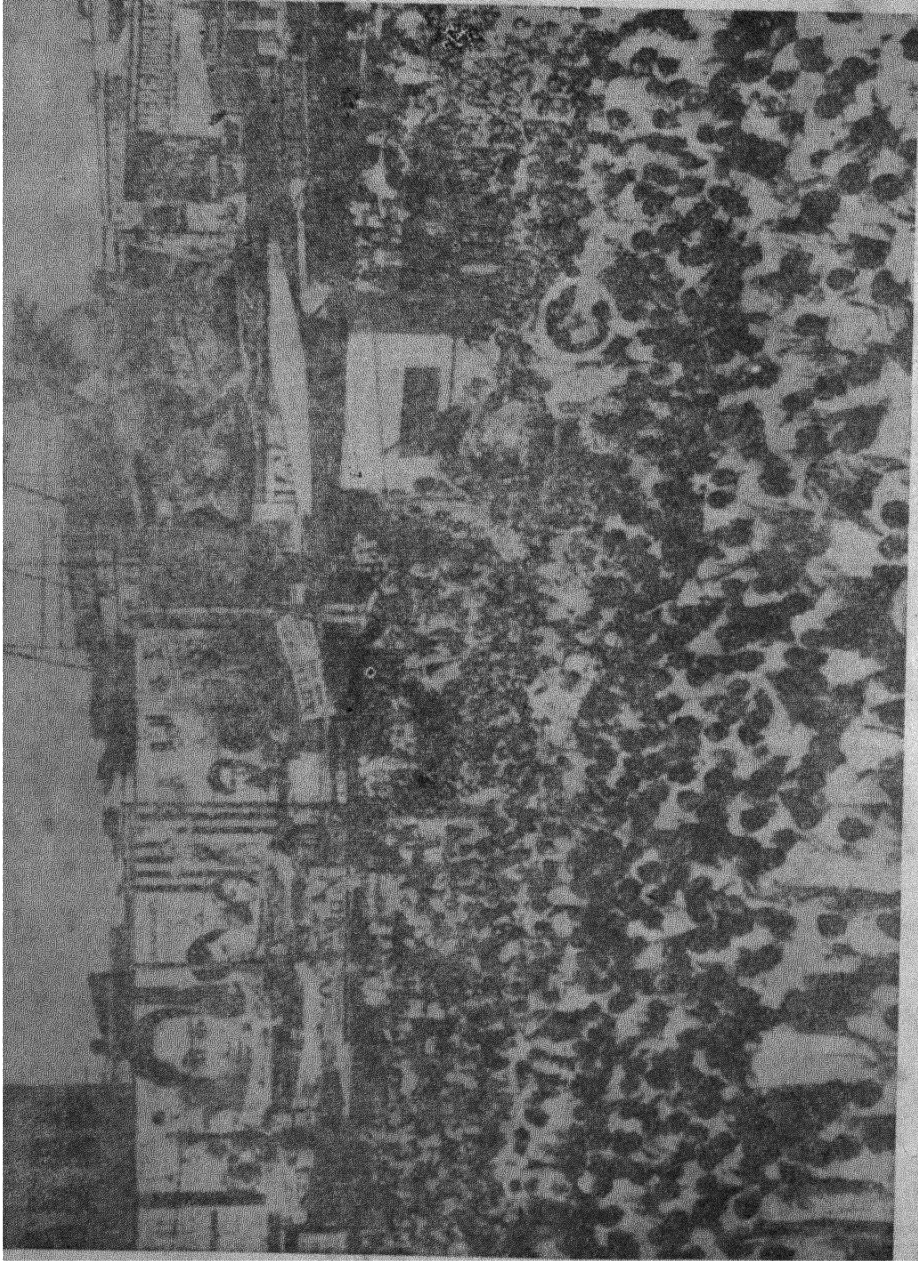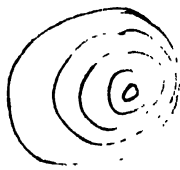
"আমাকে তোমরা মারছ কেন, আমি তো কারও ক্ষতি করিনি"। আততায়ীর ভোজালী, তলোয়ার, আর পাইপগানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে শেষ প্রশ্ন করলেন, নির্ভীক-নির্ভয়-অজাতশত্রু, নেতাজীর অন্তরঙ্গ সহকর্মী, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা হেমন্তকুমার বসু। শেষ প্রশ্নের জবাব আততায়ীরা দিতে পারে নি। জবাবের পরিবর্তে নেমে আসে ভোজালী ও তরবারীর নিষ্ঠুর আঘাত। হেমন্ত বসুর কণ্ঠ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি দিয়ে কণ্ঠে আঘাত করা হয়, পাইপগানটা বুকের ওপর চেপে ধরে অগ্নিশিখায় বিদীর্ণ করা হয় বক্ষপঞ্জর। অকুতোভয় আপোসবিরোধী সংগ্রামের নায়ক ঘাতকের উদ্যত তরবারীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে চিৎকার করেন নি, 'আমায় বাঁচাও' বলে করুণা ভিক্ষা করেন নি নিজের জীবন রক্ষার জন্য। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ প্রশ্ন করেছেন—"আমাকে তোমরা মারছ কেন?" গুপ্তঘাতকদের প্রশ্ন করেছেন, 'যে কখনও কারও ক্ষতি করে নি, সে মরবে কেন?' কিন্তু ভোজালীর নিষ্ঠুর আঘাত, গুপ্ত-ঘাতকের উদ্যত হাত থামে নি। ভোজালীর আঘাত নেমে আসে কণ্ঠে, বুকে। মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে শেষ আঘাত হানা হয় তরবারীর। তবুও নিশ্চিন্ত নয় গুপ্তঘাতক, সারাজীবন শত নির্যাতন ভোগকারী হেমন্ত বসু এত আঘাতের পরও যদি বেঁচে ওঠেন, তাই পাইপগানের গুলি।

২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ৩৪নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটে মিত্তিরবাড়ীর সামনে জননেতা জননায়ক নিঃশত্রু হেমন্তকুমার বসু গুপ্তঘাতকের হাতে হত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ লেনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে আসছিলেন, যাবেন কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের

সভায় যোগদান করতে। মিত্তিরবাড়ীর সামনে ট্যাক্সিতে উঠতে যাবেন ঠিক সেই সময়েই একদল আততায়ী ট্যাক্সি ঘিরে ফেলে, তারপর আঘাত। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর এলাকায় নিজের বাস-ভবনের কাছে দীর্ঘদিনের চলার পথে আততায়ীর ছুরির আঘাতে নিহত হলেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ দিনের চলার পথ তাঁরই বুকের রক্তে লাল হল। জনতার নেতা হেমন্ত বসু জনপথে প্রাণ দিলেন। সেই পথ, যে পথে ১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদ জানাতে প্রথম মিছিল করেছিলেন, যে পথে দাঁড়িয়ে শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দিন বুকে শোকচিহ্ন ধারণ করেছিলেন, যে পথে দাঁড়িয়ে অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের গ্রেপ্তারের পর পিকেটিং করে গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন, যে পথে দাঁড়িয়ে ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পর পথসভা করে বাংলাদেশের পথসভায় প্রথম গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন, যে পথে দাঁড়িয়ে অজস্রবার পুলিশের লাঠি ও অত্যাচার মাথা পেতে নিয়েছেন, যে পথে দাঁড়িয়ে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন, বঙ্গ-বিহার' সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন এবং সর্বশেষে ১৯৬৭ সালে ও ঘোষ মন্ত্রিসভা বাতিলের পর গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব করে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। যে পথে শত শত আন্দোলনে দেশ-জাতি-জনতাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই পথে দাঁড়িয়েই প্রাণ দিলেন হেমন্তকুমার বসু। যে মানুষ সমস্ত জীবন পথের মানুষকে সবচেয়ে ভালবেসেছিলেন, সমস্ত জীবন সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য সংগ্রাম করেছেন, পথের মানুষের দুঃখে কেঁদেছেন, আনন্দে হেসেছেন, যে পথে চলার সময় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অগণিত মানুষ তাঁকে প্রণাম করতেন, শ্রদ্ধা জানাতেন, ভালবাসতেন, সেই পথেই হেমন্ত বসুর দেহ ঘাতকের ছুরির আঘাতে লুটিয়ে পড়ল।

শ্রীমোহনলাল চ্যাটার্জী সেই মুহূর্তের বর্ণনা দিয়ে বললেন, "হেমন্তদাকে ট্যাক্সিতে তুলতে যাব, এমন সময় আট-দশজন যুবক

ভোজালী হাতে ট্যাক্সি ঘিরে ধরে, তারপর একটি বোমা ফাটায়, চালককে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তারা আমাকে ভোজালী দিয়ে মারতে আসে, আমি পিছিয়ে যাই। তারপর তারা হেমন্তদাকে উপর্যুপরি ভোজালী মারতে থাকে।" শ্রী চ্যাটার্জীর জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ ছিল। রক্তের দাগ জামা কাপড় ও দেহের নানা স্থানে ছিল কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীঅজয় দেরও। ঘটনার বিবরণ দিয়ে হাউ হাউ করে তিনি কেঁদে ফেললেন। কান্নাচাপা কণ্ঠে তিনি জানালেন, "ওরা হেমন্তদার গলা কেটে দিল। হেমন্তদা বললেন, 'আমায় মারছ কেন—আমি তো কারও ক্ষতি করিনি!' ভোজালী মারবার পর হেমন্তদা হাঁ করলেন। আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তারপরই পড়ে গেলেন। হেমন্তদার শেষ কথা আর বলা হল না।

এরপর আর জি কর হাসপাতাল। সেখানে প্রবল উত্তেজনা ও শোকাবহ পরিবেশ। অগণিত মানুষ হাসপাতালের সামনে সমবেত, তাদের অনেকে উত্তেজিত। সমবেত জনতার চোখে জল। কেঁদে ফেললেন অনেকে, অনেকে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। এর আরও কিছু পরে এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে কিউ পড়েছে—তাঁরা শ্রদ্ধা জানাতে গেছেন হেমন্তদাকে। অনেকের বুকে কালো ব্যাজ, কারও কারও হাতে জাতীয় পতাকা, অন্তিম শয়নে হেমন্তবাবু। যিনি দেখছেন তিনিই শিউরে উঠছেন। চোখ ঢাকছেন—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন কেউ কেউ। এমন কি ফরোয়ার্ড ব্লকের চিত্ত বসুও। সকলের এক কথা, পার্টির লোক হয়েও হেমন্তবাবু কোন পার্টির লোক ছিলেন না, যে তাঁর কাছে গিয়েছে তাকেই সাহায্য করেছেন তিনি। আমরা কোথায় বাস করছি! এখনও কি জঙ্গলের রাজত্ব চলছে।

বিকাল সওয়া পাঁচটা নাগাদ একটি গাড়ীতে শ্রী বসুর দেহ তোলা হল। সেখান থেকে বিরাট শোক-মিছিল শ্যামবাজার পাঁচমাথায়

গিয়ে থামল, গাড়ীতে ফরোয়ার্ড ব্লকের অর্ধনমিত পতাকা, ফুলে ঢাকা মৃতদেহ। মুখ দেখা যাচ্ছিল, সেই মুখে যেন বিশ্রামের প্রশান্তি। আগেই দোকানপাট বন্ধ, যানবাহন বন্ধ। রাস্তার পাশের বাড়ী, কোন ছাদ ফাঁকা ছিল না, সকলেই শ্রদ্ধেয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে অপেক্ষমান। এদিকে পায়ে হেঁটে অজাতশত্রু নেতার অসংখ্য অনুরাগী কালো ব্যাজ পরে স্লোগান দিচ্ছেন—'স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনা হেমন্ত বসু—অমর রহে'। মিছিল বিধান সরণি ও অরবিন্দ সরণি হয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে পড়লো। তারপর সোজা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। তারপর ময়না তদন্ত। রাত সাড়ে নটার পর ময়না তদন্তের মৃতদেহ নিয়ে আবার মিছিল বের হল। এবার মহাজাতি সদনের দিকে। সারা রাত মহাজাতি সদনে। (আনন্দবাজার, ২১শে ফেব্রুয়ারী)

মহাজাতি সদনের সামনে শোকাহত জনতার মধ্যে যখন আজ রাতে হেমন্তদাকে আনা হল, তখন তাঁর মুখে এক বেদনার্ত আশ্চর্য হাসি। ফ্লাড লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত তাঁর মুখ—তিনি যেন বলছেন, "আমি ভাল হয়ে গেছি, মানুষ ডাকলে আমি যাব না।" ইদানীং শরীর তাঁর ভেঙ্গে পড়েছিল। পার্টির কর্মীরা তাঁকে প্রায়ই বলতেন, বেশী ঘোরাঘুরি করবেন না। হেমন্তদা হাসতে হাসতে বলতেন, মানুষ ডাকলে আমি যাব না। (যুগান্তর, ২১শে ফেব্রুয়ারী)

সেই আর জি কর হাসপাতাল, সেই মহাজাতি সদন। বছর খানেক আগে হেমন্তবাবু বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বাড়ীতে। একদিন আর জি কর হাসপাতালের দুইজন চিকিৎসক কর্মকর্তা বাড়ীতে এসে দেখলেন হেমন্তদার শরীরে গুরুতর ব্যাধি। অবিলম্বে হাসপাতালে নেওয়া দরকার, অথচ সে কথা বলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া যাবে না। তাই অন্য অনেক কথা বলে নিয়ে যাওয়া হল আর জি কর হাসপাতালে। হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স সকলেই

হেমন্তদার প্রতি যত্ন নেন। হেমন্তদার জন্য প্রত্যহ বেশী পরিমাণ দুধ ফল বরাদ্দ করা হল। প্রত্যহ তাঁর বিছানার চাদর বদল করে দেওয়া হয়। দুই দিন পরেই বেঁকে বসলেন হেমন্তদা। তাঁকে যে পরিমাণ দুধ বা খাবার দেওয়া হয়, যে রকম যত্ন তাঁর প্রতি নেওয়া হয়, অন্য রোগীদের প্রতি তো সেই রকম যত্ন নেওয়া হয় না। হেমন্তদাকে দুধের গ্লাস দিলে আগে পাশের রোগীকে দেখিয়ে বলেন, কই, ওকে তো দিলে না। হেমন্তদার বিছানার চাদর বদল করে দিলে আপত্তি করে বলেন, আগে ওর বিছানার চাদর বদল করে দাও। ডাক্তার নার্সরা বিব্রত হয়ে পড়ে। হেমন্তদার কথা, তার জন্য যা করা হবে, অন্যের জন্যও তাই করতে হবে। দু রকম চলবে না। ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে হেমন্তদা ও আশেপাশের সকলের জন্য প্রায় একই রকম ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। কিন্তু বেশীদিন হেমন্তদাকে হাসপাতালে রাখা গেল না। দলে দলে মানুষ এসে হেমন্তদাকে ফল দিয়ে যায় খাবার দিয়ে যায়—মুহূর্তে সেই সব ফল ও খাবার বিলি হয়ে যায় আশে পাশে সব রোগীদের মধ্যে। সমস্ত ওয়ার্ডের রোগীদের দেখবার জন্য সব সময় ডাক্তার নার্সদের হাঁক-ডাক করতেন। কিন্তু আজ সেই হেমন্তদাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, সেই ডাক্তাররা দেখলেন, সেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু সেই সকলের জন্য চিন্তা ভাবনার আকুল কণ্ঠস্বর আর নেই। ডাক্তারদেরও হেমন্তদার জন্য কিছু করতে হল না। শুধু চোখের জল। ডাক্তাররা শুধু হেমন্তদার উদ্দেশ্যে চোখের জল ফেলে তাঁদের কর্তব্য করলেন। তাঁদের শুনতে হল না হেমন্তদার কোন আদেশ, 'আমাকে দেখার আগে ওই রোগীটাকে দেখ।'

আর এই হল সেই মহাজাতি সদন। হেমন্তদা নিহত হওয়ার সংবাদ শুনেই দলের নেতারা যে যেদিকে ছিলেন ছুটে এলেন। কেউ রয়েছেন আর জি কর হাসপাতালে, কেউ পার্টি অফিসে। শুধু

নেই অশোক ঘোষ। তিনি রয়েছেন বাঁকুড়ায়, ডঃ কানাই ভট্টাচার্য রয়েছেন পার্টি অফিসে। প্রশ্ন দেখা দিল মৃতদেহ রাত্রে কোথায় থাকবে? পাশে বসে আছি আমি আর সন্তোষ মুখোপাধ্যায়—আলোচনা করে ঠিক হল হয় মহাজাতি সদনে আর না হয় ময়দানে নেতাজীর মূর্তির পাদদেশে।

ডঃ কানাই ভট্টাচার্য যোগাযোগ করলেন মহাজাতি সদন কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত মহাজাতি সদনই স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট হল। কিন্তু অশোক ঘোষ কোথায়? বেলা ১২টার মধ্যে তাঁর কলকাতা পৌঁছুবার কথা। ফোন করা হল বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়া ফোনে বলল, অশোক ঘোষ সকাল আটটায় বেরিয়ে গেছেন। তখন ফোন করা হল রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে, বলা হল পুলিশের বেতারের মাধ্যমে যে ভাবে হোক অশোক ঘোষকে হেমন্তদার নিহত হওয়ার সংবাদ জানিয়ে কলকাতায় আসবার ব্যবস্থা করিয়ে দিন। ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, সবচেয়ে আগে অশোকবাবুর নামে বেতারে একটা আবেদন প্রচার করা দরকার। তাড়াতাড়ি লেখা হল অশোক ঘোষের নামে আবেদন। সেই আবেদন রেডিও ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল।

"বিপথগামী বিক্ষোভ যেন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য মলিন না করে", সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ, প্রখ্যাত নেতার মৃত্যুতে পার্টির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলেন, "আজ সকালে 'আততায়ীর ছুরিকাঘাতে জাতীয় নেতা, সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি হেমন্তকুমার বসু নিহত হয়েছেন। অজাতশত্রু জনপ্রিয় বর্ষীয়ান জননেতা হেমন্তকুমার বসুর বুকে এই নির্মম নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে সারা দেশ যে ব্যথায় ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন তা আমরা জানি। পিছন থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত যে কাপুরুষরাই এই কাজ করে থাক না কেন, কোন

বিপথগামী বিক্ষোভ যেন মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্যকে মলিন না করে। এই সংকট-মুহূর্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের আরেক বিপ্লবী নেতার মৃত্যু বিপ্লবী মর্যাদায় গ্রহণ করুন। মহান নেতার আরব্ধ কাজ ও তাঁর আদর্শ রূপায়ণই হল শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রেষ্ঠ উপায়।"

হেমন্ত বসুর মরদেহ নিয়ে আসা হল মহাজাতি সদনে। মহাজাতি সদন একদা সুভাষ ফাণ্ড নামে তহবিল খুলে টাকা সংগ্রহ করে। শ্রীহেমন্তকুমার বসু হয়েছিলেন মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রাণপুরুষ। পরে সুভাষচন্দ্র বসু ও সুরেশচন্দ্র মজুমদারের চেষ্টায় মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার কাজ অগ্রসর হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন মহাজাতি সদনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন। সেইদিন রবীন্দ্রনাথকে জোড়াসাঁকো থেকে মহাজাতি সদনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিতে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীহেমন্তকুমার বসু। তারপর দেশ স্বাধীন হবার পর মহাজাতি সদনের কাজ সমাপ্ত হবার মূলেও ছিল শ্রীহেমন্তকুমার বসুর অক্লান্ত চেষ্টা। সেই মহাজাতি সদনে হেমন্তকুমার বসুর মরদেহ এনে স্থাপন করা হল। কেটে গেল রাত্রি।

২১শে ফেব্রুয়ারী সারা ভারতের সংবাদপত্রের শিরোনামে হেমন্ত কুমার বসু। প্রতিটি সংবাদপত্রে যতখানি বড় হরফ সম্ভব সেই হরফে লেখা হয়েছে হেমন্তকুমার বসুর নিহত হবার সংবাদ। প্রতিটি সংবাদপত্রে সম্পাদকীয়। হেমন্তকুমার বসুর মৃত্যু সংবাদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে আনন্দবাজার লিখলো—"নম্র চিত্তে নত শিরে বসিয়া আছি। আজ লিখিবার কি আছে, কিছু নাই। দিনের পর দিন তো শুধু শ্মশান-শোচনা? কোন অর্থ নাই। কোন অর্থ হয় না।

কী করিব? শোক? শ্রদ্ধাজ্ঞাপন? নিস্কলঙ্ক নিহত ওই নেতার শ্রাদ্ধাধিকারী আমরা তো নহি। এই শয়তান, মূর্খ আর সেয়ানা পাগলের রাজ্যে এমন একজনও আছে কিনা সন্দেহ করি।

নিঃশত্রু নায়ক হেমন্ত বসু

বড় জোর তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারি, আমাদের হেমন্তদাকে, যাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল দুঃখে-সুখে দুশ্ছেদ্য নাড়ির টানে এই প্রতিষ্ঠান জড়াইয়া ছিল। দুর্ভাগ্যের দ্বারে দ্বারে বসিয়া এক অন্নপান— ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন আমাদের আত্মীয়েরও বড়। "ক্রতুং স্মর, কৃতং স্মর," অন্তিমকালের মন্ত্রে বলিয়াছে। স্মরণের অধিকার সকলেরই আছে।

ইহার পর যেন "অজাতশত্রু" বলিয়া কোনও শব্দ অভিধানে না থাকে। শব্দটা মিথ্যা, মুছিয়া ফেলাই ভাল। ইহার পর যেন "দেশপ্রেম" শব্দটি এদেশে কেহ উচ্চারণ না করে। দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগের একটিই মাত্র পুরস্কার এই দেশে মেলে: ঘাতকের ছুরি বা গুলি। শনিবার সকালে সর্বত্যাগী, সর্বরিক্ত হেমন্তদা নিমেষে মরণ সাগর উত্তীর্ণ হইয়া অমর হইয়াছেন। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু যাওয়ার আগে, সংজ্ঞালুপ্ত, রক্তাপ্লুত, মুহূর্তে তুলনা-বিরল এই "কৃতজ্ঞ" জাতিকে সম্ভবত একটা ধন্যবাদ দিয়া গিয়াছেন, কেন না জাতি তাঁহাকে আসন দিয়াছে সেইখানে, যেখানে সহসা তিনি— নেতাজীর অন্তরঙ্গ সহকর্মী—মহাত্মা গান্ধীর পাশাপাশি। উভয়েই দেশের মুক্তির জন্য বিদ্রোহ করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশীয়দের হাতে তাঁহাদের প্রাণ যায় নাই, গিয়াছে স্বদেশীয়দের হাতে। আর দেখা গেল নেতাজীর উত্তর সাধকদের নেতাজীর নিজের রাজ্যেও ঠাঁই নাই।

দেশপ্রেম অতএব এই রাজ্যে পাপ। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে! প্রায়শ্চিত্ত এখনও বাকী অনেকের। দেশপ্রেমের প্রায়শ্চিত্ত আপসের। কতবার আর শোক করা যায়? করিয়া করিয়া আর ফুরাইবে না। গণতন্ত্রের নামে এক নির্বাচনী যজ্ঞকুণ্ড জ্বলিয়াছে, এই যজ্ঞে মন্ত্রপাঠের চেয়ে আহুতিই বেশী।

আজ শুধু এক ভয়ার্ত জিজ্ঞাসা—অতঃপর কার পালা? ইহার পর

কে ? শনিবার শ্যামপুকুর এলাকার প্রায় অশীতিপর নায়কের যে-রক্ত ফিনকি দিয়া উপচাইয়া রাজপথ সিক্ত করিয়া দিল, তাহাতেই সব ভুল ভাঙ্গিয়া গেল ইহা আশা করা বৃথা। তাহার জীবনে লভিয়া জীবন বিমূঢ় হবে, এক মানবগোষ্ঠীর বিবেক জাগিয়া উঠিবে, এ প্রত্যাশা যে করে মূঢ় সেও। সম্পূর্ণ একটি জাতি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত—হয় অপঘাত নয় আত্মঘাত—যেখানে ইহাই নিয়তি, সেখানে মৃত্যু অপেক্ষিতরা মৃত্যুকে লইয়া শোক করিবে কেন ?

বড় জোর স্থানীয় এবং সাময়িক একটা "বন্ধ্"। আর কিছু বন্ধ হইবে না। অনুতপ্ত কেহ সর্বভারতীয় দলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতার রক্ত স্পর্শ করিয়া শপথ লইবে না যে নির্বাচন নয়, নির্বাচন মানে এই মৃত্যুরোলে মুখরিত শ্মশানে কণ্টকিত ক্যাকটাসের চাষ। কেহ মুখ ফুটিয়া বলিবে না, এত খুন তবু নির্বাচন কেন ?

এর চেয়ে কিছু না বলাই ভাল। যা হওয়ার তা হোক বা আসার তা আসুক। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজত্ব যাহাদের একমাত্র কাম্য তাহারা সুখে ও কুশলে সেখানে সমাসীন হউক। এখানকার মহাকরণের মসনদের জন্য যাহারা উদ্বাহু ও লোলুপ, তাহারা ?—সেখানে বসুক। ইত্যবসরে স্বল্পবুদ্ধি, মতিচ্ছন্ন আর দু-কান কাটা বেহায়ারা আসন লইয়া মারামারি করিয়া নেপোদের দই মারিবার রাস্তা প্রশস্ত করিয়া দিবে। ভাবিতে হইবে না, শেষ পর্যন্ত সকলের কপালেই নাচিতেছে লবডঙ্কা।

দলবাহুল্য লইয়া যে সমস্যা সেটা এদিকে আপনা হইতে ক্রমশ সাফ হইয়া যাইতেছে, যাইবে। এই হারে চলিলে অবশেষে একাধিক দলের বালাই আর থাকিবে না। একমেব "পার্টিক্রেসিতে" ডেমোক্রেসির পরিণতি—সেইটাই উচিত প্রাপ্য, এই রাষ্ট্রীয় আদি পাপের যোগ্য বেতন। যে আদি পাপ গণতন্ত্রকে নৈবেদ্যের চূড়া করিয়া মাথায় বসাইয়াছে কিন্তু গণতান্ত্রিক বিশ্বাসকে যাচাই করিয়া

দেখা আবশ্যক মনে করে নাই। পরম সহিষ্ণুতায় সমান আসন দিয়াছে পরমত অসহিষ্ণুতাকে, অবাধ স্বাধীনতার নামে যাহাকে ছাড়পত্র লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম স্বৈরাচার—ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছি, এইটাই আদি পাপ।

হেমন্তদা আজ এ সব কিছুর উর্ধ্বে চলিয়া গেলেন, তিনি পুণ্যবান, আজিকার শেষ কাজ তাঁহাকে শেষ নমস্কার। যাঁহারা যান নাই কিন্তু যাইবেন—জল্লাদের ফর্দে কে জানে এই হতভাগ্য বধ্যভূমির কতজনের নাম লেখা আছে?—তাঁহাদেরও অগ্রিম প্রণাম।"

যুগান্তর লিখলো—"নরমেধে পূর্ণাহুতির বাকী কত? আরও কত রক্তস্রোত পেরিয়ে তবে আমরা ভোটের বাক্সের কাছে পৌঁছব? আরও কত প্রাণ বলি দিলে তবে নরমেধ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবে। নেতাজীর বিশ্বস্ত সহচর, স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রণী যোদ্ধা ও বর্ষীয়ান নেতা হেমন্তকুমার বসু কলকাতার প্রশস্ত রাজপথে দিনের আলোতে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে জীবন বিসর্জন দেওয়ার পর এই হতভাগ্য শহরের লক্ষ লক্ষ শোকস্তব্ধ মানুষের অন্তরের অন্তস্থল থেকে এই প্রশ্ন গভীর মর্মযন্ত্রণার সঙ্গে উচ্চারিত হবে। প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে ঘাতকের অস্ত্র আজ কি নির্বোধ মূঢ়তা ও কি দুঃসাহসিক মত্ততায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে এই একটি মৃত্যুর মধ্যে তার স্বাক্ষর রয়ে গেল। অমানুষিক হত্যার তাণ্ডব ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হৃদয়ে যার মনুষ্যত্বের বিন্দুমাত্র আজও অবশিষ্ট আছে তিনিই এই ভয়াবহ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে বলবেন, বন্ধ হোক এই প্রাণ হননের রাজনীতি। আর বজ্রনির্ঘোষ আওয়াজ তুলবে, মৃত্যুর ছায়ায় শিহরিত এই রাজ্যে কোন রক্ত পিপাসুর দল একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে এভাবে রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে চলেছে?

হেমন্তবাবু—যিনি ছিলেন ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে অগণিত মানুষের

হেমন্তদা। একজন অজাতশত্রু মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে হত্যা করা দূরে থাকুক, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কারও কোন বিদ্বেষ থাকতে পারে, একথা ভেবে পাওয়া যায় না। তাঁর ৭৬ বছরের জীবন ক্লান্তিহীন দেশকর্মীর জীবন। ফরোয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে শুধু নয় পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রথম সারির জননায়ক হিসাবে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের একজন বন্ধুবৎসল মানুষ হিসাবে তিনি অসংখ্য লোকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা পেয়ে এসেছেন। পরিণত বয়সে তাঁর জন্য এমন নৃশংস মৃত্যু অপেক্ষা করছিল তা চিন্তাই করা যায় নি। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়া মাত্র উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়েছে, শ্যামপুকুরের ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালে শোকবিহ্বল মানুষের যে সমাবেশ হয়েছে, তাতেই তাঁর জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মনে না করে উপায় নেই যে তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, এটাই আততায়ীর চোখে তাঁর অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি শ্যামপুকুর বিধান সভা কেন্দ্রে একজন শক্তিশালী প্রার্থী ছিলেন। দুই দশকের অধিককাল ধরে তিনি বিধান সভায় এই কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। আজ তাঁর মৃত্যুর ফলে এই কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত রাখতে হবে। এই নিয়ে দুজন বিধান সভার প্রার্থী খুন হলেন। দুটি নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের তারিখ পিছিয়ে গেল। আগামী ১০ই মার্চের আগে আরও কতগুলি কেন্দ্রে একই কারণে নির্বাচন স্থগিত রাখতে হবে কে জানে?

রাজ্য সরকার ক্রমাগত আশ্বাস দিচ্ছেন যে নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য সম্ভবপর সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। মানুষ নিশ্চয়ই জানতে চাইবে হেমন্তবাবুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য আগে থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি কেন? এ খবর যদি সত্য হয় যে হেমন্তবাবু চাওয়া

সত্ত্বেও তাঁকে পুলিশ পাহারা দেওয়া হয় নি তাহলে বলতেই হবে এ বিষয়ে পুলিশের গুরুতর গাফিলতি হয়েছে! ঘটনার এমনই পরিহাস যে শনিবার সকালের কাগজেই গ্রে-স্ট্রীট এলাকায় মিলিটারি টহল দেওয়ার ছবি বেরিয়েছে। আর এদিনেই এই এলাকায় হেমন্তবাবু খুন হলেন। মিলিটারি দিয়ে খুন ঠেকানো যায় না একথা সত্য। কিন্তু মিলিটারিকে এখন যে রকম খড়ের পুতুল সাজিয়ে রাস্তায় বের করা হচ্ছে সেটা আদৌ সমীচীন কিনা ভেবে দেখা দরকার। শাদীর পয়লা রাতে বিড়াল মারতে না পারলে পরে শুধু ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না।

যা হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে—। এখন একটা বড় কাজ, তা হল খুনীদের খুঁজে বার করা। ঘটনার যে রকম বিবরণ বেরিয়েছে—তাতে এটা পরিষ্কার যে এটা একজন দুজনের কাজ নয়। অনেকে মিলেমিশে ভেবে চিন্তে পরিকল্পনা করে এই খুন করেছে। এটি খুবই সম্ভব যে অপরাধীরা এমন অনেক সূত্র রেখে গেছে যেগুলোর ভিত্তিতে এই খুনের কিনারা করা যায়। অপরাধীদের দলের পরিচয় নিতে গিয়ে পুলিশের যেন হাত-পা বাঁধা। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড যে বা যারাই করে থাকুক তারা নিজেদের সর্বনাশ করেছে, তারা যদি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবে সেই দলের সর্বনাশ করেছে। এবং দেশের মানুষের ক্ষমা তারা পাবে না। প্রতিদিন যে সব হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পুলিশ ফাইলের ভেতরে চাপা পড়েছে হেমন্তবাবুর মৃত্যুও তেমনই আর একটা হয়ে থাক এটি কিছুতেই হতে দেওয়া সম্ভব না। এই জঘন্য অপকর্মের নায়কদের দেশের মানুষ পরিষ্কার করে চিনে নিতে চায়।"

কালান্তর লিখলো—"নতুন যুগের দধীচি—শ্রীহেমন্ত কুমার বসু নিহত। পশ্চিমবাংলার সর্বজ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা খুনীর হাতে প্রাণ দিলেন। কারা খুনী, তাদের পুলিশ খুঁজে বের করুক ও

ধরুক। কিন্তু কোন দল খুনী, মানুষ নিজেরাই তাদের ধরে ফেলেছে। কমিউনিস্ট নামধারী একটি দলের এরূপ কীর্তির কথা লিখতে কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের মাথা নুইয়ে যায়। কমিউনিস্ট আদর্শকে এমন কলঙ্কিত এবং কমিউনিস্টদের এমনভাবে মাথা হেঁট কেউ কোনদিন করে নি। বৃদ্ধ ও অক্ষম হেমন্তকুমার বসু নির্বাচনে দাঁড়াতে চান নি। কিন্তু যে মানুষ ও দেশকে বাল্যাবধি তিনি ভালবেসেছেন, আজ তাদের সি-পি-এম'এর খুনের রাজনীতির মধ্যে ছুঁড়ে দিতেও যে তিনি অক্ষম। যাদের তিনি একদিন হাত ধরে তুলতে সাহায্য করেছেন, সেই হাতগুলি থেকে ছোরা-বন্দুক কেড়ে নিয়ে দেশের কাজে লাগাবার জন্য তিনি নির্বাচনে দাঁড়ান। নির্বাচন প্রার্থী হেমন্তকুমার বসু খুন হলেন। খুন হল গণতন্ত্র। খুন হল সভ্যতা। খুন হল পিতা।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু নতুন যুগের দধীচি। অক্ষম দেহে তাঁর নির্ভীক প্রাণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। কিন্তু পশ্চিম-বাংলাকে বাঁচাবার জন্য তাঁর ডাক এখন এ রাজ্যের যৌবনের শিরা-উপশিরায় তরঙ্গ তুলবে। জীবন যৌবনের পূজারী পশ্চিম-বাংলার সেই যৌবন-মনে যারা খুন ও মৃত্যুর বীজ ছড়িয়েছে তাদের উৎপাটন করাও আজ যুবকদেরই দায়িত্ব। শ্রীহেমন্তকুমার বসুর একটি প্রাণ আজ লক্ষ প্রাণে জীবনের জয়ধ্বনি তুলবে। হত্যা, মৃত্যু ও জীঘাংসার রাজনীতিকরা যেন তৈরী থেকো। খুনোখুনীর রাজনীতি এবার পরাস্ত হবেই।"

হেমন্তকুমার বসুর হত্যার সংবাদে শোকার্ত মর্মাহত ধিক্কারধ্বনি উঠলো ভারতের প্রতিটি প্রান্ত থেকে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—জব্বলপুর থেকে এই সংবাদ শুনে বললেন, গণতন্ত্রের শত্রু পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত ও নির্বাচনী সময় নির্ঘণ্ট বানচাল করে দেওয়ার জন্য হিংসার পথ অনুসরণ করে চলেছে। এখন তারা হেমন্ত বসুর ন্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সর্বজনশ্রদ্ধেয় দেশহিতৈষীর উপর তাদের কাপুরুষোচিত হস্ত উত্তোলন করেছে। এই জঘন্য অপরাধের নিন্দা করার ভাষা নেই।

কোচবিহারে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। রেডিওয় সংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিগুণা সেনও কান্নায় ভেঙে পড়েন কোচবিহারে।

শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ড একটা ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। সভায় বেদনার সঙ্গে বলেন, হেমন্তবাবু এমন একজন নেতা যার কোন শত্রু থাকতে পারে বলে আমি জানি না। ৭৬ বৎসরের নিরীহ বৃদ্ধ নেতাকে প্রতিক্রিয়াশীলরা বেছে নিয়েছে। শ্রীবসু বলেন, কোনদিন হেমন্তবাবু কখনও আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই। এই হত্যাকাণ্ড কল্পনার বাইরে। বীভৎস, নারকীয়।

(গণশক্তি, ২৫শে ফেব্রুয়ারী)

রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি হেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ডের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলেন, শ্রীহেমন্ত বসু এক অতীব ঘৃণ্য রাজনৈতিক অপরাধের শিকার হয়েছেন এই কথা শুনে আমি অপরিমেয় বেদনায় বিচলিত। শ্রীবসু একজন মহান দেশপ্রেমিক ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবদীপ্ত ইতিহাসে তাঁর স্থান চিরস্থায়ী। আমি এই বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে সকল চেতনা-সম্পন্ন মানুষ এই অপরিসীম শোকের শরিক।

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বলেন, শ্রীবসুকে ফিরে পাব না। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে হত্যার রাজনীতিকে স্তব্ধ করে জাতির

ভাঙা হৃদয়কে জোড়া দিয়ে মানুষের অন্ধত্বকে সরিয়ে আশার আলোয় নিয়ে যেতে হবে।

শ্রীহেমন্তকুমার বসুর নিহত হওয়ার সংবাদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিনী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী শোকাভিভূত হয়ে বলেন, হেমন্তর মৃত্যুতে আমি শোকাভিভূত—এ দুঃখের শেষ নেই। এ আমার পুত্রশোকের সমতুল। হেমন্ত ছিল আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। সুভাষ ও অন্যান্যদের সেই গৌরবময় সংগ্রামের দিনগুলি স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সেই সময় হেমন্ত ছিল আমাদের কাছে শক্তির উৎস। নিজের বেলায় চিন্তভাবনাহীন, অন্যের বেলায় ওর চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। মানুষের মুক্তি সাধনই ছিল তার ব্রত। কেউ যে অমন মানুষকে হত্যা করতে পারে এ আমার ধারণারও অতীত। আমি কেবল একথাই বলতে পারি, এই হিংসা ও উন্মত্ততা যদি চলতে থাকে, তাহলে সুভাষ, যতীন, বিধান, হেমন্ত—এঁদের আরব্ধ কাজ সফল হওয়ার সম্ভাবনা মুছে যাবে।"

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান জননেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসুর এই দুঃখজনক মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে বলেন, "ছিয়াত্তর বছরের প্রবীণ শ্রীবসুর কোন শত্রু ছিল না জগতে। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। তাঁর একমাত্র অপরাধ, নির্বাচনে প্রচারের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার চেষ্টা। এবং এই জন্যই তাঁকে পাশবিক উপায়ে হত্যা করা হল।"

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) রাজ্য শাখার সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেন, "আসন্ন নির্বাচন পণ্ড করতে অথবা বন্ধ রাখতে যারা বদ্ধপরিকর এ বীভৎস কাণ্ড তাদেরই কাজ। শ্রীবসুকে যেখানে হত্যা করা হয়েছে সেই এলাকাটি দীর্ঘকাল ধরে নকশাল সমাজবিরোধীদের ঘাঁটি। হেমন্ত বসুর মৃত্যু কেবল একটি দলের উদ্বেগের কথা নয়, গণতন্ত্রের প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র

শ্রদ্ধা আছে এটা তাদের সবার পক্ষে উদ্বেগজনক। আমাদের পার্টি শ্রী বসুর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে এবং ধর্মঘট ও হরতাল করে এর বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষোভপ্রকাশের আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা হত্যাকারীর কঠোর শাস্তি দাবী করছি। সারা পশ্চিমবঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হোক।"

কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আরামবাগ নির্বাচন কেন্দ্রে বসে এ সংবাদ শুনে এক শোকবার্তা পাঠিয়েছেন, তিনি বলেন, "শ্রীহেমন্তকুমার বসু ছিলেন আমার প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় একসঙ্গে দুজনে কারাবরণ করেছি। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হওয়ার পরে দুজনে দু দলে ছিলাম, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব কোনদিন শিথিল হয়নি।"

কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষও এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে বলেন, "এটা কেবল জাতীয় শোকই নয়, তাঁকে হারানো আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির যোদ্ধা এবং উৎসর্গীকৃত প্রাণ শ্রীবসুর ত্যাগ ও কষ্ট বরণ অনাগত দিনেও দেশ স্মরণে রাখবে। ঐ হত্যার নিন্দা করতে ভাষাও অক্ষম। আমি শ্রীবসুর সকল বন্ধু, সহকর্মী এবং দেশবাসীর সঙ্গে তাঁর মহান আত্মার উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই।"

আগস্ট বিদ্রোহের অন্যতমা নেত্রী শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী গভীর শোকপ্রকাশ করে বলেন, "মানবিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বর্ষীয়ান নেতা হেমন্ত কুমার বসুর উপরে এই কাপুরুষোচিত আক্রমণ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। নেতাজীর একজন সাচ্চা অনুগামীকে হত্যা করে খুনীরা প্রতিটি বাঙালীর অবমাননা করেছে। বাঙলার গড্‌সেরা জনগণের ক্রোধ সম্পর্কে অবহিত হোক। যে সময়ে এই

মহান জাতীয় নেতার উপস্থিতি সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ঠিক সেই সময়ে তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি।"

(কালান্তর, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান এস. এ. ডাঙ্গে আজ সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হেমন্তকুমার বসুর হত্যার তীব্র নিন্দা করে বলেন, "এই হত্যাকাণ্ড অবিশ্বাস্য এক ভয়াবহ ট্রাজেডি।"

(কালান্তর, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)

সৌম্যেন ঠাকুর বলেন, "রবিবার সকালে কলকাতায় ফিরে এসে মহাজাতি সদনে গিয়ে দেখলুম বহুকালের বন্ধু ও বহু আন্দোলনের সহকর্মী হেমন্ত বসু অসংখ্য ফুলের মধ্যে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত। বহু সংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক পথ চলতে চলতে চলে গেলেন। কর্মযোগী বীর দেশব্রতী মানব-প্রেমিকের জীবনের এই তো যোগ্য অবসান। বাংলাদেশে এখন পশুদের তাণ্ডবলীলা চলেছে। এই পশুদের দমন করবার ভার তিনি দেশবাসীদের দিয়ে চলে গেছেন। যারা এই পৈশাচিক রক্ততাণ্ডব শুরু করিয়েছে বাংলাদেশে, বাংলার রাজনৈতিক জীবন থেকে তাদের অপসারিত করতে হবে। হেমন্তবাবুর সারাজীবনের সাধনাকে স্মরণে রেখে বাংলার সেই বৈপ্লবিক সত্তাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জনমনে।"

(যুগান্তর, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)

শোক, শোক, শোক। ঠিক যেন ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী দিনটি ফিরে এল বাইশ বৎসর পরে। সেই দিন দিল্লীর বিড়লা বাড়ী থেকে পাঁচটা বেজে কয়েক মিনিটে মহাত্মাজী বের হলেন প্রার্থনা সভায় যাবার উদ্দেশ্যে। প্রার্থনা সভায় প্রবেশ করে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছেন। দুই পাশে রয়েছে আভা ও মানু গান্ধী। প্রতিদিন জনতা যেভাবে পথ করে দেয় সেই ভাবে পথ করে দিল মহাত্মাজীকে এগিয়ে যেতে। প্রতিদিন জনতা যে ভাবে

নতজানু হয়ে প্রণাম করে একই ভাবে প্রণাম করলো অনেকে। ঠিক প্রণাম করার মতই একটু মাথাটা নীচু করলো নাথুরাম গড্‌সে, আর গান্ধীজীও সেই প্রণামের উদ্দেশ্যে সাড়া দিলেন হাতটা একটু যুক্ত করে। তারপর আরো সামনে এগিয়ে এল গডসে, পথের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো, বের করল রিভলবার, গুলি ছুঁড়লো—গুড়ুম, গুড়ুম। হা-রাম বলে মহাত্মার দেহ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তারপর দেহ নিয়ে যাওয়া হল বিড়লাবাড়ী। কিন্তু কোন চিকিৎসার অবকাশ ঘটলো না, শেষ হয়ে গেল সব। ১৯৪৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী যেন সেই একই দৃশ্য।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন, "আজ সকালে ঠিক ছিল আমি আর অজয়দা (অজয় দে) কালীঘাট মন্দিরে যাবার সময় হেমন্তদাকে তাঁর বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে পথে এসপ্লানেডে নামিয়ে দেব। তিনি সেখানে একটি সভায় যোগ দিতে যাবেন। সেইমত কর্নওয়ালিস স্ট্রীট থেকে আমি একটি ট্যাক্সি ভাড়া করি। অজয়দা সুভাষ কর্নারে আমার জন্য অপেক্ষা করেন। যাবার পথে তাঁকেও তুলে নেব। ট্যাক্সি নিয়ে আমি টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে ঢুকি। একটুখানি ভেতরে ঢুকেই দেখতে পাই হেমন্তদা আসছেন। আমি ট্যাক্সিটিকে দাঁড় করিয়ে হেমন্তদাকে ডাকার জন্য ট্যাক্সি থেকে নামতে যাব—এমন সময় ট্যাক্সির দুপাশ থেকে দুজন যুবক বুকের সামনে পাইপগান ধরে বলে, গাড়ি থেকে নামলে কিংবা চিৎকার করলে গুলী করব। গাড়ীতে বসে দেখলাম কয়েক হাত দূরে ১০।১২ জন যুবক হেমন্তদাকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের সবার হাতেই ধারাল অস্ত্র এবং পাইপগান। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বেলা এগারোটার কিছু আগে। ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ তরোয়াল তুলে হেমন্তদার ঘাড়ে সজোরে কোপ বসাল, তার দেখা-দেখি অন্যান্যরাও হেমন্তদাকে আঘাত করতে শুরু করে। এই

পৈশাচিক দৃশ্য দেখে ট্যাক্সিওয়ালা আমায় সহ ট্যাক্সি নিয়ে পালিয়ে যায়। আমি সেই ট্যাক্সি ঘুরিয়ে থানায় যাই—পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানাই।”

২১শে আর ২২শে ফেব্রুয়ারী দুটি দিন। ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটি ছিল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজপথে থাকবার দিন। আর ২২শে ছিল রাজপথ জনশূন্য রাখবার দিন। ২১শে হেমন্তকুমার বসুর মরদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা যাবে কিন্তু সে তো মাত্র কয়েকটি পথ দিয়ে। কিন্তু শহরের সব পথেই মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই আজ ঘরের বাইরে। মিছিল নগরী কলকাতায় অনেক মিছিল হয়েছে, অনেক শোভাযাত্রা হয়েছে, তার অনেকগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন হেমন্তবাবু—অনেক মিছিলের সঙ্গে থেকেছেন তিনি। আর আজ তাঁকে নিয়ে মিছিল। কিন্তু কলকাতার রূপ এক। যেদিন দেশবন্ধুর মরদেহ দার্জিলিং থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে নিয়ে আসা হল, সেই শোক-মিছিল, যেদিন লাহোর জেলে ৬২ দিন অনশনে প্রাণ দিলেন যতীন দাস এবং তার মরদেহ নিয়ে আসা হল হাওড়া স্টেশনে, সেই শোক মিছিল—সব যেন একই দৃশ্য। হেমন্ত বসু ছিলেন দেশবন্ধুর প্রিয় শিষ্য আর যতীন দাসের সহকর্মী বন্ধু। দেশবন্ধুর মরদেহ কলকাতায় এলে সেই দেহ ট্রেন থেকে নামিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী আর যতীন দাসের দেহ গ্রহণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, কিন্তু দুই মিছিলেই ছিলেন হেমন্তকুমার বসু। আজ তাই হেমন্ত বসুর মরদেহ নিয়ে যে শোভাযাত্রা বের হল তাতে বুঝি দেশবন্ধু আর যতীন দাসের মরদেহ নিয়ে শোভাযাত্রার স্মৃতি একাকার হয়ে গেল। “জনতার চোখের জলে জননেতার শেষ বিদায়”—বিজয়া—শেষ বিদায়, বিসর্জন। হেমন্তকুমার বসুর মরদেহ রবিবার সন্ধ্যার সময় কোন কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ মানুষ বোধ হয় এইভাবে সম্প্রতি আর কখনও ‘বন্দেমাতরম’ বলেনি, বলেনি ‘জয় হিন্দ’।

নিঃশত্রু নায়ক হেমন্ত বসু

ফাল্গুনের বসন্ত-সন্ধ্যায় হেমন্ত-গোধূলি এর আগে এমন করে কখনও নেমে আসেনি। দীর্ঘ—দীর্ঘ শবযাত্রা। পথ, শবযাত্রা আর শোকযাত্রা সব একাকার। কোন বিজয়াদশমীর দিনেও কোন বিগ্রহ এইভাবে নাগরিক জনচিত্ত আলোড়িত করেনি, যেমন করেছিল এইদিন। মহাজাতি সদন থেকে মহা-শ্মশান কয় মাইলই বা? মাঝখানে শ্যামবাজার আর ময়দানে দুই নেতাজী মূর্তি এবং এলগিন রোডে নেতাজী-ভবন—সব পথ শেষে মিলে গেল। যিনি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি মিশে গেছেন। যিনি অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, তিনি অনুভব করছেন অলিন্দ বা জানালা পিছিয়ে সরে যাচ্ছে—এত জনস্রোত। শেষ দর্শন, শেষ বারের মত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। আবাল বৃদ্ধ নরনারী, ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক কর্মী নেতা সাধারণ মানুষ—সকলে উপস্থিত। ভবনশীর্ষ, বারান্দা, অলিন্দ থেকে পুষ্প বর্ষণ করা হয়েছে। শবাধারবাহী গাড়ি থামিয়ে পুষ্পমাল্য স্তবক দিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অনেকে। হাতে গন্ধপুষ্প, ধূপ চন্দন, চোখে জল, মুখে অজাতশত্রু পরোপকারী দেশহিতব্রতী বর্ষীয়ান জন-নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যার জন্য তীব্র ধিক্কার। সেই ধিক্কারধ্বনি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সুতীব্র ঘৃণা। ক্রোধ, ক্ষোভ, ঘৃণা ও বেদনার সংমিশ্রণে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের আওয়াজ সেদিন আকাশ স্পর্শ করছিল বার বার।

সকাল সাতটায় মহাজাতি সদনের সামনে পৌঁছে দেখি দর্শনপ্রার্থীদের দুটি বিরাট লাইন। একটি উত্তরে মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, অন্যটি দক্ষিণে কেশব সেন স্ট্রীটের মোড় অবধি। পুলিশ বাহিনী চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর উপর যানবাহন ও লোকজনের ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত। ভবন প্রাঙ্গণে ও আশেপাশে সশস্ত্র পুলিশের কড়া পাহারা। হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন বাঙালী অবাঙালী শিশু কিশোর তরুণ বৃদ্ধ সব বয়সেরই হাজার হাজার

নরনারী সুশৃঙ্খলভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন লাইন ধরে শেষ দর্শনের জন্য। রাতে নীলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গ থেকে মরদেহ এনে মহাজাতি সদনের নীচের তলায় দক্ষিণ দিকের গ্যালারিতে শায়িত রাখা হয়। রেডিওতে এ খবর শুনে রাত্রেই মহাজাতি সদনে দর্শনপ্রার্থীর সমাবেশ শুরু হয়। রাজ্যপাল ধাওয়ান মাঝরাত্রে পুষ্পমাল্য পাঠিয়ে দেন। শেষ রাত থেকে সদনের সামনে লাইন করে দর্শনার্থীরা অপেক্ষা করতে থাকেন। আজীবন খদ্দর-প্রিয় জননেতার মরদেহ শুভ্র খদ্দরে আচ্ছাদিত করা হয়, রাশি রাশি পুষ্পমাল্য ও স্তবকে সুশোভিত এবং ধূপবাসে আকুল পরিবেশ। দর্শনার্থীরা একে একে আনত হয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতে থাকেন। মাঝে মাঝে কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও বাড়তে থাকে প্রচণ্ড। সাড়ে সাতটা নাগাদ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ এবং প্রবীণ বিপ্লবী ও হেমন্তদার সহকর্মী বন্ধু জননেতারা আসতে শুরু করেন। প্রথমে আসেন বিপ্লবী শ্রীজ্যোতিষ জোয়ারদার, তারপর একে একে ডাঃ রণেন সেন, শ্রীবিজয়সিং নাহার, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, ডেপুটি মেয়র শ্রীনীলরতন সিংহ, প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীভূপেন রক্ষিত প্রমুখ। মহিলাদের অনেকেই অঝোরে কাঁদতে থাকেন। ন'টা বাজার মুখে ফরওয়ারড ব্লকের নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ কানাই ভট্টাচার্য ও শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল, কাউনসিলার শ্রীকুমার দত্ত ও শ্রীঅজয় দে প্রমুখ শোকযাত্রা বার করার বন্দোবস্ত করেন।

—মহাজাতি সদন থেকে শোকযাত্রা শুরু হয় বেলা ৯টা ১০ মিনিটে। পুষ্পসজ্জিত লরিতে ফরওয়ারড ব্লকের ব্যাঘ্রলাঞ্ছিত লাল পতাকায় আচ্ছাদিত মরদেহ শায়িত অবস্থায় রাখা হয়। লরির উপরে কালো পতাকার পাশে ফরওয়ারড ব্লকের অর্ধনমিত পতাকা, লরির উপরে নেতৃবৃন্দ, সামনে কংগ্রেস, জনসংঘ, ফরওয়ারড ব্লক,

পি এস পি, আর এস পি, এস ইউ সি, এবং সি পি আই প্রভৃতির অর্ধনমিত পতাকা ও ফেস্টুন হাতে জনতার মিছিল। তারও আগে সামরিক বাহিনীর লরির সারি। পিছনে 'বন্দেমাতরম' 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে উত্তর কলকাতার দিকে। বিভিন্ন পথ ঘুরে বেলা সাড়ে দশটায় শোক মিছিল স্বর্গত শ্রীবসুর নির্বাচনী এলাকা শ্যামপুকুরে গিয়ে পেঁছিয়। সারাটা অঞ্চল জুড়ে বিজ্ঞাপনী বিচিত্র পোস্টারে ছয়লাপ, "সিংহ চিহ্নে ছাপ দিয়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট মনোনীত ফরওয়ারড ব্লক প্রার্থী শ্রীহেমন্ত কুমার বসুকে জয়যুক্ত করুন"—নানা আবেদন জানিয়ে রকমারি পোস্টার দেওয়ালে লেখা চারিদিকে। ৩৪নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটে যে বনেদী বাড়ির ফটকের মুখে রাস্তায় শ্রীবসু আক্রান্ত হন, সেখানে দেখলাম রক্তের ধারা জমাট হয়ে রয়েছে। ইঁট দিয়ে পুলিশ ঘিরে রেখেছে। কয়েকটি তরুণ সাবল, গাঁইতি দিয়ে তার চারিদিকে গর্ত করে খুঁটি পুঁততে শুরু করেছেন স্মৃতিবেদী করার ইচ্ছায়। কাছেই প্রাণহীন পলাশের রাঙাফুলের মেলা।

মিছিল নানা গলিপথ ঘুরে ২নং শ্রীকৃষ্ণ লেনে শ্রীবসুর বাসভবনে যায়। তখন বেলা পৌনে এগারোটা। অকৃতদার হেমন্তবাবু মেজদা শ্রীবিষ্ণুদাস বসুর বাড়িতে থাকেন। মরদেহ বাড়ির সামনে নামালে এক মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হয়। তাঁর মাতৃসমা মেজবৌদি শ্রীমতী উমা বসু কান্নায় আছড়ে পড়েন। শ্রীবসুর আরো দুই বৃদ্ধ দাদা, ছোট ভাই, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর কান্নার রোল ওঠে।

আশেপাশের বাড়ি থেকে পুষ্প বর্ষণ করা হয়। অজস্র পুষ্পমাল্য ও স্তবকে শবাধার ভরে যায়। শ্যামপুকুরে সুভাষ করনার হয়ে শোক মিছিল দেশবন্ধু পার্কে নিয়ে যাওয়া হয়। আগে হতেই পার্কের সামনে রাস্তার উপরে একটি শহীদ বেদী স্থাপন করা

হয়েছিল। পুষ্পমাল্য, স্তবক ও ধূপদীপ ইত্যাদি নানা উপচার নিয়ে হাজার হাজার মানুষ সকাল থেকে অপেক্ষমান। সাড়ে এগারোটায় মিছিল উপনীত হলে 'হেমন্তদা অমর রহে' ও 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির শোক বিহ্বল জনতা পুষ্পবর্ষণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মূর্তির সামনে কিছুক্ষণ মরদেহবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মিছিল এগিয়ে যায় পাঁচমাথার মোড়ে। নেতাজীর অশ্বারূঢ় মূর্তির পাদদেশে অন্তিম শয়নে তাঁর অন্তরঙ্গ অনুগামী। মূর্তি স্থাপনের দিন থেকে প্রতি বছর হেমন্তবাবু এই মূর্তিতে মালা দিয়েছেন নেতাজীর পুণ্য জন্মদিবসে। এই গত ২৩শে জানুয়ারীতেও। এদিন কিন্তু মালা দিতে নয়, মালা নিয়েই গেলেন। এরপর বিধান সরণি ধরে মিছিল সোজা দক্ষিণমুখী। কলেজ স্ট্রীট পার হয়ে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটে সি পি আই অফিসের সামনে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সি পি আই নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী, শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ মরদেহে মালা দেন। সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউএ ফরওয়াড ব্লক অফিসের সামনে শোকমিছিল আসে। নেতৃবৃন্দ মালা ও স্তবক দেবার পর আবার যাত্রা শুরু হয়। এসপ্লানেড হয়ে রাজভবনের সামনে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে এসে বিরতি, তারপর রেড রোড, জওহরলাল নেহরু রোড ধরে এলগিন রোডে নেতাজী ভবনে। তখন বিকাল সাড়ে তিনটা। নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু ও নেতাজীর বহু আত্মীয়স্বজন আগে হতেই পুষ্পমাল্য হাতে অপেক্ষা করছিলেন নেতাজী ভবনের দ্বারপ্রান্তে। শোক মিছিল পৌঁছতে বর্ষীয়ান শ্রীবসু লরিতে শায়িত মরদেহ দেখে কেঁদে ফেলেন। পুষ্প-বলয় অর্পণ করে তিনি চোখ মুছতে মুছতে বলেন, এই বয়োবৃদ্ধ সহজ সরল লোকটিকে খুন করে কী উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে বুঝি না। যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা ব্যর্থ

হবেই। ওই সময় মহিলাদের অনেককে কাঁদতে দেখা যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সহযোগী হেমন্তবাবু দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানের মন্ত্র নিয়ে ওই ভবনে তাঁর রাজনৈতিক গুরুর সান্নিধ্যে কতদিন কাটিয়েছেন। নেতাজীর অন্তর্ধানের পরও কতবার এসেছেন নানা অনুষ্ঠানে। আজ বুঝি শেষ নমস্কার জানিয়ে গেলেন।

এর পর মিছিল এগিয়ে যায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানের পথে। দুপুর হতে সারা দক্ষিণ কলকাতা যেন পথে নেমে পড়ে। জগুবাবুর বাজার হতে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড়, সর্বত্র শোকাকুল জনতা, যেন বিশাল জনসমুদ্র। ছাদ বারান্দা অলিন্দ কোথাও তিল ধারণের ঠাঁইটুকু নেই। শুধু মানুষ আর মানুষ।

ঠিক পাঁচটা দশ মিনিটে মরদেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে উপনীত হয়। আদি গঙ্গাতীরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিমন্দিরের সামনে সবুজ ঘাসে ঘেরা চিতাশয্যা প্রস্তুত। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ বাহিনীকে হিমসিম খেতে হয়। স্মৃতিমন্দিরের ছাদে, আশে-পাশের বাড়ির বারান্দায়, অলিন্দে শোকাকুল জনতার সমাবেশ।

পুরোহিত শাস্ত্রীয় বিধি অনুয়ায়ী চিতাশয্যায় পুণ্য গঙ্গার জল ছিটিয়ে দেন। তারপর গীতা ও উপনিষদের শ্লোক পাঠের মধ্যে সন্ধ্যা পৌনে ছ'টায় মুখাগ্নি করেন স্বর্গত বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকান্তি বসু। ওই সময়ে বন্দেমাতরম জয় হিন্দ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করে তোলেন শোকাকুল জনতা। দেখতে দেখতে লেলিহান অগ্নি-শিখায় মরদেহ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

সব শেষ। আততায়ীর হাতে খুন হওয়া হেমন্ত বসুর মরদেহ

আজ সন্ধ্যায় দাহ করা হয়েছে। কেওড়াতলা শ্মশানে জননায়কের হাসিভরা হাসিমাখানো মুখে যখন আগুন দেওয়া হয়, তখন ঐ অঞ্চল লোকারণ্য। সে অরণ্য মূক, মৌন নয়, প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়া মানুষের চোখে নোনতা জলের পাশেই ছিল জ্বলন্ত আগুন।

সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা। শোকযাত্রার আট কিলোমিটার পথ যেতে সময় লেগেছে আট ঘণ্টা। শান্তির শত্রুর নৃশংসতা এবং প্রিয় নেতাকে শেষ বারের মত দেখার জন্য মহানগরী আজ ভেঙ্গে পড়েছিল রাস্তায়। আজ যেখানেই হেমন্ত বসু সেখানেই মানুষ আর মানুষ। গরীব দেশনেতার শেষ যাত্রাকে কয়েকজন খুনী রাজকীয় মর্যাদা দিতে সাহায্য করেছে। পালিয়ে যাবার আগে যাঁকে তারা খুন করতে চেয়েছিল, তিনি রাজা হয়ে রইলেন। এবং যে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর আর সম্পর্ক রইল না, মৃত্যুর পরও তিনি সম্ভবত তাকে নতুন মোড় দিতে পারবেন। পঞ্চাশ হাজার মানুষের মিছিল, ফরওয়ারড ব্লক আর কংগ্রেস কর্মীরা এক তালে চলেছেন। পি এস পি, কম্যুনিস্ট পার্টি, এস ইউ সি, এস এস পি কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছেন। জনসংঘের কর্মীরাও শোক মিছিলে শামিল। শহীদ হেমন্ত বসুকে তাঁর গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি-সৌধের পাশেই দাহ করা হয়। এই বিশেষ স্থানে দাহ করার জন্য করপোরেশনের অনুমতি দরকার। এক্ষেত্রে আশা করা হয়েছিল করপোরেশনই হয়তো কিছু করবেন। করপোরেশন কোন ব্যবস্থাই করেননি। মৃত্যুর পরও হেমন্ত বসু তাই জবরদখলকারী হিসেবে চিহ্নিত থাকবেন। হকারদের আন্দোলনে তিনি চিরদিনই পুরো-ভাগে ছিলেন। নকশালপন্থীদের পক্ষেও হেমন্ত বসুকে শ্রদ্ধা জানাতে মাল্যদান করা হয়। এ ব্যাপারটি ঘটে শ্যামপুকুরে। ঐ ফুলের মালায় দুটো কথা ছিল "ভোট নয় বুলেট চাই। শান্তি নয় বদলা চাই"—

সি-পি-আই এম-এল। মহাজাতি সদন, কম্যুনিস্ট পার্টি অফিস, ফরওয়ার্ড ব্লক অফিস, নেতাজী ভবন—সব শেষে মহাশ্মশান, সমুদ্র-ঢেউয়ের মত ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ মানুষের ঢেউ সারা পথ ঢেকে ছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর শেষ যাত্রার পর এত বড় শোকমিছিল এই মহানগরীতে আর হয় নি। শেষ সময়টিতে রাসবিহারী মোড় থেকে সাহানগর অবধি তিল ধারনের স্থান ছিল না। দশ হাজার লোক ঘেরা জায়গাটুকুতেও ঢুকে পড়েন। ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের পক্ষেও চিতা রক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবস্থা আয়ত্তে আনতে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা অশোক ঘোষকে বক্তৃতা করতে হয়। তিনি বলেন, শোক করব না। বাংলাদেশ হেমন্ত বসুর রক্ত কিছুতেই সহজভাবে নেবে না। সাধারণ মানুষ বদলা নেবেই। বহ্নিমান চিতার পাশে দাঁড়িয়ে কর্মীরাও "বদলা চাই" ধ্বনি তোলেন। এই সময় ভীড় আরো বেড়ে যায় এবং তার ছিঁড়ে যাওয়ায় রেডিওতে ধারাবিবরণী বন্ধ হয়ে যায়।

মানুষ আর মানুষ, দেশবন্ধু পার্কের ভিতরে যেমন বাইরে সেইরকম। এরা মৌন নন, স-রব। সকলেই কিছু না কিছু বলছেন। নিম্নকণ্ঠের কোরাসে ক্রোধ আর ক্ষোভ। পার্কের সামনে একটা বাড়ীর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। আমাদের সামনেই চার বাতির দীপটি। কাল সারারাত ধরে ছেলেরা ওখানে বেদী তৈরী করেছে। রাত দশটায় এসেছে বালি আর সিমেন্ট। কাজ চলেছে রাত একটার পরও। বাতি-দীপটি অনেক উঁচু, ঘেরা, লোহার বেড়ার উপরে রকমারী পার্টি পতাকা। ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, পি এস পি, জনসংঘ। দীপের গায়ে অনেক পোস্টার, তাতে লেখা "হিংসার বিরুদ্ধে দাঁড়ান—হেমন্তদা লহো প্রণাম"—"অজাতশত্রু হেমন্তদাকে আমরা কোনদিন ভুলব না।"

পার্কের ভিতরে কর্পোরেশনের একটা বাড়ী। তার ছাদ কানায় কানায় ভরা। শিশুদের মেলা। পার্কের রেলিংয়ে তরুণেরা ভীড় করে বসে। পার্কের ভিতরে মানুষ, গাছে মানুষ, বাড়ির ছাদে, জানালায়, ঝুলবারান্দায়, রাস্তায়—সর্বত্র শুধু মানুষ আর মানুষ। অষ্টাঙ্গ হাসপাতালের দিকে একটা পুলিশ ভ্যান। তার উল্টো দিকে রাস্তায় মালা হাতে অনেকে দাঁড়িয়ে। কয়েকজন মহিলার হাতে ফুলের তোড়া। রোদ্দুর বাড়ছে। কথা ছিল শোক-মিছিল বেলা ন'টায় আসবে। এখন সাড়ে দশটা। মিছিলের দেখা নেই। মানুষ—শুধু মানুষ আসছে। মোটর সাইকেলে অনাদি দাস, স্টেশন ওয়াগনে অজিত বিশ্বাস। সাদা পাঞ্জাবির উপর ভাঁজ করা চাদর। পাশের একজন বললেন, অনেকটা হেমন্তদার মতো দেখাচ্ছে। আর-জি-কর রোডের দিক থেকে আর একটি মিছিল। সামনে কালো পতাকা। এদের মুখে কথা নেই। উল্টো দিক থেকে আরো একটা—এরা কিন্তু সবাক-সোচ্চার। চক্রাকারে দাঁড়িয়ে কয়েকজন শ্লোগান দিচ্ছেন। উত্তেজিত কণ্ঠের কোরাস শুনছি "জবাব চাই, বদলা চাই, নেবই নেব।" এলেন অশোক সেন। কংগ্রেসকর্মীরা তাঁকে কালো ব্যাজ পরিয়ে দিলেন। দেখা যাচ্ছে দীনেশ দাশগুপ্তকে। কানাই ভট্টাচার্যকে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। এদিকে অজিত পাঁজা, ওদিকে অশোক দাশগুপ্ত, বিদ্যুৎ বসু, বিচারপতি শঙ্কর মিত্র, বরদা মুকুটমণি, হারপদ মজুমদার, বিমান মিত্র, চিত্ত বসু সকলেই এসেছেন। আর একটা নীরব মিছিল, সামনে অর্ধনমিত কংগ্রেস পতাকা। মালবিকা দত্ত, অপরেশ ভট্টাচার্য, নেপাল রায়। কংগ্রেসের আর একটা মিছিল। সরল দেব। আরো মিছিল। 'বন্দেমাতরম'। "ভুলছি না, ভুলব না, হেমন্তদা অমর রহে।"

দশটা পঞ্চাশ। মনে হচ্ছে শোক-মিছিল বুঝি এসে গেছে। একটা মোটর গাড়ি এল, তার ভিতর থেকে মাইক্রোফোনে জানানো

হল, মৃতদেহ হেমন্তদার বাড়ি এসে গেছে। জনসংঘের মিছিল। মালা, তোড়া, ফুল। কংগ্রেস কর্মীদের শ্লোগান—হেমন্তদাকে খুন করল কে ?

এগারোটা দশ। একটা কালো জীপ নীলাম্বর মুখার্জী স্ট্রীট থেকে এসে আর-জি-কর রোডের দিকে চলে গেল। শোক মিছিলের জন্য পথ করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সামনে যতদূরে চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। তাদের মাথার উপর দিয়ে বড় বড় মালা যেন এগিয়ে চলেছে। জনতার ঢেউ এগিয়ে আসছে, আসছে, আসছে। জনসমুদ্র। ওর মাঝে দেখা যাচ্ছে অপরাজিতা গোপ্পী, গীতা বসুমল্লিক, হরিপদ ভারতী, আরও অনেকে। এগারোটা পঁচিশ। মালা আর তোড়া দিয়ে মোড়া ট্রাকে হেমন্তদা এলেন। সামনে অর্ধনমিত ফরোয়ার্ড ব্লক পতাকা। হেমন্তদা বুঝি শুয়ে আছেন। চোখে চশমা। কপালে চন্দন। পাশে অমর চক্রবর্তী, ভক্তি মণ্ডল···

ট্রাকের সামনে উত্তাল সমুদ্র। ট্রাক এগুবে কি করে ? বনেটে তরুণেরা বসে আছেন। তাঁরা বলছেন, পথ করে দিন, যেতে দিন। 'যেতে নাহি দিব' কেউ বলছেন না, সকলেই একবার শেষ দেখা দেখে নিতে চান। যাঁরা মালা নিয়ে এসেছেন তাঁরা হেমন্তদার পায়ে ছোঁয়াতে চান। তাই হ'ল। নিহত নির্বিবাদী মানুষটি নীরবে শুয়ে আছেন। খুনীর ছুরি কিছু বিচার করেন নি। হেমন্তদার মুখে কিন্তু ভয় বা ক্রোধের চিহ্নটুকুও নেই। এতবড় আঘাত এমন প্রশান্ত ভাবে কেউ নিতে পারেন কি ? 'আমাকে মেরে তোমাদের কি লাভ ?' হেমন্তদার এ-কথায় রাজনীতিমত্ত খুনীর মন ভেজেনি।

জনতার সমুদ্র। এ-জনতা দুঃখে মৌন নয়, শোকে বিহ্বল নয়। প্রচণ্ড শোক আর প্রচণ্ড ক্রোধ। মানুষের চোখের ভাষা যাঁরা বোঝেন তারা বোধ হয় একথাই বলবেন। সকলে দেখছে। শেষবারের জন্য দেখছে। বুকে, মুখে খুনীর আঘাতের চিহ্ন। অনেকে

কাঁদছেন। অনেকে ক্রোধে ফেটে পড়ছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিসের সামনে—চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিসের একটি বাড়ীর সামনে ঝুল বারান্দায় আমরা। বেলা একটা কুড়ি। এ-জনতার চেহারা আলাদা। লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, ধুতি, শাড়ি, ফ্রক। হিন্দুস্থানী, শিখ, মুসলমান, বাঙালী। দুধারে ফুটপাত ছাপিয়ে রাস্তার অর্ধেকটা জুড়ে মানুষ আর মানুষ। আশেপাশে বাড়িগুলির ছাদে বারান্দায় মানুষের ভীড়। একটা পুলিশ ভ্যান। চারটে মিলিটারী ভ্যান। সাদা পোশাক পরা ট্রাফিক পুলিশ দিক ঠিক রাখছেন, দু'জন পুলিশ মটর সাইকেল চালিয়ে গেলেন। বৌবাজারের দিকে একটা পুলিশ ভ্যান। আরো একটা পুলিশ ভ্যান। দু'জন মোটর সাইকেল চালক পুলিশ, একটা কালো পুলিশ ভ্যান, একজন সাইকেল চালক। ফরওয়ার্ড ব্লকের অর্ধনমিত পতাকা সামনে করা একটি জীপ। কর্মীরা ধ্বনি দিচ্ছেন। ছেলেরা রাস্তায় বসে পড়ছে। দেরী হচ্ছে আসতে। ফুটপাতে মানুষের ওপর দিয়ে মালার মিছিল। হেঁটে চলেছেন মণি সান্যাল, কৃপাসিন্ধু সাহা। ফুলে আর মালায় সাজানো লরি এসে গেছে। সেই হেমন্তদা, শেষ শয্যায়। চশমা চোখে নীরবে শুয়ে আছেন। পাশে বসে আছেন কানাই ভট্টাচার্য, ভক্তি মণ্ডল, অজিত বিশ্বাস। ক্রোধ ফেটে পড়ছে জনতার চোখে। মালার মিছিল গিয়ে শেষ হল। লরিতে আর ধরছে না। মিছিল দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চলল। হেমন্তদা চলে গেলেন।

চারটে পঞ্চান্ন মিনিট। গৃহের ছাদে আশেপাশে অলিন্দে মানুষ আর মানুষ। শ্মশানঘাটের ভিতরে তত লোক নেই। মিছিল দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। প্রথম অংশটা এসে পৌঁছলো কেওড়াতলার কাছে। এখানকার ব্যবস্থা এখনও সুশৃঙ্খল। চারিদিকে হাজার হাজার মানুষ। নানারকম পতাকা এগিয়ে চলেছে। সবই অর্ধনমিত। হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসছে। এগিয়ে আসছে উথাল পাথাল

হয়ে। স্বেচ্ছাসেবকেরা বার বার আবেদন জানাচ্ছেন সুশৃঙ্খল হবার জন্য। কিন্তু জনতা উদ্বেল উত্তাল। কোন বাড়ীর ছাদেই তিলধারণের স্থান নেই। অনেকে গাছের মাথায়, অনেকে ঢাল্ ছাদে বিপজ্জনক ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন জনতা পূর্বের চেয়ে সুশৃঙ্খল। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ এসেছেন স্বর্গত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। যেখানে হেমন্ত বসুকে দাহ করা হবে সেখানে মালা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। দূরে একটি ট্রাক এগিয়ে। বহু বাড়ী থেকে ফুলের মালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে ট্রাক। প্রবীণ বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ নিজে আসতে পারেন নি। তিনি একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য পুষ্পমাল্য পাঠিয়েছেন শ্মশানে। ট্রাকটা ধীরে ধীরে শ্মশানের মুখে। মন্দিরের মত সাজানো হয়েছে ট্রাকটি, অজস্র পুষ্প সম্ভারে সুসজ্জিত। দেশবন্ধু স্মৃতিমন্দিরের পূর্বদিকে একটি স্থান ঘিরে রাখা হয়েছে। সেখানে চিতা সাজানো হবে। অজস্র মালা নিয়ে আসা হচ্ছে এখানে।

জনতা এখন উদ্দাম। জনতা ছুটে যাচ্ছে ট্রাকের দিকে—যেখানে হেমন্তদাকে দাহ করা হবে সেখানে। স্বেচ্ছাসেবকেরা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছেন। ধীরে ধীরে শবাধারটি বহন করে শ্মশানের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। বহু রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র ও যুব নেতা, রাজনীতিক দলের মিছিল শোক মিছিলের সঙ্গে এসে পৌঁছেছে। শ্যামবাজার থেকে প্রায় দশ ঘণ্টা পরে শবদেহটি কেওড়াতলায় নিয়ে আসা হল। হাজার হাজার মানুষ এই শবদেহের একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য এখন উদ্বেল। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে স্বেচ্ছাসেবকেরা দাঁড়িয়ে গেছে হাতে হাত ধরে। সকলেই কাছে আসার জন্য ব্যাকুল। চোখে এখনও সেই চশমা। মৃত্যুর পরও সেই প্রশান্ত ভাব তাঁর। সকলেই তাঁর পায়ের ধুলো নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। দেশবন্ধু মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে চিতা সজ্জিত করা হয়েছে। চিতাটা সাদা চাদরে ঢাকা।

তার উপরে একটি ফুল শুধু পড়ে আছে। শোকযাত্রীরা সবাই ভিতরে প্রবেশ করেন নি। সরু পথ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা আস্তে আস্তে জনতাকে ভিতরে আসতে দিচ্ছে। হেমন্তবাবুর আত্মীয়-স্বজন এসেছেন, রাজনৈতিক নেতারাও এসেছেন, সাধারণ মানুষও এসেছেন—সবাই উদ্বেলিত জনতার মধ্যে একাকার। ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি পতাকা দিয়ে হেমন্তবাবুর দেহ ঢাকা ছিল। এবার সেটি তুলে নেওয়া হল।

পাঁচটা কুড়ি মিনিট। এবার হেমন্তবাবুর দেহ চিতায় সজ্জিত করা হল। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত। জনতার ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। চিতার পূত অগ্নিতে এবার তাঁকে সমর্পণ করা হবে। পৃথিবীতে বহু মনীষী হিংসার বুকে আত্মদান করেছেন, হেমন্তবাবুও করলেন।

পাঁচটা তিরিশ মিনিট। হেমন্তবাবুর নশ্বর দেহ এখনও চিতায় শায়িত। এখন তাঁকে চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ১৮৯৫ সালে যে মহান প্রাণের সূচনা হয়েছিল, এই চিতাগ্নির সাথে সাথেই তাঁর মরদেহের সমাপ্তি। এখন চন্দন কাঠের দ্বারা তাঁর দেহ সজ্জিত করা হচ্ছে। মুখাগ্নি করবেন ভাইপো শ্রীঅমল বসু। জনতা ধ্বনি তুলল বন্দেমাতরম।

পাঁচটা চল্লিশ মিনিট। চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হল।

হরতাল, ধর্মঘট, বন্ধ্ যেখানেই হোক না কেন, বাংলাদেশ ২২শে ফেব্রুয়ারী একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলো। নতুন ইতিহাস না বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করলো বলা ভালো। কলকাতার নাম মিছিল-নগরী, আবার হরতাল-নগরীও শ্লেষভরে বলা হয়ে থাকে। বার বার হরতাল ধর্মঘটের ডাক আসে কিন্তু সেই ডাকে দলমত

নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ সাড়া দেন খুবই কম ঘটনায়। এমনি বিরল ঘটনা ঘটলো ২২শে ফেব্রুয়ারী হেমন্তকুমার বসুর হত্যার পর শোক দিবসে। হেমন্তকুমার বসুও নিজের জীবনে অনেক হরতাল ও ধর্মঘটের উদ্যোক্তা, মুখ্য নায়ক ছিলেন, কিন্তু আজকের হরতাল তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনকেই বুঝি হার মানালো। হরতাল বাংলাদেশে সম্প্রতিকালে যখনই হয়েছে তখনই কোন না কোন দল-মত হরতালের বিরোধী থেকেছে। কখনও সরকার বিরোধী থেকেছে। কিন্তু সরকার জনগণ হরতালে একাকার হয়ে গেছেন এমন ঘটনা খুবই কম ঘটেছে। রসিদ আলি দিবস, কাছাড়ে ভাষা আন্দোলনে যে শহীদ দিবস, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস, খাদ্য আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন—অনেক আন্দোলনেই হরতাল হয়েছে, কিন্তু ২২শের হরতালের সঙ্গে তুলনা হতে পারে একমাত্র ২৯শে জুলাই ১৯৪৬ সালের। সেইদিনের ইতিহাস সৃষ্টির মুখ্য নায়ক ছিলেন হেমন্তকুমার বসু।

শ্রীমৃণালকান্তি বসু তার স্মৃতিকথায় সেইদিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, "নিপীড়িত জনগণের প্রতি নিঃসংশয় সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য বাংলার সকল ইউনিয়নকে ডাক তার ধর্মঘটের সমর্থনে ২৯শে জুলাই সোমবার এক দিনের জন্য সর্বাত্মক ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়। কলকাতায় সর্বাত্মক ধর্মঘট।

বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, ছাত্র আন্দোলনে, শ্রমিক আন্দোলনে, বিপ্লববাদী আন্দোলনে কলিকাতা ও বাংলা বার বার নেতৃত্ব দিয়েছে। সৃষ্টি করেছে অত্যন্ত বিশিষ্ট অবদান, বার বার কেটেছে নূতন পথ। সৃষ্টিমূলক যুগান্তকারী ঘটনার জন্ম দিয়ে আন্দোলনকে বার বার একদিনে হয়তো এক মাসের পথ পার করিয়ে দিয়ে গেছে। করেছে তাকে গভীরতর বৃহত্তর স্তরে উন্নীত। ২৯শে জুলাই তারিখটিতে কলকাতার জনসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করলো। ভারতের

শ্রমিক আন্দোলনে এই দিনটা চিরকার জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে সন্দেহ নাই। যে ব্যাপক ধর্মঘট এবং জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হল, কলকাতা ও ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। দ্বিপ্রহরে ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের এক অতি বিরাট সমাবেশ হয়। সমগ্র ময়দান এক অকল্পনীয় বিশাল জন সমুদ্রের রূপ ধারণ করে। সভায় বক্তা ছিলেন শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ চারুচন্দ্র ব্যানার্জী, শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জী। বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলি, স্মরণকালের মধ্যে এমন ধর্মঘট আর হয় নাই। সকলেই নিজ থেকে এই ধর্মঘটে যোগদান করেছেন।"

(স্মৃতিকথা—৩৫২ পৃষ্ঠা)

একই ইতিহাস ও একই বর্ণনা ২২শে ফেব্রুয়ারীর। সকলেই হরতাল করেছেন, সকলেই ধর্মঘট করেছেন। কাউকে বলতে হয় নি, পিকেটিং করাও হয় নি। সরকারী দপ্তর সরকারী আদেশে বন্ধ। ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই ট্রেন বন্ধের আহ্বান ছিল না। কিন্তু সেদিন যাত্রী অভাবে ট্রেন চলে নি—আজ ট্রেনও বন্ধ। সেদিন ট্রেন চললেও মানুষ ওঠে নি, আজ ট্রেনের চালকেরাও ট্রেনের গতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। ২২শে ফেব্রুয়ারীর বর্ণনা দিয়েছে আনন্দবাজার, যুগান্তর, কালান্তর, স্টেটসম্যান। সকলেরই এক কথা—অভূতপূর্ব। হেমন্তকুমার বসু নিজে যত হরতাল ধর্মঘট সংগঠন করেছেন—এই হরতাল ধর্মঘট তাঁর পূর্বের সব কীর্তি ম্লান করে দিয়েছে।

"হত্যার প্রতিবাদে হরতাল। সারা বাংলায় শোক দিবস। প্রতিবাদে, জননেতার মর্মান্তিক মৃত্যুতে জনজীবন স্তব্ধ। সোমবার মহানগরী কোলকাতা সমেত সারা বাংলার দৃশ্য ছিল একই সঙ্গে শোক আর ক্ষোভের, সার্বিক সামগ্রিক ধিক্কারের। দলের সীমারেখা যেন এই একটি দিন মুছে গিয়েছিল: দুই জোট, তিন কংগ্রেস, অন্য আরো নানা দল। ডাক দিয়েছিলেন

সকলেই, অশৌচ পালনও করেছেন সকলেই। এই একটি দিনে সকলেই এক।

চলেনি ট্রাম, চলেনি বাস, ট্রেন প্লেন কিছু না। খোলেনি দোকানপাট অফিস-কাছারি, বন্দর থেকে একটি জাহাজও ছাড়েনি। হরতাল এ রাজ্যে নূতন কিছু নয়, সাম্প্রতিক কালে হয়েছে বহুবার, কিন্তু এবারের কর্মবিরতি যেন আকারে এবং প্রকারে ছিল স্বতন্ত্র। জোর ছিল না জবরদস্তিও ছিল না, সকলের স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাড়ায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়—দিনটি ছিল চিহ্নিত। মৌন মিছিল, শহীদ বেদী নির্মাণ ও তাতে মাল্যদান ছিল এই শোক দিবসের অন্যতম অঙ্গ। এদিন শুধু হরতালের দিন ছিল না, ছিল শোক পালনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনেরও দিন। শ্যামপুকুর স্ট্রীটে ৩৪নং বাড়ীর ফটকের সামনে এদিন শহীদ বেদী বহু মানুষের আসা যাওয়ায়, শ্রদ্ধা নিবেদনে যেন তীর্থভূমির রূপ নেয়। শহীদ বেদীর পাশের কালো পতাকার সার্থকতা সমস্ত রাজ্যের এদিনের নিস্তব্ধতার আস্তরণে স্বতঃস্ফূর্ত। গোটা রাজ্যের রাস্তা একেবারে ফাঁকা। যেন গ্রীষ্মের দুপুরে ঘুমের ক্লান্তিতে অবসন্ন। শহর কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের সব কিছু বন্ধ। রাজ্য সরকার আগেই ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারেরও কোন অফিস খোলেনি। এমনকি ডাকঘর পর্যন্ত। এই হরতাল করার জন্য কোন দল বা জোটের কর্মীদের রাস্তায় নামতে কিংবা প্রচার করতে হয়নি। বিন্দুমাত্র ভীতি বা আশঙ্কার প্রশ্ন ছিল না। তবুও হরতাল সর্বাত্মক সফল। অলি-গলিতে পানের দোকান পর্যন্ত বন্ধ। বহু রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলা হয়, খুন জখম হিংসা ও সন্ত্রাসকে পরাভূত করার জন্য জনসাধারণ যে সংঘবদ্ধ তা এদিনের হরতালের মধ্যে ফুটে উঠেছে। নব কংগ্রেস প্রভাবিত যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের কর্মীরা নানা জায়গায় অনশন করে এ দিনটি পালন

করেন। হরতালের শুরু হয় সোমবার ভোর ছ'টা থেকে, শেষ হবে মঙ্গলবার ভোর ছ'টায়। পুরোপুরি চব্বিশ ঘণ্টা বাংলা বন্ধ।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

"বাংলা বন্‌ধঃ বরেণ্য নেতার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর শোকাঞ্জলি। সম্প্রতিকালে অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল—কলকাতা ২২শে ফেব্রুয়ারী।

এই হরতালের কোন প্রতিপক্ষ ছিল না। সর্বজন শ্রদ্ধেয় হেমন্তদার হত্যার বিরুদ্ধে ধিক্কার চিহ্ন হিসাবে আজ সারা পশ্চিম বাংলায় হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলা সরকারও প্রাক্তন মন্ত্রী ও মহান নেতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এদিন রাজ্যের সকল সরকারী অফিস ছুটি দিয়েছেন। কলিকাতা হাইকোর্ট এবং অধস্তন কোর্টগুলিও ঐদিন ছুটি ছিল। রেল কর্তৃপক্ষ এবং অসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ হাওড়া ও কলকাতা থেকে কোন ট্রেন ও বিমান চালান নি। রাজ্যের দোকান, হাট-বাজার এবং সওদাগরী সংস্থা, শেয়ার মার্কেট প্রভৃতি সবই আজ স্তব্ধ ছিল। আজকের হরতালের দিনে সারা কলকাতা ও শহরতলীতে কোন পিকেটিং ছিল না। রাস্তায় কোন ব্যারিকেড তৈরী হয়নি। কেবল মাঝে মাঝে রাস্তার উপর হেমন্তদার ছবি দিয়ে "শহীদ বেদী" তৈরী করা হয়েছে এবং সেখানে পথসভাগুলিতে হেমন্তদার হত্যাকারীদের ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে রাজ্যের কোথাও তেমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে পালনের জন্য পশ্চিম বাংলার সকল রাজনৈতিক দল জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কলকাতা শহরে বা রাজ্যের অন্যত্র এমন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল সাম্প্রতিককালে দেখা যায়নি এবং এই হরতালের জন্য কারও মুখে কোন ক্ষোভ শোনা যায়নি।

শহর কলকাতায় প্রতিটি রাস্তায় চিরাচরিত হরতালের রূপটি ফুটে উঠেছিল। বিশেষ বিশেষ রাস্তার মোড়ে পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা থাকলেও ট্রাফিক পুলিশ বড় একটা চোখে পড়েনি। পথের সমস্ত রকম যানবাহন সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। কিন্তু জরুরী সংস্থার গাড়িগুলি নির্বিঘ্নেই চলাচল করেছিল। শিয়ালদা ও হাওড়া রেল স্টেশনে সমস্ত রকম ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় স্টেশন প্ল্যাটফর্মে নিত্যকার জনবহুল দৃশ্য চোখে পড়েনি। বিমান বন্দর স্তব্ধ ছিল। প্রায় সমস্ত কলকাতা শহরের চেহারাই এক রকম ছিল। সকালে সর্বত্র ফাঁকা ফাঁকা থাকলেও বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে জননেতা শ্রীহেমন্ত বসুর স্মরণে শহীদ বেদী নির্মাণ করে অনেককেই জড়ো হয়ে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা গেছে। এছাড়া সকালের দিকে বিভিন্ন মহল্লায় শ্রীবসুর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করার দাবী জানিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মিছিল বার করা হয়। রাজ্যের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা, ইউ-এল-এফ, ইউ-এল-ডি-এফ, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (শাসক), রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ১২ই জুলাই কমিটি ও সংগঠন কংগ্রেসের ছাত্র শাখার পক্ষ থেকে আজকের বন্‌ধ ও ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল।" (যুগান্তর)

মিছিল শেষ, কিন্তু প্রশ্নের শেষ নয়। কেন এই নির্মম হত্যাকাণ্ড? কেন এই গুপ্তহত্যা? প্রায় ৪০ বৎসর আগে এমনি এক প্রশ্ন দেশবাসীর সম্মুখে রেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, আর তাঁর পাশে যাঁরা সেদিন ছিলেন, তার অন্যতম হলেন শ্রীহেমন্তকুমার বসু। হিজলী বন্দীশালায় গুলি চালনায় নিহত হলেন সন্তোষ মিত্র, তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। কলকাতা থেকে ছুটে গেলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু। তারপর মৃতদেহ নিয়ে আসা হ'ল

হাওড়ায়। হাওড়া থেকে কলকাতা। সেইদিন সুভাষচন্দ্রের আহ্বান ছিল, শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। আজ নেতাজী নেই এবং নেতাজীর সেইদিনের সহকর্মী হেমন্ত বসু গুপ্ত-ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়ে আহ্বান জানিয়ে গেলেন—প্রতিরোধ করতে হবে এই গুপ্তহত্যার। সেই দিনের সেই হিজলী থেকে সন্তোষ মিত্র, তারকেশ্বর সেনগুপ্তের শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রার বর্ণনা রয়েছে শ্রীশৈলেশ দে-র 'আমি সুভাষ বলছি' গ্রন্থে।

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে মেদিনীপুর জেলার হিজলী বন্দীনিবাসে বিনাবিচারে আটক প্রায় শ-দুয়েক রাজবন্দীর উপর রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময়, যখন সকলে খাওয়া দাওয়া গল্পগুজব ইত্যাদিতে রত সেই অবস্থায় অকস্মাৎ তাদের ওপর গুলী বর্ষণ শুরু হয়ে গেল ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসারের আদেশে। গুলীতে নিহত হলেন তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুভাষের সহপাঠী বন্ধু সন্তোষ মিত্র। আহত হলেন একশ'য়ের চাইতেও বেশী। খবর পেয়ে সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছুটে গেলেন হিজলী। ফিরে এলেন দুই শহীদের মৃতদেহ নিয়ে কলকাতায়। হাওড়া স্টেশন থেকে কেওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত সে মর্মস্পর্শী দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। এমন সুসংবদ্ধ এমন বেদনাকাতর মিছিলের দৃশ্য কলকাতাবাসী কমই দেখেছে। সুভাষচন্দ্রের সেদিনের সেই আবেগময়ী ভাষণও দেশবাসী কমই শুনেছে। দেশবাসীর কাছে এক আবেদনে সুভাষ আহ্বান জানালেন—

"আমি খড়্গপুর হইতে অবর্ণনীয় বেদনা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাদের বন্ধুদের জেলের মধ্যে কুকুরবিড়ালের মত গুলী করিয়া মারিবে আর আমরা কি এখনো বিবাদ-বিসম্বাদে রত থাকিব। সকল বিভেদ ভুলিয়া আজ আমাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইবে, শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।"

নিঃশত্রু নায়ক হেমন্ত বসু

১৯০০ সালের পূর্বের কথা। সেই কালে বাঙালীকে ভীরু কাপুরুষ বলে কলঙ্ক দেওয়া হত। বাঙালী জাতির অপবাদ ঘোচাতে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের একদল সুসন্তান। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের প্রস্তুতিতে যে কজন বাঙালী কালজয়ী অবদান সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় যুগস্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের সুমহান ঐতিহ্য প্রচার করে বিশ্বসভায় বাঙালী তথা ভারতবাসীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বিবেকানন্দ প্রার্থনা জানালেন, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর।"

একই সময়ে সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও আনন্দমঠ লিখে বঙ্গজননীর শৃঙ্খলমোচনে ভবিষ্যৎ বিপ্লব আয়োজনের সঙ্কেত জানালেন এবং দেশমাতৃকার আরাধনায় "বন্দেমাতরম" বীজমন্ত্রে সমগ্র জাতির মধ্যে তেজ ও শক্তি সঞ্চার করলেন। আর এই সময়ে ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গন ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার পথে বেরিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, মিলিত হয়েছেন নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে। অর্থাৎ কলকাতায় যেসময়ে বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—ত্রয়ীর প্রভাব পড়েছে—সেই সময়ে ১৮৯৫ সালে শুক্রবার ৫ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন হেমন্তকুমার বসু। ৩/১, নন্দরাম সেন স্ট্রীটে পিসিমার বাড়িতে জন্ম হয় হেমন্তকুমারের। পিতামাতার চতুর্থ সন্তান, পুত্রদের মধ্যে তৃতীয়। পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু অ্যাটর্নি অফিসে কাজ করেন। অত্যধিক নিয়মনিষ্ঠ মানুষ। মাতা অন্নদাসুন্দরী দেবী। বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যেই জীবন কাটে। বড় ভাই হরিদাস বসু, মেজ ভাই বিষ্ণুদাস বসু। বড় দুই ভাইয়ের সঙ্গে হেমন্তকুমার ভর্তি হলেন কলকাতার এরিয়ান ইনস্টিটিউশনে। স্কুলের শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ সরকারের প্রথম থেকেই নজর পড়ল ছেলেটির উপর। শুধু শিক্ষক

শৈলেন্দ্রনাথ সরকারই নয়, ওপাড়ার অনেকেই তাকিয়ে দেখতেন ছেলেটিকে। বাইরের রকে বসে থাকেন। কিঞ্চিৎ স্থূলকায় শান্ত-প্রকৃতির ছেলেটিকে দেখে পথের মানুষ একটু আদর করে যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিদাস বসুর ভাইকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে বেশীর ভাগ সময় কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে ঘুরতে হত। কিন্তু এই শান্ত স্বভাবের মধ্যে একটা দৃঢ়তার দিকও ছিল। সেটা হল ভয়ানক জেদ। হরিদাসবাবুর ভাষায়: "দশ-বারো বৎসর বা তার চেয়েও কিছু বেশি বয়স পর্যন্ত ভয়ানক জেদী ছিল হেমন্ত। একবার যা মনস্থ করত সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজেও শান্ত হত না, অন্যকেও রেহাই দিত না। বিশেষ করে মাতৃদেবীর ওকে নিয়ে ব্যস্ততা ছিল সবচেয়ে বেশী। বহু সময় তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না, হেমন্ত কী চায় এবং কী পেলে খুশী হয়। কিসে খুশী হবে। হেমন্তর এই জেদী স্বভাব স্বতন্ত্র ধারায় তার সমস্ত জীবন প্রভাবিত করেছিল।"

১৯৫৫ সাল—এখন হেমন্তকুমার বসু প্রায় বৃদ্ধ। গোয়া মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে। হেমন্তকুমার বসু ঘোষণা করলেন, '৯ই আগস্ট পুণ্যদিনে সালাজারের রাজত্বে সত্যাগ্রহ করবেন।' ৩রা আগস্ট হাওড়া থেকে রওনা হবেন সত্যাগ্রহী দল নিয়ে। ষাট বৎসর বয়সে হেমন্ত বসু যাবেন গোয়া অভিযানে—এই সংবাদে সারা দেশ বিচলিত হল। কারণ সালাজার সরকারের নির্যাতন-ব্যবস্থা ছিল অমানুষিক—বিচারের নামে শাস্তি ছিল কঠোর। পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা অথবা পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে নিয়ে গিয়ে বিশ-ত্রিশ বছরের জন্য আটক রাখা হামেসা ঘটছিল। খবর শুনে ছুটে এলেন নানু ঘোষ (বিভূতি ঘোষ)। নানু ঘোষ স্বর্গীয় অতুল ঘোষের সন্তান—যে অতুল ঘোষ অনুশীলন সমিতিতে সন্তানের স্নেহ ও মায়ায় হেমন্তকুমার বসুকে অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের মত মানুষ গড়ে

তুলবার চেষ্টা করেছেন। নান্নু ঘোষ হেমন্ত বসুর চল্লিশ বছরের সুহৃদ সঙ্গী সহকর্মী। রাজবল্লভ স্ট্রীটের বাড়ীতে এসে নান্নু ঘোষ বললেন, "আপনাকে গোয়া যেতে দেব না। আপনার বদলে দুশো ছেলেকে আমি দিচ্ছি, গোয়ায় গিয়ে সত্যাগ্রহ করবে। আপনার গোয়ায় সত্যাগ্রহ করতে যাবার আগে আমি আপনার বাড়ীতে সত্যাগ্রহ করব।" হেমন্ত বসুর এক কথা—"সে হয় না।"

তারপর? গোয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন ৩রা আগস্ট। হাওড়া স্টেশনে গাড়ী ছাড়বে, বোম্বে মেল, ৫৮ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে বাংলা দেশ থেকে চলেছেন হেমন্তকুমার বসু। যাট বৎসরের বৃদ্ধ হেমন্তকুমার বসু যৌবনের প্রতীক। সত্যাগ্রহীদের আত্মীয়-স্বজনরা এসেছেন বিদায় জানাতে। সকলের চোখে জল—চোখে জল যারা যাচ্ছে তাদেরও। কিন্তু জল নেই শুধু একজনের চোখে। তিনি হেমন্তকুমার বসু! গাড়ী ছাড়বার পূর্ব-মুহূর্তে সর্বক্ষণের সহচর ভাগ্নে জলু জড়িয়ে ধরল। আপনভোলা মানুষটিকে দিবারাত্র সে আগলে রাখে, বাড়ীতে মনে করিয়ে দেয় খাওয়ার সময়ের কথা, ভীড় ঠেলে বের করে নিয়ে আসে বিশ্রামের জন্য। নিজে হাতে নিজের জামা-কাপড় কাচতে বসলে জলু এগিয়ে দেয় জল সাবান। এককথায় জলু (সুনীলকুমার ঘোষ) সদাসতর্ক ভাবে আগলে রাখেন এই বৃদ্ধ শিশুটিকে।

ধীরে ধীরে হেমন্তকুমার নিজেকে মুক্ত করে নিলেন জলুর বাহুবেষ্টন থেকে। গাড়ী ছেড়ে দিল। কোন উপদেশ, কোন অনুরোধ, কোন চোখের জল আটকে রাখতে পারল না প্রায় নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও গোয়া অভিযানের পথ থেকে।

এরিয়ান ইনস্টিটিউশনে পড়াশুনা করেন, কিন্তু সেই বয়সেই দল বাঁধবার নেশা। সামান্য বয়স—সেই বয়সেই উদ্যোগ নিলেন স্কুলে সরস্বতী পুজো করতে হবে। স্কুল-কলেজে পুজো, বারোয়ারী পুজো,

আজকের মত তখন সংক্রমিত হয়নি। বাড়ীর বাইরে সমবেতভাবে পূজো অনুষ্ঠান তখন অতি বিরল ঘটনা। বৈশিষ্ট্য শুধু পূজো সংগঠনের মধ্যে দিয়েই নয়—বৈশিষ্ট্য পুরোহিত নির্বাচনেও। সরস্বতী পূজো হবে—পূজো করবে স্কুলের ছাত্র চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক, প্রথিতযশা সাংবাদিক, প্রাক্তন এম. পি. শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য সেইদিন পট্টবস্ত্র পরিধান করে বসেছিলেন সরস্বতী পূজায়। আর তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করে অঞ্জলি দিয়েছিলেন হেমন্তকুমার বসু—সর্বশুক্লা দেবী সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন মালিন্য মুক্তির। তাই তাঁর মনের কোন একটি কোণেও মলিনতা ছিল না। এই কথাই ধ্বনিত হয় ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে আততায়ীর হাতে মৃত্যুর পর দেশবন্ধুজায়া বাসন্তী দেবীর কণ্ঠে—"এমন অমল মানুষটিকে যে কেউ মারতে পারে তা আমার ধারণার অতীত।" সরস্বতী পূজো—সে কি শুধু বিদ্যা-দেবীর আরাধনার জন্যেই? হেমন্তকুমার বসুর ভবিষ্যৎ জীবন কিন্তু সে খাতে প্রবাহিত হয়নি। সেদিন পূজার পুরোহিত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ভাবীকালে কৃতী ছাত্ররূপে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—কিন্তু হেমন্তকুমার বসুর জীবনে সেইদিনকার পূজার উদ্দেশ্য শুধু বাগ্‌দেবীর আরাধনা নয়—পূজার উদ্দেশ্য ছিল সংগঠন। কারণ তখন কলকাতায়, বিশেষ করে উত্তর কলকাতায় নূতন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ১৯০২ সালে দোল-পূর্ণিমার দিন হেদুয়ার পাড়ে ২১ নম্বর মদন মিত্র লেনে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়েছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে তাই হল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের শেষ উপদেশ "সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি—ইহা বিস্মৃত হইও না"—সমিতির মূল প্রেরণা জুগিয়েছিল। ব্যারিস্টার

পি মিত্রের পরিচালনায় অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে স্বজাতিকে পাশ্চাত্যজাতির সমকক্ষ করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছে। সরলা দেবী চৌধুরানী প্রবর্তন করেছেন বীরাষ্টমী ব্রত। স্বয়ং বীরাঙ্গনা বেশে ক্রীড়া দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কলকাতার মানুষকে। ব্যারিস্টার পি মিত্রের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, রজত রায়, রাসবিহারী ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বিপ্লববাদের মন্ত্রণা করে গুপ্তসমিতি গঠন করেছেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সৈনিকের বেশে অশ্বারোহন করে রাজপথে যুবকদিগকে উৎসাহিত করেছেন—ক্ষাত্রশক্তি জাগ্রতের ব্রত গ্রহণ করেছেন তিনি। বাঙালী যুবকদের অশ্বারোহণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডে একটি রাইডিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা হল। পরিচালনার ভার নিয়েছেন মন্মথ মিত্র, দেবব্রত মিত্র। প্রত্যেক সভ্য উচ্চারণ করেন :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

স্কুলের শিক্ষক ভোলানাথ বসু, যোগেশ চন্দ্র দত্ত ও শৈলেন্দ্র নাথ সরকার আকৃষ্ট হলেন বালক হেমন্তকুমারের প্রতি। এসে গেল ১৯০৫ সাল। ১৯০৫ সাল বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগ সন্ধিক্ষণ। "১৯০৫ সালে তদনীস্তন বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বাঙ্গালী জাতির অসাধারণ প্রতিভা ও অদ্ভুত সংগঠন বিনষ্ট করিবার উদ্দেশে বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার এক প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শাপে বর হইল। ইহাই জাতিকে সঞ্জীবনী সুধা যোগাইল। বঙ্গভঙ্গ নিরোধ করিবার জন্য এক তুমুল আন্দোলন হইল। তাহার সহিত বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলন চলিতে লাগিল। জাতির এক

নবজাগরণ হইল। দেশাত্মবোধের বীজবপন হইল। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অপরূপ ভাবের এক প্রবল বন্যা আসিল। ওজস্বিনী বাগ্মিতায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে মাতাইয়া তুলিলেন। কণ্ঠে কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। সমগ্র জাতি 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। সমিতির খিদিরপুর শাখায় প্রধান শিক্ষাব্রতী আশুতোষ ঘোষ ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি প্রতাপাদিত্য উৎসব উপলক্ষে সর্বপ্রথম 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি প্রচার করেন। তাহাই পরে প্রত্যেক সভায় প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। বন্দেমাতরম সঙ্গীত এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা আনয়ন করিল। জাতীয় একতা বৃদ্ধির জন্য ৩০শে আশ্বিন রাখীবন্ধন অনুষ্ঠিত হইল। বাঙ্গালী অনুভব করিল "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।" কালক্রমে বাংলার উন্মাদনা ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল এবং স্বাধীনতার পথ সুগম করিল। বাংলার সেই অভিনব যুগের তুলনা নাই, বাংলার যুবক সম্প্রদায় তাহাতে আশ্চর্যরূপে সাড়া দিয়া উঠিল।

(অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ৮-৯ পৃষ্ঠা)

বঙ্গভঙ্গ রোধের দাবীতে গর্জে উঠেছে বাংলাদেশ। প্রথম সভা হল, ১৯০৫ সালে স্টার থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে। বিপিনচন্দ্র পাল শ্রোতৃ-মণ্ডলিকে বঙ্গভঙ্গের বিষক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অবহিত করে বললেন, তিনি প্রস্তাব করেন যে ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিজ্যনৈতিক ঠাটবাটকে বয়কট করতে হবে। বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের মধ্যে জাতকে উঠতে হবে। ইংরেজের চাকরী আদালত শিক্ষায়তন বাণিজ্য বর্জন করতে হবে। বিপিনচন্দ্রের এই আহ্বান সাড়া জাগালো দেশের মানুষের মধ্যে। এই সময়ে খিদিরপুরে মনসাতলা

ক্লাবে প্রতাপাদিত্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পি. মিত্র বললেন, "যে যুবক নিজেকে বলিষ্ঠ না করবে, আত্মরক্ষার কৌশলে অপারগ থাকবে, সমাজে তাঁর স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।" সভা ভঙ্গের পূর্বে স্বদেশপ্রেমের শিক্ষাব্রতী আশুতোষ ঘোষ মহাশয় সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন যে শিখদের 'ওঁয়া গুরুজিকা ফতে'-এর মত আজ সকলে সংকল্প করুন 'বন্দেমাতরমকে' উৎসাহ ধ্বনি হিসাবে ব্যবহার করবেন। সভায় ধ্বনি উঠল 'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম।'

বন্দেমাতরম। আকাশে বাতাসে এই ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। এক নূতন মন্ত্র পেল বাঙালী জাতি। স্কুলের ক্লাশে বসে হেমন্তকুমার কিশোর প্রাণে অনুভব করছেন এই নূতন যুগের আহ্বানকে। শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ সরকার মাঝে মাঝে শোনান বিপিন পালের কথা, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কথা, ঠাকুরবাড়ীর কথা।

১৯০৫ সাল, ৭ই আগস্ট। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতা টাউন হলে সভা হবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করবেন, বক্তৃতা করবেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ক্লাশ থেকে বেরিয়ে পড়লেন হেমন্তকুমার বসু। সঙ্গে শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ সরকার। উত্তর কলকাতার এরিয়ান স্কুল থেকে টাউন হলের দূরত্ব অনেক। শুধু হেমন্ত বসুই নয় স্কুলের আরও অনেক ছাত্রই বেরিয়ে পড়েছে—'চলো টাউন হল চলো'।

টাউন হলে সভা আরম্ভের অনেক আগেই তিল ধারণের স্থান ছিল না। টাউন হলের বাইরে পুরীর রথের ভিড় এই দিন, দিন হিসেবে ছিল উল্টোরথের দিন। সেই সভাতেও একটি মাত্র ধ্বনি 'বন্দেমাতরম'। রুদ্ধ মন্দিরের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিত এই ধ্বনি দ্বারে দ্বারে ধাক্কা দিয়ে আগল ভেঙ্গে দিতে লাগল। সব বাধা, বিপত্তি, ভয় এই অভয় মন্ত্রে তুচ্ছ হয়ে গেল। হেমন্তকুমার সভায় হারিয়ে গেলেন, হারিয়ে ফেললেন নিজেকেও। অনেক ভীড়ের

মধ্যে খুঁজে বড়দাদা হরিদাস বসু বের করলেন হেমন্তকুমারকে। হাজার হাজার মানুষ টাউন হলের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢোকার সুযোগ পায়নি, কিন্তু হেমন্তকুমার একবারে মঞ্চের কাছে। বক্তৃতা শুনছেন, না শুনছেন না, তিনি কাঁদছেন। ফিরে এলেন বাড়িতে। হরিদাস বসু এই দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন—"এদিন থেকে হেমন্তর ভাবান্তর ঘটতে শুরু করল। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ত, মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত বাড়ি থেকে, অনেক পরে জানলাম হেমন্ত অনুশীলন সমিতিতে যাতায়াত শুরু করেছে। বিচারপতি সারদা মিত্রের ছোটভাই ষোড়শী মিত্রের মাঠ ছিল। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনুশীলন সমিতির একটা শাখা। সিমলায় প্রতিষ্ঠিত সমিতি-তেও ওর যাতায়াত। অনুশীলন সমিতির নূতন শাখা উদ্বোধন করলেন সতীশচন্দ্র বসু। উলুবেড়িয়া থেকে অতুল ঘোষ এখানে লাঠি খেলা শেখাতেন, তরবারি খেলা শেখাতেন কানাইবাবু।"

৩০শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর সব বাদ-প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ইংরেজ সরকার বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী করল। বাংলা এই দিনকে শোকের দিন বলে গণ্য করল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা নিল, এই কালি তারা মুছে ফেলবেই। "কলকাতায় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা ধর্মঘট করল (হরতাল কথাটা তখনও চালু হয়নি)। আমরা এদের মধ্যে কাজ করতাম। সেজন্য মজুররা রাজনীতিক কারণে এগিয়ে এল। ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিকদের ধর্মঘট। কলকাতা ও মফস্বলে দোকান বাজার বন্ধ রইল, ছাত্ররা স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল। অরন্ধন ও রাখীবন্ধন পালন হল, রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধনের মন্ত্র দিয়েছিলেন "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই।" খালি পায়ে সংযত ভাবে দিন যাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল। বৈকালে সভা সমিতিতে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী নেতাদের নির্দেশে প্রতিজ্ঞা করল যে, সেদিন হতে বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত বিলেতী বস্ত্র

বর্জন ও স্বদেশী জিনিস গ্রহণ করবে। সারা বাংলায় এরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করা হল।

ফেডারেশনের মাঠে মহতী সভা হল। মূক বধির স্কুল ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল মাঠটি। এখানে একটি সারা ভারতের সম্মেলনের ঘর গড়ে উঠবে, নাম হবে—ফেডারেশন হল। এই সভায় একটি বড় করুণ ঘটনা দর্শকদের মন গলিয়ে দিল। প্রবীণ নেতা ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু রোগশয্যা থেকে চেয়ারে আনীত হলেন। কি প্রাণস্পর্শী হ'ল সেদিনকার তাঁর ভাষণটি। তিনি বললেন,—তথাগত ভগবান বুদ্ধের জন্মের সময় একজন প্রাচীন ঋষি জানতে পেরেছিলেন এক মহাপুরুষ আসছেন। তেমনি তিনি আজ জানতে পেরেছেন এক নূতন জাতির জন্ম-সম্ভাবনা। জাতির এত বড় সম্ভাবনা ভেবে তিনি আকুল আনন্দে অশ্রু বিগলিত হয়ে পড়ছেন!

সেই সভায় শ্রোতাদের এবং পরদিনের দৈনিক পত্রিকাগুলির মারফত পাঠকদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হল। তিনি নিজে বক্তৃতা দিতে পারেন নি। রাষ্ট্রাধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজীতে ভাষণটি পড়েন। আনন্দমোহন সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সভাপতি হবার প্রস্তাব করেন। সভাপতির ভাষণ পাঠের পর একটি ঘোষণা করা হয়। সেটি ইংরাজীতে পাঠ করেন (স্যার) আশুতোষ চৌধুরী এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার মূল অংশ, যেহেতু বাঙালী জাতির একান্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সরকার দেশকে বিভক্ত করেছেন, সেজন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে মাতৃভূমির অখণ্ড জাতীয় একতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করব। ভগবান আমাদের সহায় হউন!" (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি। ২১৯-২০ পৃষ্ঠা)

এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন বয়কট বা বর্জন নীতি শুধু

ইংরেজের তৈরী কাপড় লবণ মনোহারী দ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। শাসন বিষয়ে বয়কট করে আত্মশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বাংলার নিজস্ব বাউল সুরে তিনি গান লিখলেন। ১৬ই অক্টোবর কবি লিখলেন 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল' গানটি। সেদিন অরন্ধন হবে। লোকে গঙ্গাস্নানে যাবে, পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধবে। হেমন্তকুমার বসু তখন থাকেন ১০ নম্বর মল্লিক লেনের বাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে মিছিল বেরুবার আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন হেমন্তকুমার। মিছিলের পুরোভাগে রবীন্দ্রনাথ। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন, ভদ্র-অভদ্র স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার না করে রাখী বাঁধছেন। মুসলমান গাড়োয়ান বিস্মিত হতবাক। রবীন্দ্রনাথ তার হাতে রাখী বেঁধে দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ বাঁধছেন যত তার চেয়ে অনেক বেশী বাঁধছেন মিছিলের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা। হেমন্তকুমার তার মধ্যে একজন।

শুধু এ দিনের মিছিলেই নয়। অনুশীলন সমিতির ৪৯ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের সন্নিকটস্থ মদন মিত্র লেনের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয় রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ আসেন, গান গান।

"স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তে অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় কলিকাতাস্থ ৪৯নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের সন্নিকটস্থ মদন মিত্র লেনস্থিত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমিতির যুবসঙ্ঘের সহিত কয়েকবার মিলিত হন এবং সামান্য একটি কাঠের টুলে বসিয়া তাঁহার নবরচিত কয়েকটি বাউল গান প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাহিয়া শোনান। সেগুলির সাধারণ্যে প্রথম প্রচার এইরূপ হয়। নিম্নলিখিত গানগুলি এইরূপে সমিতির সভ্যাদিগকে তাহাদের ব্রতে উৎসাহিত করিবার জন্য মুখ্যত গঠিত হয়। কবির উদাত্ত কণ্ঠে গীত আহ্বানের শ্রোতা এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন।

১। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা

২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
৩। তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে
৪। আপনি অবশ হলি তবে বল দিবি তুই কারে
৫। নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে
৬। আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না
৭। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
৮। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার
৯। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
১০। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
১১। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

বলা বাহুল্য স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃসাহসিক ব্রতে ব্রতী যুবক-বৃন্দকে উদ্দীপনা যোগাইবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।"

এই সংযোগের সূত্র হিসাবে যতীন্দ্রনাথ আরও জানাইয়াছেন : "জোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনস্থিত শিবমন্দির প্রাঙ্গণে অনুশীলন সমিতির একটি শাখা খোলা হইয়াছিল। সেইখানে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ সভ্য হইয়াছিলেন। বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে। ঐ ক্লাবে পাড়ার ২০।২৫ জন যুবক মিলিত হইত। যতীন্দ্রনাথ বড় লাঠি ও Boxing শিখাইতেন। একদা রথীনের সাথে যতীন্দ্রনাথ রবিঠাকুরের বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। রবি ঠাকুর বলেন, 'তোমরা যুবক কর্মী, আমি কবি মানুষ। কবিতা লিখি, গান করি। তোমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তোমাদের মনকে জাগাবার জন্য কতকগুলি গান রচনা করব ও শোনাব।"

(অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)।

রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুরবাড়ী থেকে অনুশীলন সমিতির দপ্তরে নিয়ে

আসা এবং যাতায়াতের পথে অনেক সময় সঙ্গী হন হেমন্তকুমার। শুরু হয়ে গেল বিলাতী বয়কট আন্দোলন। গঠিত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। শ্রীঅরবিন্দ বরোদার মোটা মাইনের চাকরী ছেড়ে কলকাতায় এসে ৭৫ টাকা মাইনে নিয়ে জাতীয় শিক্ষালয়ের শিক্ষক হলেন। জাতীয় শিক্ষা তহবিলে লক্ষ টাকা দান করে জনগণের কাছে রাজা বলে গণ্য হলেন সুবোধ মল্লিক। সুরেন ব্যানার্জী, বিপিন পাল, আবদুল রসুল, মৌলবী লিয়াকত হোসেনের উদ্দীপনাময় বক্তৃতায়, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান ও কবিতার বন্যা প্রবাহে সারা দেশ তোলপাড় হয়ে উঠল। কিশোর হেমন্তকুমারের মনে এর প্রতিটি ধারা সঞ্চারিত হল।

"বেত মেরে কি মা ভুলাবি,
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
তখন কে পালাবে মা ফেলে ?"

১৯০৬ সাল। বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল। ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, অশ্বিনীকুমার দত্ত সর্বত্র ঘুরে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে প্রস্তুতিপর্ব শেষ করেছেন। জারি হল সরকারী ফতোয়া—সরকারী রাস্তায় প্রকাশ্য স্থানে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করা চলবে না। সরকারি আদেশ জারি হবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে যুবক নেমে এল রাস্তায়, ধ্বনি তুলল "বন্দেমাতরম"। বেত্রাঘাতে অগণিত যুবকের দেহ থেকে রক্ত ঝরে। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সরকারের শর্ত হল স্টেশনে কেউ "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দেবে না। সম্মেলনের পূর্বদিন সন্ধ্যায় বরিশালে এসে পৌঁছুলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি—সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বোস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, যাত্রামোহন সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উদ্যোক্তাদের "বন্দেমাতরম" ধ্বনি না দেবার শর্ত শুনে কৃষ্ণকুমার মিত্র চটে লাল। তিনি অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্যই গ্রহণ করলেন না। অবশেষে স্থির হল সম্মেলনের প্রথম দিন রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিয়ে শোভাযাত্রা করে মণ্ডপে যাবেন। নির্দিষ্ট সময়ে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি তুলে শোভাযাত্রা বের হল। গাড়ীতে চলেছেন সভাপতি আবদুল রসুল, পিছনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। শোভাযাত্রা যেইমাত্র রাস্তায় বেরিয়েছে অমনি শুরু হল পুলিশের লাঠি চালনা। চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা লাঠির ঘায়ে পার্শ্ববর্তী পুকুরে ছিটকে পড়লেন। সেই জলের মধ্যেই পুলিশের লাঠি চালনা চলছে আর চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিচ্ছেন। গ্রেপ্তার করা হল সুরেন্দ্রনাথকে। নিয়ে যাওয়া হল ম্যাজিস্ট্রেট এমার্শনের ভবনে। সরাসরি বিচারে ২০০ টাকা জরিমানা। রাষ্ট্রপতি সুরেন্দ্রনাথ এক-খানা চেয়ারে বসতে উদ্যত হওয়ায় আরো ২০০ টাকা জরিমানা ধরা হল।

সভার দ্বিতীয় দিন পুলিশ সভামণ্ডপে এসে হাজির। পুলিশের আদেশ "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করা হবে না—একমাত্র এই শর্তেই সভা করতে দেওয়া হবে। এই হীন শর্তে রাজী না হওয়ায় সভার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। বরিশাল থেকে কলকাতা—মুহূর্তে চলে এসেছে এই পুলিশ নির্যাতনের সংবাদ। আর কলকাতার রাস্তায় দলে দলে ছেলে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

১৯০৬ সাল—প্রকাশিত হল "বন্দেমাতরম", "যুগান্তর" পত্রিকা। "বন্দেমাতরম" "যুগান্তরে"র লেখকদের মধ্যে আছেন বিপিনচন্দ্র পাল,

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অরবিন্দ ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। নেপথ্যে রয়েছেন চিত্তরঞ্জন দাশ, সুবোধ মল্লিক।

১৯০৭ সাল—পুলিশ আরো ক্ষিপ্ত। কলকাতার শোভাবাজার, শ্যামবাজারের কাপড়ের দোকান গুণ্ডাদের দিয়ে লুঠ করিয়ে দেয় পুলিশ। আর বিডন স্কোয়ারে এসে লাঠি মারে নিরীহ পথচারীদের। যাত্রার দল, গানবাজনা হচ্ছে, কিন্তু লোককে কাপড় খুলে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেয়। তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছোটে। এমনি পরিস্থিতির মধ্যে বিডন স্কোয়ারে এক সভায় জড় হল একদল দামাল ছেলে। সমবেত-ভাবে চীৎকার করে "বন্দেমাতরম"। সেই দলে রয়েছে ১১ বছরের কিশোর হেমন্তকুমার। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়—প্রখ্যাত বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই—এককভাবে পুলিশ সার্জেণ্টের সামনে দাঁড়িয়ে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দেয়। পুলিশ গুরুতর প্রহারে তাকে আহত করে। ৪ঠা অক্টোবর তারিখে কয়েকজন যুবক বেনেটোলা স্ট্রীটের মোড়ে সার্জেণ্টদের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু বুক ফুলিয়ে "বন্দে-মাতরম"-ই বলে না—অত্যাচারী একজন সার্জেণ্টের হাত কেটে নেয়। "সন্ধ্যা" কাগজে বেরুল 'ফিরিঙ্গির থাবা সাবাড়'। মৌলবী লিয়াকত হোসেন যুবকদের জড়ো করে নিয়ে শ্যামবাজার, বাগবাজার সর্বত্র "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিয়ে বেড়ান আর চীৎকার করে বলেন, যারা পুলিশের ভয়ে পালাবে তারা মানুষ নয়, কুকুর বেড়াল। পুলিশের বর্বরতা দিন দিন বেড়ে ওঠে। গ্রেপ্তার হলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। নিজেই জবানবন্দী দিলেন হাকিমের সামনে। বিচারপতি কিংসফোর্ড সেই জবানবন্দী পড়ে অবাক। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জবানবন্দীতে লিখেছেন "I have done what I thought to be my duty to my country. You may neck out any punishment, I will bear it cheerfuly." ভূপেন্দ্রনাথের অপরাধ ছিল, একদিন "যুগান্তরে" তিনি লিখেছিলেন,

"রক্ত আমার উঠিছে নাচিয়া রুদ্ধ ধমনী বাহিয়া।" "বন্দেমাতরম" পত্রিকার উপর আনা হল রাজদ্রোহিতার মামলা। মামলায় সাক্ষী মানা হল বিপিনচন্দ্র পালকে। বিপিনচন্দ্র বলেন, "শপথও গ্রহণ করব না, সাক্ষ্যও দেব না।" অরবিন্দ জেলে, বিপিনচন্দ্রেরও জেল হল ছ মাস। "বন্দেমাতরম" মকদ্দমায় সরকার হারলো, অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

১৩ই আগস্ট ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হন। ব্রহ্মবান্ধব আদালতকে ও সরকারকে অস্বীকার করে এক বিবৃতি দেন। এইসব ঘটনা ও পরিবেশ যে অঞ্চলকে সদা সর্বদা অগ্নিগর্ভে পরিণত করেছে সেই উত্তর কলকাতার মধ্যখণ্ডে হেমন্তকুমার বসু বড় হয়ে উঠলেন।

১৯০৭ সাল—অর্ধোদয় যোগ। অর্ধোদয় যোগে বহু লক্ষ গঙ্গাস্নানার্থী কলকাতায় আসেন। 'আত্মোন্নতি' সমিতির মাধ্যমে হেমন্তকুমার বসুও নেমে পড়েছেন পুণ্যার্থীদের সেবায়। বহু মানুষ আশীর্বাদ করে গেল, স্বয়ং পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যালিডে বললেন, 'Unique'। এদিকে যেদিন শ্রীঅরবিন্দের মামলায় বিপিন পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন ও তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হল, সেইদিন সুশীল সেন এক সার্জেণ্টের হাতে প্রহৃত হয়। সুশীলও আদালতের মধ্যে সার্জেণ্টকে মারের বদলে মার দেয়। বিচার হয় সুশীলের। প্রকাশ্য জায়গায় দাঁড়িয়ে ১৫ ঘা বেত মারা হয় সুশীলের পিঠে। গুপ্তসমিতি বিচারপতির বিচার করে কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডের আদেশ জারি করে। অসমর্থিত তথ্যে এই প্রাণদণ্ডের আদেশ জারীর বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, চারু দত্ত, সুবোধ মল্লিক।

১৯০৮ সাল, এপ্রিল মাস। ৩০শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি নামে দু'জন সম্মুখ সংগ্রামে বোমা ছুঁড়লো কিংসফোর্ডের উদ্দেশ্যে।

নিহত হলেন কিংসফোর্ড ভ্রমে পিংলি কেনেডি নামে এক ইংরাজ মহিলা। সম্মুখ সংগ্রামে বাংলার প্রথম আত্মবিলয়ন করে 'শহিদ' হলেন প্রফুল্ল চাকি। ফাঁসির মঞ্চে প্রথম আরোহণ করে 'শহিদ' হলেন ক্ষুদিরাম বসু। দুইভাবে এঁরা দু'জনেই বাংলার প্রথম শহিদ। এঁদেরও পুরোধা দু'জন শহিদ বিপ্লবী বঙ্গে জন্ম নিয়েছিলেন। একজন তরুণ বিপ্লবী পুলিশের হাত থেকে সশস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষা করেছিলেন চন্দননগরের ধারে-কাছে চলন্ত ট্রেনের নীচে আত্মদান করে। অপর তরুণ উল্লাসকর দত্তের ফর্মুলা অনুসারে তৈরী বোমা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন 'দিঘিরিয়া' পাহাড়ে। সে তরুণ কিশোরের নাম প্রফুল্ল চক্রবর্তী। বোমা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রফুল্ল গেছেন বৈদ্যনাথে। সেটা ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। দিঘিরিয়া পাহাড়ে সেই বোমা। নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করার মুহূর্তে ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেল। পাহাড়, বন, দিক-দিগন্ত কাঁপিয়ে ফেটে গেল যথা সময়ের পূর্বেই ভীষণ বোমা। প্রফুল্ল নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বলি হলেন বিদ্রোহী কিশোর। কর্মনিরত এই কিশোর 'শহিদে'র জ্যোতিধারণ করে উর্ধ্বলোকে চলে গেলেন। কেউ জানলো না, কেউ শুনল না কি করে একটি বালক তাপস তাঁর আরব্ধ কর্ম সফল করতে গিয়ে সবার অলক্ষে আপন হৃৎপিণ্ড শত খণ্ড করে দান করে দেশজননীর ঋণ শোধ করলেন। চোখের জলে তাঁর পিতা-মাতা ভাই-বোন কত রাত্রে দুয়ার খুলে হয়তো বসে থাকতেন, কারো পদধ্বনি আচমকা শুনে হয়তো চমকে উঠতেন! কিন্তু পরম স্নেহাস্পদ সন্তান আর ফিরে এলো না! খবর না দিয়ে চলে গেছে, খবর না দিয়েই নিশ্চয় তার পুনরাগমন হবে—আকুল কান্নায় তাই ভেবে মা-বাবার সান্ত্বনা। কিন্তু তা তো হবার নয়!.........

এখানে মনে রাখতে হবে যে, প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মধ্য দিয়েই

উল্লাসকর দত্তের ফরমূলার কার্যকারিতা প্রমাণিত হল, এবং মানিকতলা কেন্দ্র থেকে সেই সব ফরমূলা অনুযায়ী প্রস্তুত বোমা দিয়ে প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু মাস দুই পরে গিয়েছিলেন অ্যাকশনে।.........

অরবিন্দ নিবেদিতার তরুণ বাংলার দুঃসহ পথে ভয়ঙ্কর যাত্রা শুরু হয়েছে সবার অজান্তে, মাঝে মাঝে দারুণ কর্মকাণ্ডে তার চোখ ঝলসানো রূপ দেখে বিস্মিত দেশবাসীর আত্মপ্রত্যয় জাগে, ব্রিটিশ শাসন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে সন্ত্রস্ত হয়।.........

মজঃফরপুর অ্যাকশনের তারিখ ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮ সন। তার একদিন পূর্বে অরবিন্দ তাঁর 'বন্দেমাতরম' কাগজে লিখেছিলেন, যার মর্মার্থ হল: কঠিন ও নিরঙ্কুশ 'বিপ্লব' তার প্রলয়ঙ্কর অভিযান রচনায় সক্রিয়। বিপুল পতন এবং তৎস্থলে নূতনতর বিরাট সৃষ্টি হবে সে বিপ্লবের পদক্ষেপে। আমরা অন্যরূপ চাইলেও গত্যন্তর নেই। বিধাতার ইচ্ছাই জয়ী হবে।

বৈদ্যনাথের পাহাড় শীর্ষে বোমা বিস্ফোরণে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যুতেই পুলিশ সচকিত হয়ে উঠেছিল। তাই অরবিন্দের নির্দেশে বৈদ্যনাথের বোমার আড্ডা কলকাতায় সরিয়ে আনা হল। কিন্তু মানিক-তলায়, মুরারিপুকুরের আড্ডায় বারীনবাবু তেমন সতর্ক হলেন না।

এরপর এলো মজঃফরপুর অ্যাকশনের সংবাদ। কিন্তু অরবিন্দের কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ আসা সত্ত্বেও বারীনবাবু অন্যায়ভাবে অসতর্কই থাকলেন। তাঁর অশোভন নিষ্ক্রিয়তার ফলে পুলিশ ২রা মে (১৯০৮) রাত্রিতে মুরারিপুকুরের আড্ডা থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র বোমা ও সন্দেহজনক কাগজপত্র সহ কতিপয় যুবককে গ্রেপ্তার করে। তা ছাড়া এই অসতর্কতার সুযোগে একই রাতে ১৫নং গোপী দত্ত লেন, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড, ৩৮/৪নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট ইত্যাদি আড্ডা-কেন্দ্র থেকেও মালপত্র সহ লোকজন ধরা পড়েন। ধৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা একচল্লিশের মত।.........

২রা মে তারিখেই রাত্রে অরবিন্দের গৃহ পুলিশ ঘিরে রাখে, এবং ভোর পাঁচটায় অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে। ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবী নেতা, ভাবীকালের পৃথিবীখ্যাত 'সুপারম্যান' শ্রীঅরবিন্দকে পুলিশ সুপার ক্রেগান হাতে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে বন্দী করে ফেললেন। সেই দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রইল স্বদেশী একটি হিন্দুস্থানী কনেস্টবল। তারপর শৃঙ্খলিত বন্দীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সরকারের প্রয়োজন মত দূরত্বে।.........

অরবিন্দের মামলা এবং মুক্তিলাভ পৃথিবীর বিচার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে দু'টি কারণে। প্রথমত, এর প্রধান আসামী ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী নেতা এবং ভাবীকালের পৃথিবীর সর্ববরেণ্য 'সুপারম্যান' শ্রীঅরবিন্দ। দ্বিতীয়ত, বিনা অর্থে অথচ প্রভূত ধৈর্য অধ্যবসায় পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য আগামী দিনের মহামানব এই তরুণ আসামীটির পক্ষ সমর্থন করেছিলেন তৎকালের তরুণ ব্যারিস্টার মিঃ সি আর দাশ যিনি ভাবীকালের সর্বোত্তম আইনজীবীদের অন্যতম ও ভারতীয় জন-নেতাদের অগ্রগণ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

'আলিপুর মামলা' ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংগ্রামী ইতিহাসের একখানি নিগূঢ় সংকেত। এখানে অফুরন্ত 'দেশপ্রেম' নবীন কৌঁসুলির রূপ ধারণ করে নিগৃহীত 'দেশপ্রেম'কে দম্ভ ও সর্বগ্রাসী পাশবিক শক্তির আক্রমণ থেকে প্রাণ ঢেলে প্রাণদান করেছে। যে মহান বিপ্লবী কারাকক্ষে 'বাসুদেব-দর্শন' লাভ করে এবং পণ্ডিচারিতে ঋষি ও ভগবৎদ্রষ্টার গৌরবে বিশ্ববাসীকে আলোকদান করে বারে বারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'নমস্কার' পেয়েছিলেন—তাঁরই বিরাট স্বরূপ চিত্তরঞ্জন তাঁর বিপুল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি আলিপুর মামলাটি একখানি অনন্য তপস্যার গৌরবে গ্রহণ করে জয়মাল্য লাভ করতে পেরেছিলেন। এই মালাকে ঘিরে যে স্বদেশ-

প্রেম ও কর্মসাধনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তার দৃশ্য ও অদৃশ্য তরঙ্গদোলা দোল দিতে থাকল ভারতবর্ষের সংগ্রামী মনকে ভাবীকাল পর্যন্ত।

আলিপুর মামলা চলাকালে পুলিশের তৎপরতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। কারণ একঝাঁক নামী বিপ্লবী ও তাঁদের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেও এই সময়ই আলিপুর জেলে নিহত হল অ্যাপ্রুভার নরেন গোঁসাই, আলিপুর দায়রা কোর্টের সম্মুখে নিহত হলেন পাবলিক প্রসিকিউটার আশু বিশ্বাস, এবং হাইকোর্টে নিহত হলেন পুলিশের ডেপুটি সুপার সামসুল আলম। এঁরা সবাই:আলিপুর মামলা অথবা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে নানা মামলার রসদ জোগাচ্ছিলেন সরকারের পক্ষ হয়ে, তাই এঁদের মস্তক লক্ষ্য করে নেমে এল বিপ্লবীর উদ্যত খড়্গ নির্মম সৌন্দর্যে।.........

(বিপ্লবের কিছু কাহিনী : ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়)

বেআইনি ঘোষিত হল অনুশীলন সমিতি। বিপ্লবীদের জীবন চলে সম্পূর্ণ অন্ধকারের পথে। বড় নেতারা বেশির ভাগ জেলে তাই গুপ্ত ভাবে কাজের দায়িত্ব নিতে হয় হেমন্তকুমার বসুকে। সহকর্মী কুন্তল চক্রবর্তী, হরিশ দাশগুপ্ত, ললিত বসাক। যশোর থেকে এসে শ্রীভূপেন দত্ত মিশেছেন এই দলে। বিপ্লবীরা গুপ্তহত্যার পথ নিয়েছে, ডাকাতির পথ নিয়েছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবী অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে।

১৯০৮ সালের ২১শে অক্টোবর হাইকোর্টের রায় বেরুলো। কানাই দত্ত, সত্যেন বসুর ফাঁসির হুকুম বহাল। "কানাইকে সাতদিন সময় দেওয়া হল আপিলের জন্য। 'There shall be no appeal' অর্থাৎ আপিল হবে না।"...... ডাঃ যাদুগোপাল লিখেছেন যে তাঁর

বন্ধু আশুদাস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেছিলেন : "কানাই শিখিয়ে গেল হে !···shall আর will-এর ব্যবহার করতে কেউ আর ভুলবে না।"······

(বিঃ জীঃ স্মৃঃ—পৃঃ ৩২৯)

সত্যেন বসু ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লোক। কাজেই মৃত্যুর পূর্বে সমাজের আচার্য রূপে শিবনাথ শাস্ত্রীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল জেলে সত্যেনের সঙ্গে দেখা করার। সত্যেন তাঁর আশীর্বাদ লাভের ইচ্ছাই প্রকাশ করলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী সত্যেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এলে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, সত্যেনের মত কানাইকেও তিনি আশীর্বাদ করে এলেন না কেন ?

উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন : "সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ ! বহু যুগ তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে।" (বিঃ জীঃ স্মৃঃ—পৃঃ ৩১৯)

১৯০৮ সাল, ১০ই নভেম্বর। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। তখন ভোর ৭টা। বাংলার কারাগারে বিপ্লবীর এই প্রথম ফাঁসি। ক্ষুদিরাম বসুকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে বিহারের মজঃফরপুর জেলে কিছুকাল পূর্বে।······

কানাইলাল প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যুমঞ্চে আরোহণ করলেন। কণ্ঠে সানন্দে পরলেন মৃত্যুরজ্জু। ভারতবর্ষের তরুণকে শোনালেন মৃত্যুভয়-মুক্তির মোহন বার্তা।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির সময় তাঁহার নির্ভীক প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষ বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলেন। তাঁহার গলায় ফাঁসির দড়ি ঠিকমত দেওয়া হয় নাই। এ জন্য প্রহরীকে ডাকিয়া ঠিক করিয়া দিতে বলিলেন। একজন ইউরোপীয়

প্রহরী চুপিচুপি আসিয়া বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের হাতে এরকম ছেলে আর কতগুলি আছে ?"......যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।" (নিঃ সাঃ কঃ—পৃঃ ৬৪)

তরুণ বাংলা তথা ভারতবর্ষের মাথার মণি শহিদ কানাইয়ের শব জেল গেটের বাইরে তাঁর আত্মীয়দের হেপাজতে দেওয়া হল। কানাই সত্যেনের আত্মীয় তখন সারা বাংলার মানুষ। কানাই সত্যেনকে কি তখন ঘর বা দলের গণ্ডিতে আটক করে রাখা যায়! শত সহস্র লোক এসে শবাধার কাঁধে তুলে নিল। সহস্র সহস্র লোক কালীঘাট শ্মশানে জমা হল। শোকবিহ্বল চিত্তে সবাই চেয়ে দেখল জাতির দুলাল লেলিহান অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন— প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই ! স্তূপীকৃত পুষ্পভারে সজ্জিত ঐ বরতনু, স্তূপীকৃত চন্দনকাঠের সুগন্ধ অগ্নিজ্বালায় ভস্ম হলেও জনমানসে তাঁর বিদ্রোহী আত্মা অক্ষয় সৌন্দর্যে ও অম্লান সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। উপস্থিত নরনারীর সেদিন একটু চিতাভস্ম বা এক টুকরো অস্থি সংগ্রহের জন্য সে কী আকুলতা ! অশ্রুজলে সিক্ত সে আকুলতাই পরবর্তীকালে অগ্নি আখরে লিখিত হয়ে শহিদ তর্পণে বারে বারে পরিস্ফুট হতে দেখা যায়।......

সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি

কানাই আপিল করতে দেন নি। বলেছিলেন—"There shall be no appeal !"......

সত্যেনের আপিল হয়েছিল ছোটলাটের দরবারে। কাজেই তার ফাঁসির তারিখ পিছিয়ে গেল।......

কারাকক্ষে অপেক্ষমান সত্যেন। বন্ধু ও সতীর্থ কানাইলাল 'অগ্রজ' হয়ে গেলেন মৃত্যুর পথে। সত্যেনের মহাযাত্রার ক্ষণও সমাগত, পরমের বাণী তিনি শুনেছেন। মৃত্যুহীনের স্পর্শ পেয়ে তিনি আনন্দিত !......

হেমচন্দ্র কানুনগোকে তাঁর এক বন্ধু (শ্রীএস. সি. রায়) লিখেছেন :

"ফাঁসির দিন অতি প্রত্যূষে আমরা আলিপুর জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম।...ফাঁসি দেওয়া সমাপ্ত হইলে একজন চর্মবর্ম পরিহিত শ্বেত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমার সমীপবর্তী হইয়া বলিলেন—"You can go now', the thing is over. Satyendra died bravely !" তদ্দণ্ডেই একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট বলিতে লাগিলেন—'When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake, when I said, be ready, he answered : Well, I am quite ready, and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it cheerfully. A brave lad !"

(শ্রীঃ বা. স্বঃ—পৃঃ ৭৪৮)

সত্যেন বসুরও ফাঁসি হয়ে গেল। তারিখ—২১শে নভেম্বর, ১৯০৮ সন।

সেদিন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। সেই ফাঁসিমঞ্চ। বাইরে অজস্র জনতা জেল গেটে উপস্থিত। শহিদের শবাধার মাথায় তুলে নেবার আগ্রহে তারা অধীর। কিন্তু তা হলো না। ইতিমধ্যে সরকার নিয়ম জারি করে ফেলেছেন যে—কোন ক্রিমিন্যাল-এর মৃত-দেহই আর তার আত্মীয়-স্বজনদের হাতে জেলের বাইরে দেওয়া হবে না, কারণ তাতে অনর্থক হৈ-হুল্লোড় ও জনতার ভিড় হয়।...

তাই সত্যেনের শব জেল গেটে এল না। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে

যেতে হল অপেক্ষিত নরনারীকে। সত্যেনের মরদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল জেলের চিতায়, অলক্ষে উচ্চারিত হল: "whatever goes up must come down!"...ব্রিটিশের অভ্রংলিহ অহংকারের সৌধকেও একদিন মাটির ধুলায় টেনে নামাবে ঐ সত্যেন-কানাই-ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকির অনুগামী তরুণ ভারত!...আবার বলতে হয়—"No more water the fire next time!..."

নির্দেশ এল—সরকারের উকিল আশু বিশ্বাসকে সরিয়ে দাও।... কে এই কর্মের অধিকারী? কে এর ভার নেবেন?...এগিয়ে এলেন সুস্থ সবলদেহী তরুণদের ঠেলেঠুলে একটি পঙ্গু, ক্ষীণদেহী, বেঁটে অথচ প্রাণরসে প্রোজ্জ্বল কিশোর। নাম তাঁর চারুচন্দ্র বসু।

চারু বসুর ডান হাতখানা অশক্ত, হাতের পাতা ও আঙুলগুলো জন্মাবধি নেই।...তাঁর স্বরূপ কেউ জানে না। সবাই তাঁকে মনে করে, অতি সাধারণ একটি ছেলে সে! তারা জানে না যে—অন্তরে আছে তাঁর আগুনছোঁয়া তপস্যা। প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তাঁকে নাকি যতীন মুখার্জী স্বয়ং।...তৎকালে চারু বসু থাকতেন রসা রোডের হিতৈষী প্রেসে।

১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী, চারু বসু বেরিয়েছিলেন তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করার ব্রত নিয়ে। পঙ্গু ডান হাতে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছেন একটি রিভলভার, বাঁ হাত দিয়ে টানবেন ট্রিগার শত্রু নিধনকালে।...

একটি ব্যস্ত উকিল সাহেব এ-কোর্টে ও-কোর্টে দৌড়ঝাঁপ করে আলিপুরের সুবার্বন পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এসেছেন এক মামলায়। অপরাহ্ণ ৪টা ২০ মিনিটে তিনি কোর্ট থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই চারু বসুর পঙ্গু হস্তের রিভলভার বিপুল বিক্রমে গর্জে উঠল। আহত আশু বিশ্বাস আর্তনাদ করে ছুটতে লাগলেন। সিংহের মত লম্ফ দিয়ে নিকটে এসে চারু বসু আর

একটি বুলেটের আঘাতে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। আশুবাবু টলতে টলতে আরো কিছুটা দূরে কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টারের কামরার কাছে এসে লুটিয়ে পড়লেন। মৃত্যু তাঁকে তাঁর সুখের সংসার ও ইংরাজ প্রভুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল।···

চারু বসু অবশ্য পার্শ্ববর্তী পুলিশদের হাতে ইতিমধ্যে বন্দী হয়েছেন। তৎপরের ইতিহাস একই। অকথ্য অত্যাচার, মারপিট, কিন্তু চারু বসু অনড়, অটল। তাঁর মুখে একটি কথা: "এটা ভবিতব্য। ভগবান পূর্বাহ্ণেই স্থির করে রেখেছেন যে, আমি আশুবাবুকে নিধন করব, এবং নিধন করার জন্য ফাঁসি যাব।"

দায়রা জজের কাছে চারু বসুকে সোপর্দ করা হল। অতি সহজ সুরে বালকবীর সেখানেও বললেন:

"No sessions, trial, but hang me tomorrow. It was all preordained that Ashu Babu shall be shot by me, and I shall be hanged. I killed him as he was an enemy of the country."

যথারীতি বিচার-প্রহসন অন্তে হাইকোর্ট থেকেও প্রাণদণ্ড বহাল হয়ে এল। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও লাটের দরবারে আপিল করতে চারু বসু রাজী হলেন না।······

১৯০৯ সালের ১৯শে মার্চ। মহাদর্পীর গৌরবে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সেদিন ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন চারুচন্দ্র বসু। প্রশান্ত চিত্তে জীবন থেকে জীবনোর্ধ্বে চলে গেলেন তিনি শহিদের অভ্রান্ত বাণী অলক্ষে ছড়িয়ে রেখে।···

বাঙালী করুণ নয়নে তাকিয়ে দেখলো অরুণ রঙে রঞ্জিত সেই মহান 'বিজয়া'।

সামসুল আলম-এর মৃত্যুদণ্ডদাতার নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। বয়স ১৯ পেরোয় নি। বাড়ি ছিল ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায়।

বিপ্লবীদলের কিশোর সভ্য বীরেন্দ্রনাথ। অগ্নিজ্বালা বক্ষে ধারণ করে তাঁর পথযাত্রা শুরু হয়েছে। শোনা যায় যতীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য হয়েই তিনি সামস্থুল হত্যায় অগ্রণী হয়েছিলেন।

পরম সাহসে হত্যা করলেন তিনি সামস্থুলকে। তারপর বেরিয়ে এলেন জনাকীর্ণ রাস্তায়। দিন দুপুরে দুঃসাহসিক এই কর্মে যত নৈপুণ্যই প্রদর্শিত হোক অত ভীড়ের মধ্যে দুঃসাহসিক কর্মীকেও ধরা পড়তে হয় অধিক ক্ষেত্রে। ধরা পড়াটাই স্বাভাবিক, না পড়াটাই ব্যতিক্রম।

বীরেন দত্তগুপ্তও ধরা পড়লেন। তারপর বিচার, নির্যাতন, ফাঁসির হুকুম—যথারীতি সবই হল।

বীরেন কোন উকীল ব্যারিস্টারের সাহায্য নেন নি। বলেছিলেন: "আমি ওকে হত্যা করেছি। ব্যস্, আর কিছু বলার নেই।"…

১৯০৭ সাল। হেমন্তকুমার বসু বাস করেন ১।১ শ্যামপুকুর স্ট্রীটে। বয়স ১২ বৎসর। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক খুবই কম। বয়স ১২ বৎসর হলে কি হবে রাজ্যের বড় বড় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে গেছেন হেমন্তকুমার। তাদের অনেক গোপন নির্দেশ কার্যকরী হয় হেমন্ত-কুমারের মাধ্যমে। গোপন অস্ত্র গোপন দলিল জমা হয় হেমন্তকুমারের কাছে। শান্তশিষ্ট চেহারা, সচরাচর কারোর নজরে পড়ে না, তদুপরি ১২ বছরের একটি বালকের প্রতি সহজে সন্দেহও জাগে না। হেমন্তকুমার এই সুযোগটাই নেন পুরোপুরি। এমনি সময় একদিন বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন মা গুরুতর অসুস্থ। সকালে উঠেই দেখতে পান মার সারা দেহ বসন্তে ঢেকে গেছে। মাত্র দশদিন ভুগেই মা মারা গেলেন।

১২ বছরের কিশোরের মাতৃবিয়োগ, কিন্তু শোকে দিশাহারা হলেন না তিনি। অশৌচান্তে আবার একই পথ। আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন হেমন্তকুমার। কোথায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, সুরেন ব্যানার্জী, রাসবিহারী বসু, চারু রায়—সকলের সাথে একই রকম হৃদ্যতা, একই রকম পরিচয়। হুগলী থেকে যতীশ ঘোষ এসেছেন, কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের অনুশীলনীতে পরিচয়। ক্রমে বন্ধুত্ব।

পরিচয় হয়েছে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বাঘা যতীন—খালি হাতে বাঘ মেরে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন। যাতায়াত করছেন শ্রমজীবী সমবায়ে। শ্রমজীবী সমবায়—যে সমবায়ের টাকায় মানিকতলায় বোমা তৈরীর খরচ যোগানো হত, যেখানকার টাকায় ক্ষুদিরামকে, প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুর পাঠানোর খরচ দেওয়া হয়েছিল।

বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রমজীবী সমবায় সম্পর্কে লিখছেন—"১৯০৭ সালের শেষাশেষি আমি মানিকতলার সঙ্গে যুক্ত হই। ১৯০৮ সালের শেষের দিকে শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেড হয় বহুবাজারে। Madan-এর বাড়িতে ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী আর আমি দু'জনে করি—অবশ্য শিল্প সমিতির ১২০০০ হাজার টাকার মাল নিয়ে। এটা তখন স্বদেশী দোকানমাত্র। তারপর ঘোষ লেনে বাস করত—সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, ধনীর পুত্র—ক্ষীরোদের আলাপী। আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় তাকে জুটিয়ে Bengal United Stores কেনা হল Y. M C. A-র তলায়। (এইটিই পরে বিখ্যাত 'শ্রমজীবী সমবায়' হয়ে যায় যায়।) ক্ষীরোদ আর আমি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম যেমন উপেন, হৃষীকেশ ছিল। তখন 'যুগান্তর' গোপনে ছাপতাম আমরা অন্নদা কবিরাজের সঙ্গে মিলে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীও ছিলেন। (১) তখন অরবিন্দের সঙ্গে ও যতীনের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা। 'শ্রমজীবী' ক্রমশ ব্যবসার টাকা খরচ করতে লাগল বিপ্লবের জন্য—

এবং ক্রমশ রামচন্দ্র, যতীন, মতিলাল, শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতি এলে ওটাকে একেবারে বিপ্লবের কেন্দ্র করে ফেললাম। আলিপুরের মোকদ্দমার সময়—'শ্রমজীবী' পুরোমাত্রায় বিপ্লবের কেন্দ্র—মতিলাল রায়ের চন্দননগরের কেন্দ্রের সঙ্গে, রাজাবাজারের শশাঙ্কর বোমা তৈরী কেন্দ্রের সঙ্গে, (২) সুরেশের বোমা তৈরী আড্ডার সঙ্গে সংযুক্ত, (৩) **arms smuggle** করত রামচন্দ্র।

মানিকতলায় বোমার **experiment** করতে যাবার খরচ আমি দিই তোমার বৌদির গয়না বিক্রি করে উপেনের হাতে; ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুর পাঠাবার খরচ দিই মিশরীবাবুর কাছ থেকে···কলকাতার প্রধান বিপ্লবী কেন্দ্রগুলি যতীনের সঙ্গে যুক্ত হয় 'শ্রমজীবী সমবায়ে।' অবশ্য এর সঙ্গে 'আত্মোন্নতি'র সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ ছিল সতীশ সেনগুপ্তের মাধ্যমে। এই 'শ্রমজীবী'তেই মন্মথ, বসন্ত বিশ্বাস এসে জোটে—পোড়াগাছা স্কুল থেকে। ক্ষীরোদ ছিল হেডমাস্টার—তাদের নিয়ে 'শ্রমজীবী' মানুষ করে······পরে রাসবিহারী এসে জুটল। যতীন, রাসবিহারী আর আমি রাসমণির বাগানে পঞ্চবটীর তলায় বসে সিপাহী বিপ্লবের পরিকল্পনা করি। তারপর যতীন কাশী যায়। বসন্ত তার আগে রাসবিহারীর সঙ্গে লাহোরে চলে গেছে। 'শ্রমজীবী'র শেষ অঙ্ক হল যতীনকে বিদায় দেওয়া—নরেন ভট্টাচার্যকে বিদায় দেওয়া—" (বিঃ জীঃ স্মৃঃ—যাদুগোপল মুখোপাধ্যায়)

মাতৃবিয়োগের পর সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকটা শিথিল হয়ে যায় হেমন্তর। প্রলয়ঙ্কর বন্যা বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সেই সংবাদ শুনে বিপ্লবীদলের সহযোদ্ধা বন্ধুদের নিয়ে চলে গেলেন ত্রাণকার্যে। দেখতে দেখতে এসে গেল ১৯১২ সাল। ভর্তি হয়েছেন রিপন কলেজে। ইতিমধ্যে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন, অত্যধিক ভাল ফল হয়েছে পরীক্ষায়। বাবা পুর্ণচন্দ্র বসু, দাদা হরিদাস বসু হেমন্তকুমারের এই বিপ্লবী জীবনের চলার পথে বাধা হননি। রাত্রে

বাড়ি ফেরার ঠিক নেই কিন্তু তার মধ্যে পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় বাড়ির লোক সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এই সময়ে বেলুড় মঠে যাতায়াত শুরু হয়। স্বামী প্রেমানন্দ খুব ভালবাসেন হেমন্তকুমারকে। মাঝে মাঝে দু'একজন স্বামীজি বাড়িতেও আসেন।

এসে গেল ১৯১২ সাল। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল। ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার, সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে ভারতীয় প্রজাগণের প্রতিনিধি ও দেশীয় রাজন্যবর্গ নিয়ে প্রভুর প্রতীক বড়লাটের দরবার। বড়লাট তাই রাজকীয় সমারোহে নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করেছেন। বিপুল সমারোহ, অপূর্ব জাঁকজমক ও আলোড়ন। মধ্যযুগীয় স্বর্ণ-ঝলমল রাজারাজড়ার পোশাক পরিহিত দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ও মিলিটারী পুরুষদের বীরদর্পে চলাফেরা। পথঘাট লোকে লোকারণ্য, দরবার-গৃহ দৃপ্ত, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের উপকরণে দর্শনীয়। দেশী-বিদেশী নর-নারী, করদ রাজ্যগুলোর রাজন্যবর্গ ও রাজপুরুষদের সমাবেশে সে গৃহ গম্‌গম্‌ করছে।......

দিল্লীর সেন্ট্রাল স্টেশনে বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন এসে থেমেছে। বিপুল দণ্ডী এক রাজহস্তীর পৃষ্ঠে বিরাট এক রৌপ্যনির্মিত হাওদায় আসীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও তাঁর পত্নী। বড়লাট-দম্পতির মাথার উপরে বিচিত্র ছত্র ধরে আছেন জমাদার মহাবীর সিং—কোন করদ-রাজ্য থেকে আগত এক জঙ্গী জোয়ান।......

জনাকীর্ণ পথ পেরিয়ে ভাইসরয়ের শোভাযাত্রা গৌরবে ও স্পর্ধায় এগিয়ে চলেছে। বড়লাটের হস্তী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর সুমুখে আসতেই বজ্র নির্ঘোষে ফেটে গেল একটি বোমা! বোমাটি লাটসাহেবকে লক্ষ্য করেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কর্ণ বধির করা এই বিস্ফোরণে সর্বজন বিহ্বল। বড়লাটের হাওদার পশ্চাৎভাগ চুরমার হয়ে গেছে। বোমার একটা টুকরো (splinter) লাটসাহেবের

পিঠের মাংস ছিঁড়ে কাঁধের উপরে উঠে এসে একটি ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করেছে। সেই ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণের বিরাম নেই। ঘাড়ে ও দেহের নানা স্থানে তাঁর প্রচুর আঘাত। সবগুলো মারাত্মক নয়।··· ক্রমে তাঁর সম্বিৎ লুপ্ত হয়ে আসে।

এতবড় একটা অ্যাকশন্—সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জীবনে যা অভূতপূর্ব—যার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী, তার পশ্চাতের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পুলিশ কোন হদিসই পেল না!···আই-বি কর্তাদের মাথা হেঁট হয়ে রইল!···

(বিপ্লবের কিছু কাহিনী—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়)

ইতিমধ্যে আরো ঘটনা ঘটে গেল। ফেরারী হয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ, চারু রায়, ভূপেন দত্ত। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে···কোথায় এই বিপ্লবী নায়কগণ। ভগিনী নিবেদিতার সহায়তায় শ্রীঅরবিন্দ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। ভূপেন দত্ত, চারু রায়েরও কোন সন্ধান নেই। কোথায় তাঁরা? হেমন্তকুমার অতি নিপুণভাবে একের পর এক এই তিন বিপ্লবীকে গোপন আস্তানায় পৌঁছে দিয়েছেন। নিজের বাড়িতে এনে তুলেছেন। বাড়ির লোকেরা অনেকদিন আগে থাকতেই কাকে নিয়ে এল কার জন্যে খাবারের হুকুম করল সেসব প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছিল। তাই সেদিন যাঁরা অরবিন্দ, ভূপেন দত্ত, চারু রায়ের জন্য খাবার তৈরী করেছিলেন তাঁরাও জানতে পারেননি এঁরা কারা। এখান থেকেই অরবিন্দ চলে যান চন্দননগরে মোতিলাল রায়ের আশ্রয়ে। সেখান থেকে পণ্ডিচেরী, ১৯১৩ সালে।

কলকাতার মীর্জাপুর স্ট্রীটে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের একটি হোস্টেল। সেখানে থাকেন ডাক্তারী পড়ার ছাত্র সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষচন্দ্র তখন কটক থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছেন। অদ্ভুত যোগাযোগ,

মেডিকেল কলেজের ছাত্র সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সুভাষচন্দ্রের। সেখানে আবার যুক্ত হল রিপন কলেজের ছাত্র হেমন্তকুমার। আবার আসেন নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, জ্যোতিষ ঘোষ। এসে গেল ১৯১৪ সাল। সামরিক শক্তি চাই। সামরিক শিক্ষা চাই। সামরিক শক্তিতেই ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়াতে হবে। তাই একদিকে সকলের মাথায় ঢুকলো অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। বিপিন পাল বললেন, শুধু অস্ত্রে হবে না, চাই সামরিক শিক্ষা। সৈন্যবাহিনীতে ঢুকতে হবে অনেককে। সুযোগ এসে গেল, কিন্তু সে কথা একটু পরে বলছি। যুদ্ধে সৈনিক হয়ে যাওয়ার পথটা শেষ পর্যন্ত বেছে নিতে হয়েছিল বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে চাষখণ্ডের যুদ্ধের পর। যতীন মুখার্জী, রাসবিহারী বসু, অমলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সিপাহী বিপ্লবের পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন বালেশ্বরে। বালেশ্বর যুদ্ধের কাহিনী কোনদিন ভুলবে না ভারতবর্ষের মানুষ। সেই কাহিনী বলছি।

১৯১৪ সালেই পুলিশ খবর পায় হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের ওয়াই এম সি এ'র বাড়ীতে শ্রমজীবী সমবায় পক্ষের দোকানের মালিক অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রাম মজুমদার প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য যতীন মুখার্জী, অতুল ঘোষ ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের (এম. এন. রায়) সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে।

বিপ্লবীরা শ্যাম ও অন্যান্য স্থানের ভারতীয় বিপ্লবীদের এবং জার্মানদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে বিপ্লব অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় এবং ডাকাতির সাহায্যেই অর্থ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত স্থির করেন।

তদনুসারে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটায় ডাকাতি করে ৪০ হাজার টাকা সংগৃহীত হল। ভোলানাথ চ্যাটার্জীকে ইতিপূর্বেই ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছিল যোগাযোগের জন্যে। মার্চ মাসে

জিতেন লাহিড়ী (শ্রীরামপুরের) ইউরোপ থেকে ভারতে এলে জার্মানির মহাযুদ্ধের প্রস্তাবের সংবাদ দিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের একজন প্রতিনিধিকে বাটাভিয়ায় পাঠানো হয় জার্মানীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে। তিনি সি মার্টিন নাম নিয়ে ছদ্মবেশে বাটাভিয়ায় যান এপ্রিল মাসে।

তারপরই শ্রীমুখার্জীকে পাঠানো হয় জাপানে। গার্ডেনরীচ ডাকাতির পর পুলিশ পিছনে লাগায় ষড়যন্ত্রের নেতা যতীন মুখার্জী ফেরার হয়ে বালেশ্বরে গিয়ে থাকেন। ওদিকে জার্মান জাহাজ ম্যাভরিক ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতের দিকে যাত্রা শুরু করে।

বাটাভিয়ায় 'মার্টিন'কে বলা হয়, ৩০ হাজার রাইফেল ও প্রত্যেক রাইফেলের জন্য ৪০০ করে বুলেট, এবং দু লাখ টাকা নিয়ে ম্যাভরিক ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য করাচীতে যাচ্ছে। মার্টিনের অনুরোধে সাংহাইয়ের জার্মান কনসালের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হয়, জাহাজখানাকে করাচীর বদলে বাংলায় পাঠানো হবে।

তারপর মার্টিন ফিরে এসে সুন্দরবনে রায়মঙ্গলে অস্ত্রশস্ত্র নামাবার বন্দোবস্ত করেন।

ইতিমধ্যে তিনি কলকাতার হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের অফিসে তার করে জানান, ব্যবসার অবস্থা ভাল। হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স হরিকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক পরিচালিত ভুয়ো ফার্ম—ষড়যন্ত্রের অন্যতম ঘাঁটি। মার্টিনের বন্দোবস্তে বাটাভিয়ায় জার্মান ব্যবসায়ীরূপে হেলফারিখের কাছ থেকে হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের অফিসে কয়েক দফায় ৪৩ হাজার টাকা পাঠানো হয় কিন্তু ৩৩ হাজার টাকা পৌঁছনোর পর পুলিশ ব্যাপারটা জানতে পারে।

তারপর যতীন মুখার্জী, যাদুগোপাল মুখার্জী, নরেন ভট্টাচার্য, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অতুল ঘোষ মিলে বন্দোবস্ত করেন

জার্মান অস্ত্রশস্ত্র তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ বরিশাল পার্টির হাতে পূর্ববঙ্গে অভ্যুত্থানের হাতিয়ার রূপে নামানো হবে, এক ভাগ যাবে বালেশ্বরে—শৈলেশ্বর বসু পরিচালিত ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামক ভুয়ো ফার্ম ষড়যন্ত্রের অন্যতম ঘাঁটিতে—আর এক ভাগ কলকাতায়।

বাংলায় যে সৈন্য ছিল, তার পক্ষে বিপ্লবীদের লোকবল ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বাংলার বাইরে থেকে সৈন্য এলে সেইটে হবে ভয়ের কারণ। কাজেই সেটা বন্ধ করার প্রয়োজনে তিনটে প্রধান রেলপথের পুলগুলো উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য ঠিক হল, যতীন মুখার্জী বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেল লাইনটিকে ভেঙ্গে দেবেন ; বেঙ্গল নাগপুর রেল সামাল দিতে ভোলানাথ চ্যাটার্জীকে পাঠানো হবে চক্রধরপুরে এবং ই আই রেল লাইনের অজয় পুল উড়িয়ে দিতে সতীশ চক্রবর্তী যাবেন।

নরেন ঘোষচৌধুরী এবং ফণী চক্রবর্তী হাতিয়ায় গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এক সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ববঙ্গ দখল করবেন। তারপর কলকাতার দিকে অভিযান চালাবেন। আর কলকাতা থেকে নরেন ভট্টাচার্য এবং বিপিন গাঙ্গুলীর দল প্রথমে কলকাতার আশেপাশের অস্ত্রাগার লুঠ করবেন। তারপর ফোর্ট উইলিয়াম দখল করবেন। ম্যাভরিকের জার্মান অফিসাররা পূর্ববঙ্গে সংগৃহীত বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য পূর্ববঙ্গেই থেকে যাবেন।

ইতিমধ্যে যাদুগোপাল মুখার্জী রায়মঙ্গলের কাছে এক জমিদারের সঙ্গে জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। জাহাজ যেখানে ভিড়বে, সেখানকার নিশানা হিসাবে এক সারি আলো ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। ১লা জুলাই অস্ত্রশস্ত্র বণ্টন করা হবে।

অতুল ঘোষের নেতৃত্বে একদল লোক নৌকাযোগে রায়মঙ্গলের কাছে গিয়ে দশদিন অপেক্ষা করছিল। কিন্তু জুনের শেষে নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে জাহাজও পৌঁছল না এবং বাটাভিয়া থেকে দেরীর কারণ সম্বন্ধে কোন খবরও এল না।

৩রা জুলাই ব্যাঙ্কক থেকে পাঞ্জাবী বিপ্লবী আত্মারামের এক চিঠি নিয়ে এক বাঙালী বিপ্লবী এসে খবর দিলেন শ্যামের জাহাজ কনসাল ৫ হাজার রাইফেল, কার্টিজ এবং এক লাখ টাকা এক বোটে করে রায়মঙ্গলে পাঠাচ্ছে।

আগের প্ল্যান পরিবর্তন করা হয়েছে। বাংলার বিপ্লবী বাঙালী দূতকে ব্যাঙ্ককে ফেরত পাঠালেন। তিনি বাটাভিয়া হয়ে হেলফারিখকে বলে যাবেন—আগের প্ল্যান যেন বদল করা না হয় এবং অস্ত্রশস্ত্রের অন্য চালান যেন হাতিয়ায় ও বালেশ্বরে পাঠান হয় বা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কারোয়ারের দক্ষিণে গোকর্নীতে পাঠান হয়।

এদিকে জুলাই মাসেই পুলিশ রায়মঙ্গলের খবর পেয়ে গেল এবং তৈরী হল। ৭ই আগস্ট হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের অফিস খানাতল্লাসী হল এবং কয়েকজন গ্রেপ্তার হল।

১৩ই আগস্ট বোম্বে থেকে হেলফারিখকে সতর্ক করে এক তার পাঠান হল। ১৫ই নরেন ভট্টাচার্য (মার্টিন) ও আর একজন হেলফারিখের সঙ্গে আলোচনার জন্য বাটাভিয়ায় রওনা হলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বালেশ্বর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম খানাতল্লাসী হল। তারপর ২০ মাইল দূরে কাপতিপদায় যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে প্রথম বাঙালী বিপ্লবীদের ট্রেঞ্চ যুদ্ধ—যে কাহিনী বাংলাদেশে আজ সর্বজনবিদিত।

সেই যুদ্ধের বীরবাহিনী মাত্র ৫ জনের ক্ষুদ্র দল। সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যের প্রকাণ্ড দলের বিরুদ্ধে বহুক্ষণ যুঝে শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় হল। যতীন মুখার্জী গুলীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বন্দী হয়ে হাসপাতালে মারা গেলেন। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী (যিনি

হেদোর মোড়ে গোয়েন্দা অফিসার সুরেশ মুখার্জীকে হত্যা করে-ছিলেন) আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন। আর মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ বন্দী হলেন। পরে মনোরঞ্জন ও নীরেনের ফাঁসী হয় এবং জ্যোতিষ পাগল হয়ে যান! ফাঁসীর আগের দিন মনোরঞ্জন বাড়ীতে চিঠি লিখেছিলেন—কাল আমাদের বিজয়া।

(বিপ্লবের সন্ধানে ; পৃঃ ৩১-৩২)

বাঘা যতীনের মৃত্যু, বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ, এসবের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের একটি অধ্যায় শেষ হল। হেমন্তকুমার গ্রেপ্তার হলেন কলকাতায়। মুক্তি পেলেন কিছুদিন পর। কিন্তু সময় নেই। বিপ্লবীরা ছত্রখান হয়ে গেছে। বিপ্লবী আন্দোলনও আর সুসংবদ্ধ নেই। যুদ্ধ লেগেছে ইউরোপ মহাখণ্ডে। রিক্রুট চলছে বাঙালী যুবকদের 'বেঙ্গল রেজিমেণ্টে'। বিপিন পাল আগেই বলেছিলেন সামরিক শিক্ষা নিতে হবে। এবার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বললেন বাঙালী ছেলেদের যুদ্ধে যেতে হবে। এমনি এক দিনে নিরুদ্দেশ হলেন হেমন্তকুমার বসু। সেইদিন রাত্রে ছোটভাই বলাইচাঁদ বসু সন্ধ্যা থেকে সকলের সামনে যাচ্ছে আর বলছে আজ রাত্রে একটা 'বায়স্কোপ' হবে। কিন্তু কি বায়স্কোপ হবে সেটা কাউকে খুলে বলছে না। আজ হেমন্তকুমারের ইণ্টার-মিডিয়টের ফল বেরুবে। খাওয়াদাওয়া করে সে কলেজে চলে গেছে। বাড়ি ফিরবার সময় এখনও হয়নি। কিন্তু ছোটভাই খেতে বসে বাবাকে বলল, 'বাবা, আজ রাত্রে একটা বায়স্কোপ হবে!'

রাত্রে বলাইচাঁদ পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে সকলকে দেখালো, দেখিয়ে বললো, এই হলো বায়স্কোপ। কিন্তু সেটা কি তা কাউকে দেখালো না, সোজা বাবার কাছে গেল, দিল বাবার হাতে। বাবা পূর্ণচন্দ্র বসু চিঠিখানা খুললেন, পড়লেন এবং সেইভাবে ধরে বসে রইলেন চুপচাপ। চোখ দিয়ে নেমে এল জলের ধারা।

হেমন্তকুমার চলে গেছেন সৈন্যবাহিনীতে, চলে গেছেন ভারতবর্ষের বাইরে। সারা বাড়িতে মুহূর্তে শোকের ছায়া নেমে এল, সকলেই বুঝল এই পরিকল্পনা অনেক দিন আগের—আজ শুধু যাবার সময় বাবাকে জানিয়ে গেছে।

যুদ্ধে গেলেন হেমন্তকুমার। সেই যুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে আরো বেশ কয়েকজন বাঙালী যুবক গিয়েছিলেন সুদূর মেসোপটেমিয়া ও বসরায়। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম, তিনি সেদিন ছিলেন হেমন্তকুমারের সৈনিক জীবনের বন্ধু। যেমন-রাজ-নৈতিক ও বিপ্লবী জীবনে নিষ্ঠা, তেমনি একই নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন রণক্ষেত্রে। হেমন্তকুমার সৈনিক। আজীবন সৈনিকের মত কঠোর শৃঙ্খলায় নিজের জীবনকে প্রবাহিত করেছেন। পুরস্কারও পেলেন সৈনিকজীবনে। শৃঙ্খলাবোধ ও শৌর্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'জঙ্গী ইনাম' সনদ পদক দেওয়া হয়। শুধু সনদ দেওয়া নয় সেই সঙ্গে দেওয়া হয় এমন একটি পারিবারিক ভাতা, যে ভাতা শুধু তিনিই আজীবন পাবেন না, তাঁর পরবর্তী তিনপুরুষও সেই ভাতা পাবেন।

এসে গেল অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার। বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে নূতন জোয়ার এসেছে। খিলাফৎ কমিটির আন্দোলন—যেখান থেকে উঠেছে অসহযোগের প্রস্তাব। গান্ধীজি বলেছেন, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে। চরকার আন্দোলন শুরু হয়েছে ঘরে ঘরে। আনন্দবাজার আর সার্ভেন্ট পত্রিকা দেশে নূতন জোয়ার এনেছে। স্বরাজ ও স্বাধীনতা কথা দুটি পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সমস্ত ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করেছে। কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়ে গেল। লালা লাজপত রায় সভাপতিত্ব করলেন। এখন গৃহীত হল কাউন্সিল বর্জন করবার প্রস্তাব। কলকাতা কংগ্রেসেই প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয়, যতদিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হয়

ততদিন ভারতবাসীদের পক্ষে ক্রমবর্ধমান অহিংস অসহযোগ নীতি পালন করা ছাড়া কোন উপায় নেই। সেইদিন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি নির্দেশ করা হয়েছিল—নির্দেশগুলো ছিল এই—

(ক) উপাধি বর্জন, অবৈতনিক পদ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির মনোনীত সদস্যগণের সদস্যপদ ত্যাগ।

(খ) গভর্নমেণ্ট দরবার, লেভী এবং সরকারী বা আধা-সরকারী সর্ববিধ অনুষ্ঠান বর্জন।

(গ) সরকারী বা সরকার অনুমোদিত স্কুল-কলেজ ক্রমিক বর্জন ও বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) উকিল ও মক্কেলগণ কর্তৃক সরকারী আদালত বর্জন ও পক্ষ প্রতিপক্ষের মধ্যে মামলা মেটাবার জন্য সালিশী আদালত গঠন।

(ঙ) সৈন্য, কেরানী, জনমজুরদের মেসোপটেমিয়ায় কর্ম গ্রহণ করার অস্বীকৃতি।

(চ) ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য পদ প্রার্থীদের নির্বাচন পত্র প্রত্যাহার এবং যাঁরা এই নির্দেশ অমান্য করে প্রার্থী হবেন এমন সব প্রার্থীকে ভোটদাতাদের ভোট না দেওয়া।

(ছ) বিদেশী দ্রব্য বয়কট।

(মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগচি)

"১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে গভর্নমেণ্ট সভা বন্ধ করার জন্যে ১৪৪ ধারা জারি করতে শুরু করল। সে বাধা গ্রাহ্য না করে লোকে গ্রেপ্তার বরণ শুরু করল।

খদ্দর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী বস্ত্র বয়কটের জন্য পিকেটিং-এর ধরপাকড়ও শুরু হয়েছিল। দেশী মিলওয়ালারা চাঁদাও দিচ্ছিল। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দেশী মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা মিলনও লোকচক্ষুর অগোচরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী

যুগে যেটার পরিণতি হয়েছিল দেশী ধনিকদের স্বার্থের সঙ্গে কংগ্রেসের স্বার্থের পরিপূর্ণ মিলন।

পুলিশ পিকেটারদের মারতে শুরু করলে সি. আর. দাশ নিজের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন, স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী উর্মিলা দেবীকে পিকেটিং-এ পাঠালেন। পরের ছেলেদের বিপদের মুখে পাঠাবার আগে আপনার প্রিয়জনদের পাঠালেন। তাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। আন্দোলন আরো জোর হল।

তখন সরকার ১৪৪ ধারা অমান্য করে সভা করার জবাব দিতে শুরু করল লাঠি চার্জ করে সভা ভেঙ্গে দিয়ে। ফল হল না, মেয়েরা সে সব সভায় বক্তৃতা শুরু করলেন।

প্রথমে মেয়ে বক্তা বেশী ছিল না। বৃদ্ধা মহিলা কংগ্রেস নেত্রী মোহিনী দেবী গোড়া থেকেই ছিলেন, আর ছিলেন বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি। ক্রমশ নতুন নতুন মেয়ে-বক্তা তৈরী হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত বোধ হয় '২১ সালের নভেম্বরে গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার দলকে বে-আইনী ঘোষণা করল, এবং ভলাণ্টিয়ারদের লীডাররূপে কংগ্রেস নেতাদেরও গ্রেপ্তার শুরু করল। সি. আর. দাশ গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর স্থলে একে একে অনেক নেতা আসেন আর গ্রেপ্তার হন, শেষ পর্যন্ত সুভাষবাবুও গ্রেপ্তার হন।"

(বিপ্লবের সন্ধানে : নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

হেমন্তকুমার ফিরে এসেছেন। ফেলে দিয়েছেন তিনি সৈনিকের পোশাক। বাড়ি এসে দেখেন ছোট দুই ভাই কৃষ্ণচন্দ্র বসু ও বলাই চন্দ্র বসু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন—আইন অমান্য করে জেলে গেছেন। খিদিরপুরে আইন অমান্যকারীদের জন্য একটা নূতন জেল তৈরী হয়েছে। সেখানে তাদের রাখা হয়েছে। হেমন্তকুমার প্রথমেই ভারত সরকারকে চিঠি লিখে ফেরৎ দিলেন

খেতাব। তারপর আর একখানা চিঠি লিখে প্রত্যাখ্যান করলেন তাঁর ও তাঁর পরবর্তী তিন পুরুষের ভাতা। জেলে দুই ভাইকে চিঠি লিখলেন—সাবাস্, তোমরা জেলে গেছ, আমিও যাচ্ছি। নেমে পড়লেন আবার রাজ্য রাজনীতিতে, তারপর প্রতিষ্ঠিত হল আবার সেই পুরনো সংযোগ। আবার দেশবন্ধু, আবার সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র ১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দেশবন্ধুর কাছে লিখছেন—"আপনি আমাকে গ্রহণ করুন, আমায় দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবার পথে সহযোগিতা করুন।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত পত্রে সুভাষচন্দ্র বললেন—

"আমাকে আপনি বোধহয় চিনেন না— কিন্তু আমার পরিচয় দিলে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন। আপনাকে আমি খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে এই পত্র লিখিতেছি—কিন্তু কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে আমাকে নিজের **sincerity** আগে প্রমাণ করিতে হইবে। সেই জন্য প্রথমে নিজের পরিচয় দিতেছি।

আমার পিতা শ্রীজানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানকার গভর্নমেণ্ট প্লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। আপনি আমার পিতাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন এবং আমার দাদাকে নিশ্চয়ই চেনেন।

পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **expelled** হই। দুই বৎসর নষ্ট হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাশ করি এবং **Honours** প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে আমি **civil service** পরীক্ষা পাশ করি এবং

চতুর্থ স্থান অধিকার করি। এই বৎসর জুন মাসে আমি **Moral Science Tripos** পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার **B. A. Degree** পাইব।

এখন কাজের কথা বলি। সরকারী চাকুরী করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। আমি বাড়ীতে বাবাকে এবং দাদাকে লিখিয়াছি যে, আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিতে চাই। আমি এখনও উত্তর পাই নাই। তাঁদের অনুমতি পাইতে হইলে আমাকে দেখাইতে হইবে আমি চাকুরী ছাড়িবার পর কি **tangible** কাজ করিতে চাই। আমি অবশ্য জানি যে, চাকুরী ছাড়িয়া আমি যদি কোমর বাঁধিয়া দেশের কাজে অবতীর্ণ হই তাহা হইলে করিবার আমার অনেক কিছু আছে—যথা, জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও খবর কাগজ প্রণয়ন ও প্রকাশ, গ্রাম্য সমিতি স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি এখন বাড়ীতে দেখাইতে পারি আমি কি **tangible** কাজ করিতে ইচ্ছা করি—তাহা হইলে বোধ হয় চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে অনুমতি সহজে পাইব। আমি যদি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া চাকুরী ছাড়িতে পারি তাহা হইলে বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই।

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সবচেয়ে ভাল জানেন। শুনিলাম আপনারা কলিকাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলায় "স্বরাজ" পত্রিকা বাহির করিতে চান। আমি আরও শুনিলাম বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে গ্রাম্য সমিতি প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়াছে।

আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে আপনারা আমাকে এই স্বদেশ সেবার যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যৌবনোচিত উৎসাহ আমার আছে। আমি অবিবাহিত। লেখাপড়ার মধ্যে আমি **Philosophy**টা একটু

পড়েছি কারণ কলিকাতায় আমার ঐ বিষয়ে Honours ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tripos পড়িতেছি। Civil service পরীক্ষার কৃপায় সর্বাঙ্গীন শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে—যেমন Economics, Political Science, English and European History, English law, Sanskrit, Geography ইত্যাদি।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যদি নিজে এই কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমি এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকে এই কাজে টানিতে পারিব! কিন্তু আমি নিজে যতক্ষণ এই কাজে না নামিতেছি ততক্ষণ কাহাকেও টানিতে পারিতেছি না।

এখন আমাদের দেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা আছে তাহা এখান থেকে বুঝিতে পারিতেছি না, তবে আমার মনে হইতেছে যে, দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা—এই দুই কাজে হাত দিতে পারিব। আমার ইচ্ছা—clear-cut plans লইয়া চাকুরী ছাড়িতে। তাহা হইলে চাকুরী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারিব।

আপনি আজ বাঙ্গলা দেশে স্বদেশ সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তার তরঙ্গ চিঠি ও খবর কাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শুনা গিয়াছে। Oxford থেকে একজন মাদ্রাজী ছাত্র তাঁর লেখাপড়া আপাতত স্থগিত রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে—সেখানে গিয়া কাজ আরম্ভ করিবার জন্য। Cambridge-এ এ পর্যন্ত কিছু হয় নাই যদিও 'অসহযোগিতা' সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী চলিতেছে। আমার বিশ্বাস, যদি কেহ পথ দেখাইতে পারে তা হইলে সেই পথ অনুসরণ করিবার লোক এখানে আছে।

আপনি বাঙ্গলাদেশে আমাদের সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—

তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনি আমাকে এই বিপুল সেবাযজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমি তাহা জানিতে পারিলে বাড়ীতে বাবাকে এবং দাদাকে এইরূপ লিখিতে পারিব এবং নিজের মনকেও সেইভাবে প্রস্তুত করিতে পারিব।"

বাংলাদেশে এক আশ্চর্য শুভলগ্নে একজন নেতা আর একজন কর্মী রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। নেতা সুভাষচন্দ্র, কর্মী হেমন্তকুমার। সুভাষচন্দ্র সেই ১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন সাহেবকে চপেটাঘাত করার পর থেকেই নেতা। সেদিন ছিলেন ইংরেজ তথা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছাত্র সমাজের মুখপত্র তথা নেতা। পরবর্তীকালে ১৯২১ সালে বিলেত থেকে 'সিভিল সারভিস্'-এ ইস্তফা দিয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন। ১৬ই জুলাই জাহাজ থেকে বোম্বে অবতরণ করেই সোজা চলে গেলেন মহাত্মা গান্ধীর কছে, বললেন—কাজ চাই। কাজ করতে চাই। গান্ধী বললেন, বাংলাদেশে ফিরে যাও, দেখা করো চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে। চিত্তরঞ্জনই তোমাকে যোগ্য কাজ দেবে।

সিভিল সারভিসে ইস্তফা দিয়ে ফিরে এসেছেন সুভাষচন্দ্র কলকাতায় আর সামরিক বাহিনী থেকে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় কাজে নেমেছেন হেমন্তকুমার বসু। হেমন্তকুমার বসু চিরকালই কর্মী। এমন কর্মী—যে কর্মীর নাম সহজে কেউ শুনতে পায় না। খবরের কাগজে বিবৃতি দিতে তিনি পটু নন। সভা-সমিতিতেও বক্তৃতা

দেন কম। তাই দেখা যায় ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস নিয়ে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে হেমন্তকুমার বসুর উল্লেখ কোথাও নেই। অথচ ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত হেমন্তকুমার বসু যুক্ত ছিলেন না এমন কোন লড়াই, আন্দোলন, সংগ্রাম হয়নি বললেই চলে। সে লড়াই, আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবেরই হোক আর শান্তিপূর্ণ গান্ধীবাদী পথেই হোক। প্রতিটি সশস্ত্র বিপ্লবেই সেই বিপ্লবের হোতারা কোন না কোন ভাবে হেমন্তকুমার বসুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আবার যখন চরকার যুগ এসেছে, আইন অমান্য আন্দোলনের যুগ এসেছে, সেখানেও হেমন্তকুমার অগ্রগামী বাহিনীর পুরোভাগে। বাংলাদেশে গান্ধীবাদী হিসাবে শ্রীসতীশ দাশগুপ্তের নাম সর্বাগ্রে করা যায়। গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যে কয়জন বাংলাদেশের মানুষ এসেছেন শ্রীদাশগুপ্ত তার প্রথম সারির প্রথম। কিন্তু এই শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত চরকাকাটা শিখেছিলেন শ্রীহেমন্ত-কুমার বসুর কাছ থেকে। শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, বেঙ্গল কেমিক্যালে বসে হেমন্তকুমারই শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে চরকা কাটা শিখিয়েছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, বোমা পিস্তলের প্রতিও কোন অশ্রদ্ধা নেই, আবার চরকা কাটতেও সিদ্ধহস্ত। আজীবন খদ্দর পরেছেন, সময় সুযোগ মতো নিজ হাতে চরকা কেটে সুতো কেটে নিজের জামাকাপড় তৈরী করেছেন। কলকাতায় খাদিমণ্ডল প্রতিষ্ঠা ও খাদির প্রচারেও অবদান অনেকের চেয়ে যাঁর বেশী সেই মানুষ হলেন হেমন্তকুমার বসু। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা হেমন্তকুমার আর সিভিল সারভিস ছেড়ে আসা সুভাষচন্দ্র দুজনেই বসলেন দেশবন্ধুর পদতলে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হল।

এই কালের কথা বলতে গিয়ে প্রবীণ বিপ্লবী জননেতা হেমন্তকুমার

বসুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীঅমর বসু অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করে বললেন—"১৯১৯ সালে লাজপত-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পর আমরা দু'জন একসঙ্গে কংগ্রেসে যোগদান করলাম। শ্রীসুরেশ-চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আমাদের এই সময় থেকে পরিচয়। বনমালী সরকার স্ট্রীটে আমাদের অফিস ছিল। সেখানেই আমরা দিন ও রাত্রির বেশীর ভাগ সময় থাকতাম। কালী সিংহের বাড়িতে, যেখানে বসে মহাভারত রচনা করা হয়েছিল, সেই ঘরে আমরা প্রথম সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাই। এ সময় আমাদের কংগ্রেসের কাজ, সেই সঙ্গে চলত সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে লাঠি খেলা, ছোঁরাখেলা শেখার কাজ।"

এই সময়কার স্মৃতিচারণ করে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ বললেন—"তখন উত্তর কলকাতায় জেলা কংগ্রেস কমিটির অফিস লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী লেনে। বিচারপতি অনুকুল মুখার্জীর বাড়ীতে আমার সঙ্গে হেমন্তদার প্রথম পরিচয়। আমাদের বাড়ীর ঠিক সামনে কংগ্রেসের অফিস। কংগ্রেস অফিসে অনেক বইপত্র ছিল। সেগুলো পড়বার জন্যই যেতাম। ধীরে ধীরে হেমন্তদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। তখন ২১ বৎসর বয়স হয়নি তাই কংগ্রেসের সদস্য করা হল না আমাকে। ১৯২৫ সালে ২১ বৎসর বয়স হলে হেমন্তদাই প্রথম আমাকে সদস্য করেন। উত্তর কলকাতা জেলা-কংগ্রেসের সঙ্গে হুগলী জেলা-কংগ্রেসের বরাবরই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হুগলী জেলার অনেক কর্মী তাঁদের রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করেছেন উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস থেকে। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয় প্রকৃতপক্ষে হেমন্তদারই মাধ্যমে। ১৯২১ সালে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন হুগলীতে আসেন। প্রখ্যাত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের শ্যালক শ্রীরবি পালিত হুগলী জেলা কংগ্রেসের প্রথম সম্পাদক হন। তাঁরই বন্ধু হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্র সেন হুগলীতে আসেন। ১৯২৩ সালে দ্বারকেশ্বর

বন্যায় আরামবাগ মহকুমা ডুবে যায়, চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন হেমন্তদা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে আরামবাগে থেকে বন্যাত্রাণের কাজ করেন। আরামবাগ থেকে ফিরে এসে হেমন্তদা আমাকে বলেন, ডাঃ আশু দাস চান তুমি গিয়ে হুগলী জেলায় কাজ কর। তুমি হুগলী জেলার ছেলে। ওখানে গিয়ে কাজ করাই তোমার ভাল। ডাঃ আশু দাস ছিলেন তখনকার রাজনীতিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। হেমন্তদা আমাকে বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে বললেন। হেমন্তকুমার বসুরই প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে শ্রীরামপুরে কংগ্রেসের কাজ শুরু হয়। হেমন্তদা 'ম্যাজিক লণ্ঠন' নিয়ে হুগলীর গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। বহু সময় আমি সঙ্গে থাকতাম। হেমন্তদার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতেই হুগলী জেলার কর্মীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে স্থাপিত খাদিমণ্ডলটি প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস তথা হেমন্তদারই নেতৃত্বে। প্রথম যখন খাদিমণ্ডল বিডন স্কোয়ারের কাছে একটা ঘরে স্থাপিত হল তখন তার সাইনবোর্ডে লেখা থাকত—উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস পরিচালিত। এইভাবে শ্রীহেমন্তকুমার বসু আমাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং হুগলী জেলার কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন।"

১৯২১ সালের ও তৎপরবর্তী কালের স্মৃতিচারণ করছিলেন শ্রীহেমন্তকুমার বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিদাস বসু এবং হেমন্তদার মাতৃসমা বৌদি। বড় বৌদি যিনি মাত্র ১২ বৎসর বয়সে এই বাড়ীতে আসেন ১৯১৩ সালে, তিনি শুধু দেখতেন একটি অদ্ভুত আচরণ ও চরিত্রের মানুষকে। যাকে কখনও ক্ষুধার কথা মনে করিয়ে না দিলে নিজে থেকে মনে করে খেতে চাইত না। "বাড়ীতে খদ্দর পরত, নিজের কাপড় নিজে কাচত, শত চেষ্টা করেও ওঁর জামাকাপড় কেচে দেওয়া যেত না। মাঝ রাত্রে পুলিশ এসে অহোরাত্র বাড়ি সার্চ করত। বাড়ি না থাকলে পুলিশ এসে খোঁজ করত কোথায় গেছে, কোথায় আছে।

রাস্তা থেকে পুলিশ কতদিন ধরে নিয়ে গেছে। কতদিন ঘরে ঢাকা থাকা খাবার পচে গেছে, সকালবেলা ফেলে দিতে হয়েছে খাবার। বঙ্কিম মুখার্জী ছিল ঠাকুরপোর ভয়ানক বন্ধু। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বঙ্কিমবাবু ঠাকুরপোর কাছে এসে থাকতেন। কোন কোন দিন রাত্রে এসে বলতেন, আমি খাব না, আমার খাবারটা ওকে দিয়ে দাও। কখনও কখনও দু'চারজনও এসে থাকত। পুলিশ এসে হয়ত ঠাকুরপোকে ধরে নিয়ে গেল, অন্যেরা থেকে গেল আমাদেরই বাড়িতে। কেন আছে কতদিন থাকবে একথা জিজ্ঞাসার কোন অবকাশই ছিল না। সুধাংশু বলে একটি ছেলে ঠাকুরপোর সঙ্গে থাকত। কোথা থেকে এসেছিল কি পরিচয় জানতাম না। একদিন ঠাকুরপোকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, সকালবেলা দেখা গেল পথের ধারে পড়ে রয়েছে সুধাংশুর মৃতদেহ। জেল থেকে মাঝে মাঝে শুধু একটিমাত্র খবরই চাহিদা হিসাবে আসত। বৌদিকে একবার পাঠিয়ে দিও। আমি জেলে দেখা করতে যেতাম। কিন্তু কথা বলা বড় একটা হত না। লোহার গরাদের ওপাশে দাঁড়ানো একমুখ দাড়িসুদ্ধ ঠাকুরপোকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়তাম, না শোনা হত তাঁর কথা, না বলা হত নিজের কথা। কলকাতায় ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। কেউ ঘর থেকে বেরুতে সাহস করে না। কিন্তু ও ঠিক বেরিয়ে যাবেই। কখনও কখনও প্রচণ্ড আপত্তি করতাম। কিন্তু কে শোনে আপত্তির কথা। বাড়ি ফিরে এসে গায়ের চাদরটা ঝেড়ে বলত, দেখুন, আমার কিছু হয় নি।"

১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হলেন দেশবন্ধু, মৌলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র এবং বীরেন্দ্র শাসমল। সরকার কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন। কলকাতার

রাস্তায় খদ্দর ফেরী করবার চেষ্টাকে কঠোর হস্তে দমনে সচেষ্ট হল পুলিশ। কিন্তু সরকারী দমননীতিকে পরাস্ত করবার জন্যে এদিকেও পড়ে গেল সাজো সাজো রব। দেশবন্ধুর বাসভবনে শুরু হল সলাপরামর্শ। আইন অমান্য হবে। দেশব্যাপী আইন অমান্য। বীরেন্দ্র শাসমল কাঁথিতে। প্রফুল্লচন্দ্র সেন আরামবাগে। এমনি করে রাজ্যের চারিদিকে এই প্রথম বিদ্রোহের এক বহ্নিশিখা জ্বলে উঠলো— 'মানবো না সরকারী বাধা নিষেধ, মানবো না সরকারী নিষেধাজ্ঞা।' পরামর্শ চলে সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধুর মধ্যে। পরামর্শ চলে সুভাষচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, অমর বসুর মধ্যে। কলকাতার রাস্তায় খদ্দর ফেরী করতে বেরুলেন দেশবন্ধুর সহধর্মিনী বাসন্তী দেবী, ভগিনী উর্মিলা দেবী ও শ্রীমতী সুনীতি দেবী। সেদিন ৭ই ডিসেম্বর।—এরপর শুরু হল আরো ব্যাপক ধরপাকড়। গ্রেপ্তার হলেন চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, হেমন্তকুমার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার সহ প্রায় ষোল হাজার স্বেচ্ছাসেবক। হেমন্তকুমার বসুর উপর ভার ছিল সেদিন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠনের। প্রদেশ-কংগ্রেস সম্পাদক সত্যেন্দ্র মিত্র মিলিটারী ফেরৎ হেমন্তবাবুর হাতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন।

১৯২২ সাল। উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস ও বাগবাজার-দর্জিপাড়া কংগ্রেসের সম্পাদক হলেন হেমন্তকুমার বসু। সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে এই সময় থেকেই হেমন্তকুমার বসুর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

এই ঘনিষ্ঠতা যতদিন সুরেশচন্দ্র মজুমদার জীবিত ছিলেন ততদিন অটুট ছিল। হেমন্তকুমারের সহযোগী ছিলেন অমর বসু, হরিদাস ঘোষ, সুধীর ঘোষ প্রমুখ। রাজ্য রাজনীতিতে কত উত্থান হয়েছে কত পতন হয়েছে—কত ভাঙা-গড়া হয়েছে, দল ছাড়াছাড়ি হয়েছে অনেকবার—বিভিন্ন শিবিরে ভাগ হয়েছেনও নানা সময়ে। কিন্তু

সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে হেমন্তকুমার বসু প্রমুখের স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধার সম্পর্ক কারো জীবিত কালে ক্ষুণ্ণ হয়নি।

উত্তরবঙ্গে প্রলয়ঙ্করী বন্যা হল। বন্যাত্রাণের জন্য সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ত্রাণকমিটি গঠিত হল। ত্রাণকমিটির কাজে হেমন্তকুমার সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত। ১৯২২ সালে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হল। দেশবন্ধু সভাপতি। সুভাষচন্দ্র গয়া-কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সঙ্গে সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমন্ত বসু। গয়া কংগ্রেসেই দেশবন্ধু কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবের প্রধান সমর্থক সুভাষচন্দ্র। সংখ্যাধিক্যের জোরে চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল। সৃষ্টি হল প্রো-চেঞ্জার আর নো-চেঞ্জার দলের। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই দেশবন্ধু গঠন করলেন স্বরাজ্য দল। নিয়মমাফিক দেশবন্ধু রাজ্য-কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করলেন। এই সময়ে বাংলাদেশে দুটো কংগ্রেস কমিটি হল। একটির সভাপতি আক্রাম খাঁ, সম্পাদক ভূপতি মজুমদার। অপরটির সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সম্পাদক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

স্বরাজ্য দল বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে নির্বাচন যুদ্ধ পরিচালনা করলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র তখন বাংলাদেশের দুই উদীয়মান তারকা আর উভয়ের কাছে সমান নির্ভরশীল ও বিশ্বাসভাজন হলেন হেমন্তকুমার বসু। ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন শেষ হল। স্বরাজ্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। এই নির্বাচনেই তরুণ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পরাজয় ঘটে।

১৯২৪ সাল—কর্পোরেশনের নির্বাচন। এই নির্বাচনযুদ্ধ পরিচালনা করলেন দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্র। কর্পোরেশনের নির্বাচনেও স্বরাজ্য দলের জয়-জয়কার হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

কর্পোরেশনের মেয়র হলেন। সুভাষচন্দ্র হলেন চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। বেতন মাসে তিন হাজার টাকা। কিন্তু তিনি সেই বেতন স্বেচ্ছায় অর্ধেক ত্যাগ করেন। এই সময় শাঁখারীটোলা পোস্টমাস্টার হত্যা মামলায় অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। গোপীনাথ সাহা কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে আর্নেটিং ডে নামে একজন ইউরোপীয়কে হত্যা করে। গোপীনাথ সাহা হুগলীর অধ্যাপক যতীশ ঘোষের প্রিয় শিষ্য ছিলেন, বন্ধু ছিলেন হেমন্তকুমার বসুর। গোপীনাথ সাহার কাজ নিয়ে আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হল। গান্ধীজির ইচ্ছায় কংগ্রেসের প্রস্তাবে গোপীনাথের দেশপ্রেমের কথা স্বীকার করেও এই কাজের তীব্র নিন্দা করা হয়। দেশবন্ধু সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন, "এই সব কাজের মূলেও গভীর দেশপ্রেম আছে। সেকথা মনে রাখতে হবে।" অক্টোবর মাসে এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সরকার হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকা সন্দেহে সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অনিলবরণ রায়কে গ্রেপ্তার করল। সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হল সুদূর মান্দালয় জেলে ২৫শে অক্টোবর ১৯২৪ সালে। হেমন্তকুমার বসু সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পর দেশবন্ধুর নির্দেশে রাজ্যব্যাপী প্রচার অভিযানে নামলেন। বিডন স্কোয়ারে পথসভা করবার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে হেমন্তকুমার বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ অর্থাৎ বড়বৌদি বললেন, "এই সময় একটা চেষ্টা হয়েছিল ঠাকুরপোর বিয়ে দেওয়ার। তার আগেই শৈলেন্দ্রনাথ সরকার ঠাকুরপোকে একটা মাস্টারী দিয়েছিল। একমাস কি দুমাস সে মাস্টারী করেছিল। উত্তরপাড়া থেকে এক ভদ্রলোক এসে শ্বশুরমশায়কে ধরলেন 'ছেলের বিয়ে দিন।' শ্বশুরমশায়ের অমত ছিল না। তবে তিনি বললেন 'হেমন্ত চাকরী-বাকরী কিছু করে না।' পাত্রীপক্ষের অভিভাবক

বলল 'ও নিয়ে ভাবনার কিছু নেই, জামাই-মেয়ের ভরণ-পোষণের ভার আমরাই বহন করব।' শ্বশুরমশায় বললেন 'বেশ, ছেলের মত নিই।' ছেলের মত নেবেন কী—ছেলের সঙ্গে তাঁর দেখাই বা হয় কখন! তবু অনেক চেষ্টা করে একদিন ধরলেন। অনেক কথা বলে বললেন 'আমি মেয়ে ঠিক করেছি, তোকে বিয়ে করতে হবে।' ঠাকুরপোর এক কথা 'ওসব কথা আলোচনাতেও দরকার নেই।' বাপ আর ছেলেতে লাগলো তর্ক। বাপ বলেন 'তোকে বিয়ে করতে হবে।' ছেলে বলেন 'আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' (শ্বশুরমশায় শেষকালে যখন খুব জিদ ধরলেন তখন ঠাকুরপো বলল, 'বিয়ে দিলে সেই মহিলাকে আমি মা বলে ডাকব। একথা শোনার পর যদি বিয়ে দিতে চাও ভেবে দেখ।') শ্বশুরমশায় চুপ করে গেলেন। এর কয়েক বৎসর পরে শ্বশুরমশায় মারা যান—জীবিতকালে তিনি আর কোনদিনও ঠাকুরপোর বিয়ের কথা বলেন নি।"

হেমন্তকুমার এত কাজের মধ্যেও এই সময়ে বেলুড় মঠে নিয়মিত যাতায়াত করেন আর প্রায়ই বেলুড় মঠ থেকে স্বামী প্রেমানন্দের খবর আসে হেমন্তকুমারের কাছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রায়ই আসেন হেমন্তকুমারের বাড়িতে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এলেই ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় দু'জনের নিভৃত আলাপন হয়। হেমন্তকুমার সুভাষচন্দ্রের মত গুরুর সন্ধানে ছাত্র বয়সে গৃহত্যাগ করেন নি বটে, কিন্তু সাধু-মহাপুরুষদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন ঘরে বসে এবং বেলুড় মঠে যাতায়াত করে।

১৯২৪ সালের ১৬ই জুন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিং শৈলাবাসে পরলোক গমন করলেন। সুভাষচন্দ্র জেলে। মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় উপস্থিত থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে দেশবন্ধুর মরদেহ গ্রহণ করলেন। তারপর সেই ঐতিহাসিক শোকযাত্রা। এই সময় মহাত্মা গান্ধী তিন মাস কাল বাংলায় থেকে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষার্থে দশ লক্ষ

টাকা তুললেন। মহাত্মা গান্ধীর এই কাজের প্রধান সহযোগী হয়েছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আর যতীন্দ্রমোহনের প্রধান সহকারী ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমন্তকুমার বসু প্রমুখ। এই সময় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কর্পোরেশনের মেয়র, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও কাউন্সিলের নেতা নির্বাচিত হন। হেমন্তকুমার এই সময় থেকে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের প্রধান সহকারী রূপে কাজ করতে থাকেন। এই সময়ে রাজ্যব্যাপী পাটকল ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রধান নেতা ছিলেন হেমন্তকুমার।

১৯২৭ সালের ১৬ই মে সুভাষচন্দ্র দীর্ঘ দিন কারাবাস থেকে মুক্ত হলেন। মাদ্রাজে বসল কংগ্রেসের অধিবেশন। সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, হেমন্তকুমার, সুরেশচন্দ্র সকলেই মাদ্রাজ কংগ্রেসে উপস্থিত। সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলাল মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করলেন কিন্তু প্রবীণেরা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দাবীতে অটল থাকায় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হল না। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ১৯২৮ সালেও কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত হল না। গৃহীত হল ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে।

১৯২৮ সাল, কলকাতা কংগ্রেস। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মূল সভাপতি মতিলাল নেহরু। কলকাতা কংগ্রেসের ইতিহাস সুভাষচন্দ্র ও হেমন্তকুমারের সংগঠন শক্তির মহা মিলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে সেই দিনই ভাবীকালের আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের বীজ বপন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের এই কাজে প্রধান সহযোগী হয়েছিলেন হেমন্তকুমার। বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে যে সামরিক কায়দায় তালিম দেওয়া হয়েছিল সেটা সম্ভব হয়েছিল সামরিক বাহিনী ফেরতা হেমন্তকুমারের অবদানে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন জি. ও. সি. আর হেমন্তকুমার ছিলেন

'অ্যাডজুটাণ্ট'। সেইদিন সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিল কলকাতা কংগ্রেস। প্রস্তুতি থেকে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের খবরে সংবাদপত্র থাকতো ঠাসা। সেইদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সংবাদের নমুনা দেওয়া হল।

"কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্য যাঁহারা অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, ১৪ই তারিখের পরে আর কাহাকেও স্বেচ্ছাসেবক দলে ভর্তি করা হইবে না। বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক অশ্বারোহী দলে ভর্তি হইয়াছেন এবং অশ্বারোহণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদের অনেকেরই অশ্ব নাই। যাঁহাদের অশ্ব আছে, তাঁহাদিগকে আমাদের অশ্বারোহী দলের জন্য ৫০টি অশ্ব ধার দিতে আমি নিবেদন জানাইতেছি। ১১ই তারিখ হইতে অশ্বারোহীদলের রীতিমত শিক্ষাদান চলিতে থাকিবে। প্রেসিডেন্টের পৌঁছিবার দিবস যে শোভাযাত্রা বাহির হইবে তাঁহারা সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করিবেন। ইহা ছাড়া ২০শে তারিখ হইতে পাহারা এবং যানবাহন, লোকজনের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করিবার কার্যেও তাঁহারা নিযুক্ত থাকিবেন।

অশ্বগুলি প্রত্যহ পার্কসার্কাসে প্রেরিত হইতে পারে। দৈনন্দিন কার্যের পর সেগুলি আস্তাবলে পাঠান যাইতে পারে, অথবা তিন সপ্তাহের জন্য কংগ্রেস ময়দানস্থ আস্তাবলে সেগুলি রক্ষিত হইতে পারে। অশ্বগুলির বিশেষ যত্ন লওয়া হইবে। আমি আশা করি, যাঁহাদের অশ্ব আছে, তাঁহারা আমাদের এই কার্যে সাহায্য করিবেন।"

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং
(আনন্দবাজার, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৮)

"সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এ বৎসরের কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির একটি প্রধান কৃতিত্বের বিষয় হইবে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে প্রায় দুই হাজার যুবক এ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইয়াছে। সেনাবিভাগের ভূতপূর্ব সেনানীদের অধীনে বিভিন্ন পার্কে সকালে এবং বিকালে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। গতকাল বুধবার অপরাহ্নকালে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দুই দল, একদল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হইতে এবং অপরটি হাজরা পার্ক হইতে বাহির হইয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে শহরের রাজপথ দিয়া কুচকাওয়াজ করে। উভয় দল কলেজ স্কোয়ারে মিলিত হইয়া মার্চ করিতে করিতে বিডন স্কোয়ারে গমন করে। বিডন স্কোয়ার ঘুরিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রত্যাবর্তন করে। রাজপথ সমূহের উভয় পার্শ্বে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করে।" (আনন্দবাজার, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৮)

"আলাদীনের ঐন্দ্রজালিক প্রদীপের শক্তিতেই যেন চক্ষের নিমেষের মধ্যে দেশবন্ধু নগরের মত একটি সুন্দর স্থান অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছে। বাস্তবিকই দেশবন্ধু নগরের বিরাট ও মনোমুগ্ধকর ব্যবস্থা দেখিয়া এই কথাই মনে হয় যে, নগর পরিকল্পনাকারিগণ এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ একটি সুন্দর স্থানের সৃষ্টি কি প্রকারে সম্ভব করিয়াছেন? নগরের নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং প্রত্যেক ঘণ্টায়ই দৃশ্যের পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। কংগ্রেসমণ্ডপ নির্মাণ প্রায় সম্পুর্ণ হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির চার হাজার সদস্য ও বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দের জন্য বিরাট মঞ্চ নির্মাণ শেষ হইয়াছে এবং এক্ষণে খদ্দর দিয়া আচ্ছাদনের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পকলা অনুসারে নগরসজ্জার কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

নগরীটি এক্ষণে সামরিক শিবিরের আকার ধারণ করিয়াছে এবং উহার প্রতি প্রবেশদ্বারে স্বেচ্ছাসেবকগণ রীতিমত কড়া

সামরিক কায়দায় পাহারা দিতেছে। প্রত্যেক আগন্তুক, তিনি যতই খ্যাতনামা হউন না কেন, প্রবেশ দ্বারে পরিচয়-পত্র না দিয়া এবং অনুমতি না লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন না। এমন কি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ জে এম সেনগুপ্ত এবং জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ বি সি রায়কে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছিল এবং প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

স্বেচ্ছাসেবকদিগের নিয়মানুবর্তিতা প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে জাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। এইজন্য শ্রীযুক্ত বসু ধন্যবাদার্হ। সায়াহ্নের সঙ্গে সঙ্গে কুচকাওয়াজের মাঠে ঢাক এবং বিউগল বাজিয়া ওঠে, উহাতে আসন্ন যুদ্ধের একটা উৎসাহজনক ভাব লোকের মনে জাগিয়া ওঠে।" (আনন্দবাজার, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২৮)

পরের দিনের বিবরণ এই রকম :—

"প্রত্যহ হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক মার্চ করিতেছে এবং অশ্বারোহীদলকে শিক্ষিত করা হইতেছে। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাগণ জয়ঢাক ও বিউগল বাজাইয়া প্যারেড করিতেছে। দেশবন্ধু নগরের দিকে অবিরাম জনস্রোত বহিতেছে। সেখানে রীতিমত উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

গতকল্য কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল এবং মফঃস্বল হইতে প্রায় পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক তাহাদের পোশাক এবং কাপড়চোপড় সহ দেশবন্ধু নগরে পৌঁছে। তাহাদের সামরিক কেতায় চলাফেরা এবং নিয়মানুবর্তিতা হইতেই পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাহারা সুন্দররূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

"গতকল্য সন্ধ্যাবেলা প্রায় একশত বালিকা কংগ্রেস ময়দানে ড্রিল করে। এই বালিকারা যখন তাহাদের নেত্রীর অধীনে মার্চ করিতেছিল, তখন তাহাদিগকে দেখিয়া বৈদিক যুগের শক্তিকাদের

কথাই স্মৃতিতে উদয় হইতেছিল। ভারতের পুত্রগণই শুধু নহে, কন্যাগণও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিবেন—সেদিন অধিক দূরে নহে।" (আনন্দবাজার, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৮)

দেশবন্ধুনগরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ভাষণের উত্তরে সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ভাষণ :—

"অদ্যকার যে অপূর্ব শোভাযাত্রার কথা আপনারা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের মুখে শ্রবণ করিলেন, তাহাতে বঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিশেষত্ব এবং বঙ্গের নরনারীর দেশপ্রেম অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের পরলোকগত নেতা দেশবন্ধু দাশের এই সহরে বাসভূমি ছিল। হাওড়ার সেতু হইতে এই চন্দ্রাতপ পর্যন্ত আমি সর্বত্র তাঁহার প্রগাঢ় সেই স্বদেশপ্রেমেরই পরিচয় অদ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বেচ্ছাসেবকদলের অপূর্ব বিধিব্যবস্থা, অশ্বারোহী ও পদাতিকদলের শৃঙ্খলা ও গঠনের নৈপুণ্য, সর্বোপরি সর্বত্র অধিবাসীদের স্বদেশপ্রেমের যে উদ্বেল লহরীনর্তন লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে স্বরাজের স্বপ্নই আমার মনে উদিত হইয়াছে।

আমি দেখিলাম, এখানকার প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানটি সফল করিবার জন্য সাহায্য করিতেছেন। আজ মনে হইতেছে আমরা কতই বুঝি স্বাধীন, ভারতভূমি সত্যই বুঝি সুখ ও সম্পদশালিনী হইয়াছেন। আপনারা আজ প্রমাণ করিয়াছেন যে, আপনারা সত্যই দেশবন্ধু দাশের সম্পদের যোগ্য উত্তরাধিকারী—সেই উত্তরাধিকার বলে স্বরাজ নিশ্চয়ই আপনাদের করতলগত হইবে।"

(আনন্দবাজার, ২২শে ডিসেম্বর ১৯২৮)

এই কংগ্রেসের ভিতরের কথা বলতে গিয়ে শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি মতিলাল নেহরু। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন স্বরাজ্য দলের নেতা এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। সুতরাং তিনি হলেন অভ্যর্থনা

সমিতির চেয়ারম্যান। অল ইণ্ডিয়া লীডারদের কাছে বাংলা কংগ্রেসের দলাদলির প্রশ্ন তো ভাল কথা নয়। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ডাঃ বিধান রায়, একজিবিশনের সেক্রেটারী নলিনীরঞ্জন সরকার। ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগঠনের ভার দাদাদের হাতে। কলকাতার ময়দানে ময়দানে মিলিটারী প্যারেড শিক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার ছেলে বিপ্লবীদের রিক্রুটিংয়ের টার্গেট।

···শেষ পর্যন্ত স্বামী যমকে দেওয়া যায় সতীনকে নয়, এই নীতিতে সুভাষচন্দ্র হলেন জি ও সি। পূর্ণ দাস, হরি চক্রবর্তী প্রভৃতি হলেন লেফটেন্যান্ট, রবি সেন হলেন জি ও সি অর্ডারলি অফিসার। বিপিনদার দল কোথাও নেই, তাঁরা ক্ষুব্ধ। অ্যামেলগ্যামেশনের এই অবস্থা আমরাও যেমন লক্ষ্য করছিলুম, সুভাষবাবুও তেমনই লক্ষ্য করছিলেন। তারপর কংগ্রেসের বিভিন্ন বিভাগে কর্মী বণ্টনের ব্যবস্থা। প্রতুল গাঙ্গুলীকে করা হয়েছিল 'হিন্দুস্থানী সেবাদলে' বাংলার বিপ্লবীদের প্রতিনিধি। বিরাট একজিবিশনে সুরেনদার দলবলই কর্মী। কিচেন কমিটিতে সুরেশ দাস এবং টাঙ্গাইলের অমর ঘোষ (মোক্তার)। পার্ক সার্কাস ময়দানের পিছনে "নেস্ট" নামক একটা বাড়ী ছিল—সেখানে হয়েছিল কিচেন স্টোর। সেখানে বসানো হল ময়মনসিংয়ের আনন্দ মজুমদারকে, সুরেনদার লোক। পূর্ণ দাসের দল সেটা জোর করে দখল করতে গিয়েছিল এবং লড়াই থামাবার জন্যে আপোসে তাদেরও সেখানে জায়গা দেওয়া হয়েছিল।

অনুশীলনের নেতারা ক্ষেপে গেল। বটে! এই তোমাদের অ্যামেলগ্যামেশন? যেখানে টু পাইস আছে সেখানেই যুগান্তর, আর যত সব শুকনো আঘাটায় অনুশীলন! অ্যামেলগ্যামেশন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। টু-পাইস ছিল অবশ্যই। এতবড় একটা কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবী কর্মীদল দিনরাত ভূতের মতন খাটবে, আর

পার্টির কিছু অর্থের সংস্থান হবে না, এই বা কেমন কথা! একদিন রাত্রে একজিবিশনের টিকিট বিক্রীর পর হঠাৎ সমস্ত আলো নিভে গেল, বেশ কিছুক্ষণ হুড়োহুড়ির পর আলো জ্বললো এবং দেখা গেল, একটা ক্যাশভর্তি বাক্স উধাও হয়ে গেছে। "নেস্ট" বাড়ীটার পিছনের দরজা দিয়ে মাল বেরিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে এসে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতো, এবং এইভাবে একই মাল দুবার জমা হোত এ গল্পও শুনেছি। শুনেছি অনুশীলনের লোকের কাছে নয়, আমাদেরই পার্টির লোকের কাছে।

ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতারা—শৈলেন রায়, শচীন মিত্র, প্রমোদ ঘোষাল, হাওড়ার কৃষ্ণ চ্যাটার্জী প্রভৃতি গান্ধীবাদী নো-চেঞ্জাররাও ছিলেন সেনগুপ্তের শিবিরে। মোটের ওপর, সে লড়াইয়ে সুভাষবাবুর দিকে বিগ ফাইভের সঙ্গে যুগান্তর দল এবং সেনগুপ্তের দিকে বাকী সব বেখাপ্পা পাঁচমিশেলী দল এবং ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল।

এবার কংগ্রেসের কথায় ফিরে আসা যাক। ভলাণ্টিয়ারদের ক্যাম্প হয়েছিল প্রকাণ্ড। শ্রী সংঘের অন্যতম নেতা সত্য গুপ্ত হয়েছিলেন একজন মেজর। তিনি কঠোর শৃঙ্খলার এবা দিয়ে বাছা বাছা ছেলেদের বিপ্লবের মন্ত্র দিয়ে নিজস্ব এক বিপ্লবীদল খাড়া করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই দলই পরবর্তী কালের বি ভি দল, যারা মেদিনীপুরে পর পর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করেছিল বলে শোনা গিয়েছিল। ভলাণ্টিয়ার ক্যাম্পের মধ্যেই অপর কোন ভলাণ্টিয়ার গ্রুপের সঙ্গে কি এক বিবাদ উপলক্ষে মেজর সত্য গুপ্ত তাঁর বাহিনীকে মিলিটারী কায়দায় পরিচালিত করে ঐ প্রতিপক্ষ ভলাণ্টিয়ার গ্রুপকে মার দিয়ে এসেছিলেন। তার জন্য সুভাষবাবু কোর্ট-মার্শালে বিচার করে তাঁকে একদিনের জন্য কয়েদ করেন। খাঁটি মিলিটারী শো। সুভাষবাবু রীতিমত গম্ভীরভাবে সেনাপতির ভূমিকায় তালিম দিচ্ছিলেন।

…কংগ্রেসের সাবজেক্টস কমিটিতে সুভাষবাবু এক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স প্রস্তাব দাখিল করেছিলেন। মহাত্মা তাঁকে বোঝালেন, তুমি নেহরু-রিপোর্টে সই করে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের দাবীর পক্ষে মত দিয়েছ, এখন বৃটিশ সরকারকে একটু সময় না দিয়েই ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দাবী কি শোভা পায়? অন্ততঃ '২৯ সালটা তাদের বিবেচনার জন্য সময় দাও, তারপর যদি তারা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দিতে রাজী না হয়, তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে মিলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সওয়ালা হয়ে যাব। সুভাষবাবু নিরস্ত হলেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনের সময় হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ি লেগে গেল। হাজার বিশেক (কারো কারো মতে ৫০ হাজার) শ্রমিক মিছিল করে শ্লোগান দিতে দিতে কংগ্রেসে আসছে। কর্তারা G.O.C.-কে নির্দেশ দিলেন, ওদের রুখতে হবে। তিনি ভলাণ্টিয়ার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, শ্রমিকদের রুখতে হবে।

দেখতে দেখতে বন্যার প্রবাহের মত শ্রমিক জনতা কংগ্রেস ক্যাম্প ছাপিয়ে এসে প্যাণ্ডালে ঢুকে পড়লো, তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হল না, বাধা দিতে গেলে দক্ষযজ্ঞ হয়ে যেত। তারা প্যাণ্ডাল দখল করে ছ'ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর কংগ্রেসের কর্তারা তাদের দাবীপত্র গ্রহণ করলেন এবং সেগুলো বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারা জয়ডঙ্কা বাজিয়ে বেরিয়ে গেল।

কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব গান্ধী-মতিলাল রচিত প্রস্তাব হল '২৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যদি বৃটিশ সরকার ভারতকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দেয়, তাহলে আবার অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে এবং আইন অমান্য শুরু করা হবে খাজনা বন্ধ করে। প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।"

সেদিনের কথা বলতে গিয়ে হেমন্তকুমারের তৎকালীন সহকারী শ্রীসুধীর ঘোষ বলেছিলেন—"পার্ক সার্কাসের বিরাট ময়দানে বিরাট

চত্বরে বিরাট বিরাট সব প্যাণ্ডেল। হাজার হাজার মানুষ এসেছেন সারা ভারতবর্ষ থেকে। সব কিছুর দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের। কিন্তু সে দায়িত্ব ও কর্তব্যের রূপকার ছিলেন হেমন্তকুমার। সে সময় দেখেছি পূর্ণ সামরিক কেতায় তালিম দেওয়া স্বেচ্ছাসেবকরা কি অপূর্ব ও নিপুণ ভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে হেমন্তকুমারের নেতৃত্বে। নেতাজীর স্বাধীনতা প্রস্তাব উত্থাপন এবং তার সমর্থন সংগ্রহের পিছনে হেমন্ত কুমার বসু, সুরেশচন্দ্র মজুমদারের তৎপরতা ছিল অপরিমিত। ১৯২৮ সালের কংগ্রেস থেকেই নেতাজী 'ইয়ুথ অ্যাসোশিয়েশন' গড়ে তোলেন। এই যুব সংগঠনের প্রধান নেতা ছিলেন হেমন্তকুমার।"

১৯২৮ সালের কথা বলতে গিয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন—"কংগ্রেস অধিবেশনের গোটা সময়টাই আমরা দু'জন এক ঘরে ছিলাম। আগে থাকতে হেমন্তদাকে ভাল করে চিনতাম কিন্তু এখন সে সম্পর্ক স্নেহময় ও মধুর হয়ে ওঠল। এই সময়ে হেমন্তকুমারের চরিত্রের অনেকগুলি দিক আমার কাছে ফুটে ওঠে। সব কথা প্রকাশ করা যায় না, বিশেষ করে এখন তো মন একান্তই ভারাক্রান্ত। ১৯২৮ সালের সেই দিনটির কথা আজ ৪৩ বৎসর পরেও চোখের উপর ভাসছে। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ধীরেন মুখার্জী, আমি ও হেমন্তদা এক জায়গায় বসে আছি, সুভাষবাবু ও জওহরলাল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনলেন। আমার তিন দাদা—হেমন্তদা, প্রফুল্লদা ও ধীরেনদা—এর মধ্যে দুই দাদা চলে গেলেন (ধীরেনদা ও প্রফুল্লদা)। আমি ও হেমন্তদা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ভোট দিলাম। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় গান্ধীজির পক্ষে চলে গেলেন। মাস্টারমশাই জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিনদা, অমর চট্টোপাধ্যায় নিরপেক্ষ থাকলেন। হেমন্তদার যুক্তি ছিল অকাট্য। আমাকে ও প্রফুল্লদাকে হেমন্তদা বার বার বললেন, "স্বাধীনতার প্রস্তাবকে সমর্থন না করার কথা ভাবাই যায় না।"

এই সময়ের একটি লক্ষণীয় ব্যাপার, বাংলাদেশে রাজনৈতিক শিবিরে নানা রকম ভাব থাকলেও হেমন্তকুমার বসু কিন্তু দুই শিবিরের সঙ্গে একই রকম সম্পর্ক রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে অনুশীলন ও যুগান্তর দুই দলের মধ্যে, অনুশীলন দল সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়েছিল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের শিবিরে। নো-চেঞ্জারদের ঘাঁটি উত্তর কলকাতা কংগ্রেস যার নেতা ছিলেন সুরেশ মজুমদার। সেখানে অমর বসু যুগান্তর দলের লোক হয়েও চলে এসেছিলেন সেনগুপ্তের শিবিরে। পরবর্তীকালে সুভাষ-সেনগুপ্ত বিরোধ নিয়ে রাজ্য রাজনীতির তখনকার কালে অনেক টাল-মাটাল হয়েছে, কিন্তু সুরেশচন্দ্র মজুমদার, অমর বসু, হেমন্তকুমার বসু প্রমুখ অদ্ভুত ভাবে একটা ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিতে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলছেন—

"A. I. C. C-র শেষ মিটিংএ আলোচনা হচ্ছিল—মতিলালজি চাচ্ছিলেন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস চেয়ে রেজলিউশন হোক। আপত্তি-কারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জওহরলাল। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও তাঁর লীগ যে বিরোধিতা করবেই সে তো জানা কথা।

ভোটের আগের রাত্রে মহাত্মা গান্ধী আয়েঙ্গার, জওহরলাল ও সুভাষবাবুকে ডেকে বোঝাতে লাগলেন। তিন লীগই মহাত্মার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন এবং কথা দিয়ে এলেন পরদিন সভায় তাঁরা তাঁদের বিরোধ প্রত্যাখ্যান করে নেবেন। এই যোগ-সাজসের খবর দিকে দিকে রটে গেল।

জওহরলাল মতিলালজির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন রাজনীতির মূল সূত্র নিয়ে। পূর্ণ স্বাধীনতা বনাম ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। বড্ড ভালো লাগল। পরদিন সকালে শুনলাম গান্ধীজি রাত্রে ডেকে এমন বোঝানোই বুঝিয়েছেন যে Independence League-এর সভাপতি ও সম্পাদকদ্বয় গান্ধীজির মতে মত দিয়ে ফেলেছেন। সেই রাত্রে আমার

বন্ধুদের মধ্যে একজন পদত্যাগ করে A. I. C. C.-তে শরৎচন্দ্র বসুকে সভ্য করে দেন। ভরসা—তিনি আমাদের হয়ে কংগ্রেস সভাপতির প্রস্তাবকে বাধা দেবেন। তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন।

জওহরলালজি ভোটের দিন সভায় অনুপস্থিত থাকেন। তাঁকে ডেকে পাঠানো হল। একটি চিরকুটে লিখে জবাব দিলেন **'I am happier away**—আমি বাইরে বেশ আছি।' সুভাষবাবু দেরী করছিলেন। ডেকে পাঠানো হ'ল। এলেন, বললেন—**B. P. C. C.**-এর সভাপতি হিসেবে কথা দিয়ে ফেলেছেন। এখন গান্ধীজির বিরুদ্ধে যাওয়া মুশকিল। আমি বললাম, খোলা ভোটের ব্যবস্থা করতে। সুভাষবাবু আমার পাশে এসে বসেছিলেন, বললাম, আপনি বাংলার বিপ্লবীদের প্রতিনিধি ; তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কথা দিয়ে ভুল করেছেন। এখন একমাত্র উপায়, আপনি প্রত্যেককে নিজ নিজ মত অনুযায়ী ভোট দেবার স্বাধীনতা দিন। সুভাষবাবু অবস্থা বুঝলেন। আমার কথামতো কাজ করলেন। গান্ধীজি জওহরলালের অনুপস্থিতির মহৎ কারণ জানিয়ে বাছা বাছা সুন্দর বিশেষণে তাঁকে অভিহিত করেন। এক বছরের চরমপত্রের শর্তে তাঁকে সমর্থন করতে সম্মেলনকে অনুরোধ করেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাংলার প্রতিনিধিদের সেনগুপ্তের তাঁবুতে জড়ো করা হল। সদ্য আন্দামান ফেরত মদনমোহন ভৌমিক, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী মহাশয়দের সেখানে আনা হয়েছিল। প্রশ্ন করা হয় তাঁদের কোনটা পছন্দ—ডোমিনিয়ন-স্ট্যাটাস বা পূর্ণ স্বাধীনতা? তাঁরা বলেন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস কোন্ জানোয়ারের নাম তাঁরা জানেন না। বাংলা প্রথম থেকে স্বাধীনতা দাবী করে। 'স্বরাজ' কথাটা ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে প্রথম উচ্চারিত হয়। ১৯০৭ সালে অরবিন্দ বৃটিশ শাসনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ১৯২৩ সালে স্পেশ্যাল দিল্লী সেসনে বাংলার প্রতিনিধিরা পূর্ণ স্বাধীনতা

প্রস্তাব আনেন। আজ বাংলা জগতে কি করে মুখ দেখাবে ডোমিনিয়ন-স্ট্যাটাসকে জাতীয় আদর্শ বলে প্রকাশ করলে? সুভাষবাবু বলেন—গতকাল গান্ধীজিকে যে কথা দিয়েছিলেন, সেটা দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে। তিনি সাধারণ সেবক। আজ সাধারণ যা বলবেন আগামীকাল তিনি তাই করতে প্রস্তুত। প্রকৃত প্রস্তাবে কাউকে দোষী করা যায় না। গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব এত বিশাল এবং আন্তরিকতা এতই প্রবল যে দুজন ছাড়া তাঁর সামনে কেউ 'না' বলতে পারেন নি। দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন জিন্না সাহেব।"

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে শুরু হল মিরাট যড়যন্ত্র মামলা। ভারতে কমিউনিজম প্রচার, সোভিয়েট রুশিয়ার আদর্শে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল এই মামলার মূল অভিযোগ। এই সময়ের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয় যতীন দাসের অনশনে মৃত্যু বরণে। ১৯২৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর লাহোরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্যাণ্ডার্স নিহত হলেন। হত্যাকারী সন্দেহে ধৃত হলেন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, সুখদেব ও যতীন দাস। হাজতে ও বিচারালয়ে বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগে বন্দীরা অনশন শুরু করল। একাদিক্রমে ৬৪ দিন অনশন করে প্রাণত্যাগ করলেন যতীন দাস।

যতীন দাসের মৃত্যুতে সারা ভারতের সঙ্গে বাংলা দেশেও সৃষ্টি হল উত্তাল তরঙ্গ। যতীন দাসের মৃতদেহ নিয়ে আসা হল কলকাতায়। হাওড়া স্টেশনে সেই মৃতদেহ গ্রহণ করলেন সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। কংগ্রেসের বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যতীন দাসের মরদেহ নিয়ে সংগঠিত করল ঐতিহাসিক শোকযাত্রা। সেদিন সুভাষচন্দ্রের পাশে এবং এই শোকযাত্রা সংগঠনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হেমন্তকুমার ছিলেন তাঁদের প্রধান।

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। লাহোর কংগ্রেসে যাতে পূর্ণ স্বাধীনতা পাশ হয় তার জন্য অনেক আগেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল কলকাতায়। যত বেশী সম্ভব প্রতিনিধি নিয়ে যেতে হবে লাহোরে। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব লাহোর কংগ্রেসে পাশ করাতেই হবে। বাংলাদেশ থেকে এই প্রতিনিধিদের নিয়ে যাওয়া, তার সমস্ত সংগঠনের দায়িত্ব ছিল যাঁদের উপরে হেমন্তকুমার ছিলেন তার অন্যতম। লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, কিন্তু তাতে সংগ্রামের কোন সূচী নেই। শ্রীনেহরু গণসংগ্রামের আহ্বান জানালেন কিন্তু সেখানেও সংগ্রামের ন্যূনতম কর্মসূচী রাখলেন না। সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সমগ্র সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধি রূপে এক বলিষ্ঠ নীতি পেশ করে বললেন—চাই সংগ্রাম, এগিয়ে যেতে হবে। পাল্টা সরকার গঠনই লক্ষ্যনীয়।

এ বৎসর সুভাষচন্দ্র ও হেমন্তকুমার প্রমুখের অন্যতম প্রধান কাজ হয়েছিল নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক বন্দী দিবস। এই বন্দী দিবস উপলক্ষ করে সুভাষচন্দ্র যে শোভাযাত্রা সংগঠন করেন তাতে ভবিষ্যতে রাজদ্রোহের অভিযোগে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। বন্দীদের দাবীর সমর্থনে শোভাযাত্রা সংগঠনে হেমন্তকুমার ছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রধান সহকারী। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে শ্রীসুধীর ঘোষ তাঁর স্মৃতিচারণ করে বলছেন—"মনে আছে ১৯২৯ সালের কথা। ১৯২৯ সালের ৬ই এপ্রিলের কথা মনে পড়ে, যেদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মহাত্মা গান্ধী বিদেশী বস্ত্রের বহ্নু্যৎসব করলেন। সেদিনকার ঐ সভার সভাপতি ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে লক্ষ লক্ষ জনতার সমাবেশ—এমন অপূর্ব সংগঠন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও হেমন্তবাবুর জন্যই সম্ভব হয়েছিল। মনে আছে এর পর বাংলা দেশের

নানা প্রান্তে কলকাতার নানা কোণে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন ও বিদেশী বস্ত্র ও দ্রব্যের দোকানে দোকানে পিকেটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজে হেমন্তদার সহযোগী ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্য কলকাতার বিনয়কৃষ্ণ বসু, বড়বাজারের পুরুষোত্তম রায় প্রমুখ।

১৯২৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তিলে তিলে আত্মদানকারী শহীদ যতীন দাসের মৃতদেহ নিয়ে অবিস্মরণীয় শোকযাত্রা—হেমন্তদার অনুপ্রেরণায় উত্তর কলকাতার যুবক ও কর্মীদল সেদিন সহস্রে সহস্রে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়েছিল।

১৯২৯-এর শেষ ধাপে লাহোর কংগ্রেসে হেমন্তদার নেতৃত্বে প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হ'ল। বিপুল জলোচ্ছ্বাসের মত উদ্বেল ও ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রাণিত কর্মীদল ফিরে এসে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।"

১৯৩০ সাল। ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। কিন্তু জন্মদিনের উৎসব বা মাঙ্গলিক কিছুই সেদিন শেষ হল না। তার আগেই রাজদ্রোহের অভিযোগে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হল। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য কংগ্রেসে জোর লড়াই জমে উঠল—একদিকে জে. এম. সেনগুপ্ত আর একদিকে সুভাষচন্দ্র। বি. পি. সি. সি. ও কর্পোরেশনের নেতৃত্ব লাভের জন্য দুই পক্ষের প্রতিযোগিতা চরম আত্মকলহের রূপ নিল। কিন্তু উত্তর-কলকাতা কংগ্রেসের কয়েকজন মানুষ, যাঁরা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে চলতেন বা যাঁদের সেনগুপ্তের লোক বলেই পরিচিতি ছিল—তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার সুভাষ-চন্দ্রেরও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এঁরা হলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমন্ত বসু, অমর বসু, হরিদাস ঘোষ। বহু ভোটাভুটির ক্ষেত্রে এঁরা

সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেন নি, আবার বহুক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থনের জন্যে এগিয়ে আসতেও পিছপা হন নি। তাই সেনগুপ্ত-সুভাষচন্দ্র বিরোধে এঁরা যে কখন কার দিকে সেটা বোঝা সহজসাধ্য ছিল না।

সুভাষচন্দ্র মেয়র হলেন জেলে থাকতেই। ২৫শে সেপ্টেম্বর জেল থেকে মুক্তি লাভ করে সুভাষচন্দ্র সোজা মেয়রের আসনে গিয়ে বসলেন।

ইতিমধ্যে ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। মহাত্মাজী ডাক দিয়েছেন লবন আইন ভঙ্গের। ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। ৬ই থেকে ১৩ই এপ্রিল ভারতের জাতীয় সপ্তাহ পালন করা হবে। ১২ই মার্চ ৭৯ জন আশ্রমিকসহ সবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডী রওনা হলেন মহাত্মাজী। ডাণ্ডী সবরমতী থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরে। গান্ধীজির পদযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সর্বত্র লবন আইন ভঙ্গের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। সেই ঢেউ লাগল বাংলা দেশেও। কিন্তু এতবড় আন্দোলনের মুখেও বাংলা দেশের কংগ্রেস এক হয়ে দাঁড়াতে পারল না। সেনগুপ্ত সুভাষ যতারীতি আলাদা শিবিরে বিভক্ত হয়েই রইলেন। সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরা যথা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায়, অরুণ গুহ প্রমুখ ঠিক করলেন লবন আইন ভঙ্গ করবেন কালিকাপুর অঞ্চলে, আর সেনগুপ্তের নেতৃত্বে আইন অমান্য পরিষদ ঠিক করল লবন আইন ভঙ্গ করবে মহিষবাথানে। এই আইন অমান্য পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত বসু, অমর বসু। পুলিশ গ্রেপ্তার করল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে। লবন আইন ভঙ্গের অপরাধে হেমন্ত বসু সহ অন্যান্যের এক বছর জেল হল। এই সময় থেকে হেমন্তকুমার বসুকে দেখা যায় একান্তভাবে গান্ধীবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। খদ্দর পরিধান, বিক্রয়—চরকা কাটা

অনেক আগে থেকেই শুরু করেছিলেন, এখন থেকে গান্ধীবাদকে জীবনের ক্ষেত্রে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ শুরু করেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দমননীতি নেমে আসে। জরুরী আইন জারী করে ভারতের ১৩১ খানি সংবাদপত্রের উপর জামিন স্বরূপ টাকা জমা দেবার আদেশ জারী করা হয়। বাংলাদেশের আনন্দবাজার পত্রিকা জামিনের টাকা জমা দিতে অস্বীকার করে এবং ছ মাসের জন্য কাগজ বন্ধ করে দেয়। আইন অমান্য আন্দোলন—লবন আইন ভঙ্গে বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলায় সবচেয়ে বেশী সাড়া পড়ে। ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে নরঘাটে কারাবরণ করেন অজয় মুখোপাধ্যায়। এই সময় থেকে ১৪৪ ধারা অমান্য করাও আন্দোলনের একটি অঙ্গ হয়ে ওঠে। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আইন অমান্য করে হাজার হাজার ব্যক্তি কারারুদ্ধ হলেন।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ভারতের গণতন্ত্র বাহিনীর ৬৪ জন জোয়ান 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' করে মহানায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করে ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করলেন। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পর্বত শিখরে অসংখ্য ইংরেজ সৈন্যকে পরাস্ত করে বিপ্লবীরা বিজয় পতাকা উড্ডীন করল। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের তথা সৈন্য বাহিনীকে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালে সূর্য সেন বুঝি সেই ব্যর্থতার সমাধির উপর নূতন দূর্গ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের মূল নায়করা তাঁদের এই সামরিক অভ্যুত্থানের প্রকৃত প্রেরণা পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে। আর সেক্ষেত্রে হেমন্ত বসুর অবদানও কম ছিল না। গান্ধীজির অহিংস কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রভাবের প্রতি

চালেঞ্জ জানিয়ে ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক পোশাক পরানো হয়েছিল—হাতে দেওয়া হয়েছিল অস্ত্র। কলকাতা কংগ্রেসে সেদিন যাঁরা সামরিক পোশাক পরেছিলেন তাঁরাই ভাবীকালে দেখা দিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের নায়ক রূপে, দেখা দিলেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অলিন্দ যুদ্ধের নায়ক রূপে—তাঁদেরই শেষবার দেখা যায় মণিপুর সীমান্ত মৈরাঙে।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে সামরিক পোশাক পরে লেফট-রাইট· লেফট-রাইট শুরু—১৯৪৫ সালে মণিপুর সীমান্তে তার শেষ। এই শুরুর নায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র আর ভারতবর্ষের একটি প্রান্ত থেকে বৃটিশ 'শক্তিকে উচ্ছেদ করে স্বাধীনতার পতাকা তুলে এই যাত্রার শেষও করলেন সুভাষচন্দ্র। কলকাতা কংগ্রেসে যে স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীর অঙ্কুর দেখা যায় চট্টগ্রামে দেখা যায় তারই পল্লবিত শাখা, আর আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে 'তা রূপ নেয় মহীরূহের। সেদিন সামরিক বাহিনীর ক্রেরতা হেমন্তকুমার বসুই তালিম দিয়েছিলেন পায়ে পা মিলিয়ে চলতে। - সত্য গুপ্ত, যতীন দাস, পঞ্চানন চক্রবর্তী, যতীশ জোয়ারদার, বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল সেদিন ছিলেন হেমন্তকুমার বসুর সহকর্মী, সহযাত্রী।

কলকাতা কংগ্রেস থেকেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সূর্য সেনের হৃদ্যতা। তখন থেকেই চট্টগ্রাম সুভাষচন্দ্রের পেছনে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের মানুষ কিন্তু সেনগুপ্ত-সুভাষ বিরোধে সুভাষচন্দ্র সবচেয়ে বেশী সমর্থন সম্ভবত পেয়েছিলেন চট্টগ্রামের যুব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। "চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ" গ্রন্থে অনন্ত সিংহ এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "১৯২৯ সালে বাংলাদেশে যে মত ও পথ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল, তা ক্রমেই দুইটি বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ভাবধারার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। একটি চিন্তাধারার মূল গতি গান্ধীজির অহিংস আদর্শ যা বাংলাদেশে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের

নেতৃত্বে রূপ নিয়েছে এবং অপরটি স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ, যা গান্ধীজির শান্তিপূর্ণ অহিংস সংগ্রামের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে সুভাষের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়েছে। এই দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারা যেমন বিভিন্ন কংগ্রেস কর্মীরা অনুসরণ করেছে, ঠিক তেমনি বাংলার ছাত্র ও যুবসমাজও অনুশীলন এবং যুগান্তরের প্রবীণ নেতাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রকাশ্য ফ্রন্টে রাজনৈতিক কাজ ও সংগঠনের জন্য যতীন্দ্রমোহন বা সুভাষকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সমর্থন করেছে। আমরা মাস্টারদার নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রকে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতিরূপে নির্বাচিত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাফল্যের জন্য অনুশীলন পার্টি ও যুগান্তরের একটা অংশ যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন জানায়।

চট্টগ্রামে সুভাষের সমর্থনে আমরা জয়ী হই এবং চারটি ভোটের সংখ্যাধিক্যে সুভাষ বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই ঐতিহাসিক সূত্রে শরৎবাবু ও সুভাষের সঙ্গে আমরা গভীর ভাবে যুক্ত ছিলাম। আমাদের যুববিদ্রোহের পর তাঁদের সঙ্গে আমাদের ও চট্টগ্রামবাসীর সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠল।"

(চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ : ১য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৬)

এখানে আরো উল্লেখ করা দরকার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের কিছু আগে সুভাষচন্দ্র চট্টগ্রামে এসেছিলেন। তিনি গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, ত্রিপুরা সেনের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের পরিদর্শন করেছিলেন। মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখের একটা গোপন বৈঠকও হয়েছিল। সূর্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত বাহিনীর নাম ছিল, 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত বাহিনীর নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'। সবকিছুর মধ্যে যেন একটা গভীর যোগসূত্র রয়ে গেছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের মধ্যে ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে

সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অবদান কতখানি ছিল অথবা সূর্য সেন কলকাতায় এসে সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যে সব আলাপ আলোচনা করে যেতেন অথবা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের প্রস্তুতি পর্বের শেষ সময়ে সুভাষচন্দ্র চট্টগ্রামে উপস্থিত হয়ে কী নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন সে সব কথা প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু একথা সত্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের বীর-বিপ্লবীদের আইনের যুদ্ধে আদালতের মাধ্যমে মুক্ত করে আনার জন্য শরৎচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টা ছিল সবচেয়ে বেশী। আর পরবর্তী কালে এই বন্দীদের মুক্ত করা, আন্দামান থেকে বাংলাদেশের জেলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টা ও বন্দীমুক্তি আন্দোলনের চাপে সরকারকে নতিস্বীকার করানোর মাধ্যমে।

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। সেদিন হৈ-হৈ কাণ্ড। চন্দননগরে টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের কয়েকজন নেতার খণ্ডযুদ্ধ হল। ধরা পড়লেন গণেশ ঘোষ। নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী "রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়" গ্রন্থে এই দিনের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সংক্রান্ত কতিপয় বীর সন্তানকে চন্দননগরে স্থানান্তরিত করা বিশেষ আবশ্যক বোধ হয়। বসন্তকুমারের অফিসে বসন্তকুমার (ব্যানার্জী "মেজদা") ও ফরোয়ার্ড অফিসে নরেন্দ্রনাথের সহিত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত উক্ত বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসেন। সহরের অবস্থা বুঝিয়া চন্দননগরে আশ্রয়দান অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। সেই সময়ে বসন্তকুমার কাশীশ্বরী পাঠশালার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথও তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরামর্শ-ক্রমে পরে স্থির হয়, তাঁহারা একজন শিক্ষয়িত্রী দিতে-পারিলে এবং স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করিবার অবস্থা থাকিলে চন্দননগরে আশ্রয়দান

সম্ভব। সেই পরামর্শানুসারে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হিসাবে এবং শশধর আচার্য স্বামী সাজিয়া চন্দননগরে আসেন। সত্যেন্দ্রকুমার পল্লীমধ্যে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবীর নামে একটি বাসা ভাড়া করেন। এই বাসা ভাড়া লইবার পূর্বে একবার গণেশ ঘোষ ২।১ রাত্রি কাশীশ্বরী পাঠশালা ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই নূতন বাসায় অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, মাখন ওরফে জীবনলাল ঘোষাল, আনন্দ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন প্রায় চারিমাস কাল সেখানে নির্বিঘ্নে বাস করেন। কোনরকমে সন্ধান পাইয়া ১৯৩০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর শেষরাত্রে মিঃ টেগার্ট কর্তৃক সেই বাসা আক্রান্ত হয়। তাঁহার আগমনের কথা পূর্বে আভাসে জানিতে পারা যায় এবং বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িবার সময় থাকিলেও কোন বিশেষ কারণে সরিয়া পড়া ঘটিয়া ওঠে না, তবে সারারাত্র পাহারা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া পলাতকরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্বে অনন্ত সিংহ সেই বাসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই বাসা অবরোধ-কালে উভয়পক্ষে গুলীবর্ষণের ফলে মাখনলালের দেহাবসান ঘটে এবং অপর সকলে গ্রেপ্তার হন।"

টেগার্ট সাহেব চন্দননগর থেকে গণেশ ঘোষ প্রমুখকে জেলবন্দী করলেন বটে কিন্তু তাঁকে নিজেকে পালাতে হল ভারত ছেড়ে। ডালহৌসী স্কোয়ারের উপরে টেগার্ট সাহেবের গাড়িতে বোমা পড়ল। টেগার্ট সাহেব বেঁচে গেলেন—কিন্তু ভারতে থাকতে আর ভরসা পেলেন না। টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টা করেন অনুজা সেনগুপ্ত ও দীনেশ মজুমদার। প্রথমে গাড়ীতে বোমা মারেন অনুজা তারপর রিভলবার নিয়ে এগিয়ে যান গাড়ীর দিকে। তখনই দীনেশ বোমা নিক্ষেপ করে গাড়ী লক্ষ্য করে—বোমায় আহত হন অনুজা। বিস্ফোরণে অনুজার পেটটাই উড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুজার মৃত্যু

হয়। দীনেশ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়—কিন্তু একদিন জেল থেকেও দীনেশ পালিয়ে যায়। তারপর আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে—তখন পুলিশের সঙ্গে তাঁর গুলীর লড়াই হয় এবং পরে মামলায় তাঁর ফাঁসি হয়।

টেগার্টের গাড়ীতে ডালহৌসী স্কোয়ারে বোমা মারার পর সারা কলকাতা তল্লাসী শুরু হল। গ্রেপ্তার হলেন ডাঃ নারায়ণ রায় সহ আরো অনেকে। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে প্রবীণ বিপ্লবী অমর বসু বললেন, "কলকাতার দাঙ্গার পর সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে আমাদের নিয়মিত শরীরচর্চা করানো হত। আমি লাঠি আর কুস্তি শেখাতাম, হেমন্ত ড্রিল করাত। তবে এসবের আড়ালে বিপ্লবী আন্দোলনের রসদ জোগানো হত। ডাঃ নারায়ণ রায় যে ধরা পড়ল বা টেগার্টকে মারবার যে পরিকল্পনা হয়েছিল তার মূলে ছিল এই ব্যায়াম সমিতি। কালীকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেনে একটা পোড়ো বাড়ীতে আমরা ছাপাখানা বসিয়েছিলাম। সেখানে কাগজ ছাপা হত। সেই কাগজ বিলিবণ্টনের প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও পঞ্চানন চক্রবর্তীর উপর। এই সময় একদিন কলেজ স্কোয়ারের পাশে বৌদ্ধবিহারের পিছনে একটা বাড়ীতে আমরা সভা করছিলাম। অমর চট্টোপাধ্যায়, জিতেন চট্টোপাধ্যায়, বিনয় বসু, পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতারাম সাকসেরিয়া প্রমুখ ছিলাম। পুলিশ এসে আমাদের সকলকে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করল। নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে এখন যেখানে জোড়াবাগান থানা সেখানে কোর্ট ছিল। সেই কোর্টে আমাদের হাজির করা হল।"

টেগার্ট পালিয়ে গেল, কিন্তু বিপ্লবীদের সাহেব মারার ঝোঁক আরও বেড়ে গেল। টেগার্টের স্থলাভিষিক্ত হলেন লোম্যান। একদিন ঢাকায় মেডিক্যাল স্কুলে বিনয় বসুর রিভলভারের গুলীতে লোম্যান মারা গেল। লোম্যান হত্যার কিছুদিন পরই কলকাতায়

আবার তোলপাড়। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দোতলায় সিম্পসনের অফিসে তিন বিপ্লবীর সশস্ত্র আক্রমণ এবং সিম্পসন নিহত। আততায়ী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত। বিনয়-বাদল-দীনেশ—আজ রাইটার্স বিল্ডিং তথা মহাকরণের সর্বপ্রধান স্থানে এই তিন বিপ্লবীর ছবি। লালদীঘির নাম বদলে নাম হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ। ১৯৪৮ সালে পূর্তমন্ত্রী হয়ে এলেন হেমন্তকুমার বসু। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। মহাকরণে স্থান পেল শহীদদের ছবি। কলকাতার বুক থেকে উপড়ে ফেলবার পরিকল্পনা হল সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ ও অত্যাচারী শাসক বৃটিশ প্রতিনিধিদের প্রতিমূর্তিগুলি। ১৯৪০ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পূর্তমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় লালদীঘির নাম বদলে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ করলেন আর হেমন্তকুমার বসু যে কাজ শুরু করেছিলেন সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কাজ শেষ করলেন সমস্ত বিদেশী শাসক প্রতিনিধিদের প্রতিমূর্তিগুলি অপসারিত করে। সিম্পসনকে হত্যা করার পর বিনয় বসু নিজের রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করে, বাদল পটাশ সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে, আর দীনেশ জীবন্ত ধরা পড়ে। শোনা যায় আক্রমণের সময় ঘরে উপস্থিত এক সাহেবের পাৎলুন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর এক তরুণ আমেরিকান পাদ্রী আলসে টপকে আমেরিকান পদ্ধতিতে রেন পাইপ বেয়ে রাস্তায় নেমে পালায়।"

(বিপ্লবের সন্ধানে : নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮০)

"...Lt. Col. N. S. Simpson was shot dead.

...Mr. J. W. Nelson, Judicial Secretary, was wounded in the leg. Another bullet narrowly missed Mr. A. Marr, Finance member, who on hearing the shots came to the door of his room.

Orderly of the D. P. I. was wounded in the leg. Passerby were dumb founded to see in

broad day light, in the heart of the business quarters of Calcutta an incident that had all the elements of a Chicago gunning affair."

(Statesman, 9th December 1930)

অমৃতবাজার পত্রিকার বিবরণ :

...."between I. G. or prisoners room and Mr. Nelson's room, many Europeans had hair-breadth and providential escapes. Mr. Yownen, Agricultural and Industrial secretary had the skirts of his coat and waist-coat shot through without any injury to his person. Mr. Prentice, home-member escaped unhurt.

Mr. Marr, Finance member, had a providential escape. Mr. Stapleton, D. P. I. along with his P. A. and another European official narrowly escaped. Holes near the gate of Mr. Nelson's room and another at the ceiling of Mr. Prentice's room were found later on. Holes were of the size of the tennisball.

They dashed into Passport office and re-loaded their revolvers there. one American Missionary. Mr. E. S. Johnson, waiting in that office out of fear made his escape down with the help of a drain pipe.

(A. B. P., 9th Dec. 1930)

আনন্দবাজার পত্রিকার বিবরণ :

"গুলীর আঘাতে বাংলার কারাবিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল নিহত।

গতকল্য বেলা ১২টার সময় কলিকাতার বুকের উপর রাইটার্স বিল্ডিং-য়ে এক বিষম দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

৩ জন বাঙালী যুবক বাংলার কারাগার বিভাগের ইনস্পেক্টর্ জেনারেল লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল সিম্পসনকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।

বেলা ১২-১৫ মিঃ হইতে ১২-৩০ মিনিটের মধ্যে ৩ জন বাঙালী যুবক কারাগার বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেল অফিসে (রাইটার্স বিল্ডিং) আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্নেল সিম্পসন তখন তাঁহার খাস মুন্সির (পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট) সঙ্গে তাঁহার অফিসে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। যুবকত্রয় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে চাপরাশি তাহাদিগকে উপরোক্ত কারণে অপেক্ষা করিতে বলে এবং কি কাজের জন্য তাহারা দেখা করিতে চায় তাহা যথারীতি টুকরা কাগজে লিখিয়া দিতে বলে। কিন্তু যুবকগণ ইহা করিতে অস্বীকৃত হয় এবং তাহাকে একপাশে ঠেলিয়া স্প্রিংয়ের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং দ্রুতগতিতে কর্নেল সিম্পসনের প্রতি ৫।৬ বার গুলী নিক্ষেপ করে। গুলীর আঘাতে কর্নেল সিম্পসন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কর্নেল সিম্পসনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আততায়ীরা বারান্দা দিয়া চলিয়া আসে। দৌড়াইবার সময় তাহারা অফিসগুলির কাঁচের জানালায় এবং সিলিংয়ে গুলী করিতে থাকে। রাজস্ব সচিব মিঃ মারের অফিসের জানালায় গুলীর চিহ্ন রহিয়াছে। মিঃ জে ডব্লিউ লেনসনের অফিসেও গুলীর চিহ্ন রহিয়াছে।

অতঃপর তাহারা পাসপোর্ট অফিসে প্রবেশ করে এবং একজন আমেরিকানকে গুলী করে, কিন্তু গুলী ব্যর্থ হয়। কোন চাপরাশীর গায়ে গুলী লাগে নাই। অতঃপর আততায়ীগণ নেলসন সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে এবং তাহার উরুতে গুলী করে। তাঁহার আঘাত গুরুতর নহে।

শেষ খবরে জানা যায় একজন আততায়ী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। অপর দুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

একজনকে বিনয়কৃষ্ণ বসু বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। সে নাকি মৃত্যুকালে এই মর্মে এক জবানবন্দী দিয়াছে যে, সে-ই বিনয়কৃষ্ণ বসু এবং সে-ই মিঃ লোম্যানকে হত্যা করিয়াছে। আততায়ীগণ তিনজনেই ইউরোপীয় পোশাকে ভূষিত হইয়াছিল। বারান্দা দিয়া গুলী করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় উহারা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিতেছিল।" (আনন্দবাজার, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩০)

দুদিন পরে ১১ই ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে পাওয়া গেল বিস্তৃত বিবরণ।

"রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাতায়াত সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। পশ্চিমদিকের সিঁড়ি ছাড়া আর সকল সিঁড়িতে সাধারণের যাতায়াত সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। যাহাতে কেহ প্রবেশ পত্র ছাড়া উপরে যাইতে না পারে, এজন্য প্রত্যেক সিঁড়ি ও লিফ্‌টে সার্জেণ্ট পাহারা বসানো হইয়াছে। নিচতলায় বাইরের লোকের জন্য চেয়ার-টেবিল রাখা হইয়াছে। যাহারা অবিরত রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাতায়াত করে, তাহাদিগকে একখানা করিয়া প্রবেশপত্র দানের ব্যবস্থা হইবে।

... ...

তদন্তে জানা যায় যে, আততায়ীগণ তিনজনেই রাইটার্স বিল্ডিংয়েই বিষপান করিয়াছিল। কিন্তু বিনয় ও দীনেশের পাকস্থলীতে বিষ প্রবেশ করিবার পূর্বেই তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে গুলী করে ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে। হাসপাতালে আনীত হইবার পরই উহাদের দেহ হইতে বিষ বাহির করিয়া ফেলা হয়।

গতকল্য বৈকালে খোঁজ লইয়া জানা গেল, বিনয় বসুর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। তাহার মাথার মগজ-ক্ষতমুখ বাহিয়া এখনও রক্ত চুয়াইয়া পড়িতেছে। বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত উভয়কেই মঙ্গলবার রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার

ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। প্রকাশ যে দীনেশের যে গুলী আটকাইয়া রহিয়াছে, উহার উপর অস্ত্রোপচারের ধাক্কা দীনেশ সহিতে পারিবে না, এই আশঙ্কায় আর বাহির করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।"

মৃত্যুশয্যায় বিনয় বসু : জনক-জননীর নিকট হইতে শেষ বিদায়।

"গতকল্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তদন্ত করিয়া জানা গেল যে, বিনয়কৃষ্ণ বসু মরণাপন্ন। সে অচেতন অবস্থায় চক্ষু বুজিয়া রহিয়াছে।

প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়া গতকল্য বিনয়ের বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসু, বৃদ্ধা মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু হাসপাতালে বিনয়কে দেখিতে যান। তাঁহারা 'বিনয় বিনয়' বলিয়া বারংবার ডাকিতে থাকেন এবং কাঁদিতে থাকেন। বিনয় সাড়া দিতে সমর্থ হয় নাই। একবার মাত্র সে তাহার ডান হাতখানি উঠাইয়া কপালে ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধহয় জনক-জননীকে শেষ নমস্কার জানাইতেছিল। বৃদ্ধ পিতামাতার নিকট এই দৃশ্য অসহ্য হইল, তাঁহারা সাশ্রুলোচনে হাসপাতাল ত্যাগ করিলেন।" (আনন্দবাজার, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩০)

১৯৩১ সালে বাংলাদেশের রাজনীতি তুঙ্গে উঠল। জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একটা উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশ করে এক সপ্তাহের জন্য জেলে যান। ২৬শে জানুয়ারী, জেল থেকে বেরুবার মাত্র কয়েকদিন পরে, বের করলেন স্বাধীনতা দিবসের মিছিল। স্বাধীনতা দিবসের মিছিল বেরিয়েছে— পুলিশ এসে প্রথমে প্রহার তারপর করল গ্রেপ্তার। দেখা গেল হেমন্তবাবু প্রমুখেরা কোন সময়ে সেনগুপ্ত-সুভাষ দুই শিবিরকে

একাকার করে সুভাষচন্দ্রের আইন অমান্য শোভাযাত্রার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেদিনের ইতিহাস বর্ণনা করে শ্রীসুধীর বসু বললেন, "১৯৩১-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন, হরতাল, পিকেটিং, পুলিশের লাঠিচালনা নতুন ইতিহাস রচনা করল। কিছুদিন আগেই হেমন্তদা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পাশে দাঁড়িয়ে কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করেন এবং শ্রী সেনগুপ্তের সঙ্গে হেমন্তদা ও শচীন মিত্র গুরুতর ভাবে প্রহৃত হন।"

যতীন্দ্রমোহন যখন পুস্তক পাঠ করে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করছেন, তখন হেমন্ত বসু, অমর বসু যতীন্দ্রমোহনের পাশে আছেন—আবার সুভাষচন্দ্র ১৪৪ ধারা ও সরকারী নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করতে যখন এগিয়ে যাচ্ছেন তখন হেমন্ত বসু প্রমুখরা সুভাষচন্দ্রের পাশে আছেন। যেখানে আন্দোলন, যেখানে সংগ্রাম সেখানেই হেমন্ত বসু আছেন, সেখানে নেতা যতীন্দ্রমোহনই থাকুন আর সুভাষচন্দ্রই থাকুন অথবা সতীশ দাশগুপ্তই থাকুন।

লবণ আইন ভঙ্গের পর জেল থেকে বেরিয়ে হেমন্তবাবু মিলিত হলেন যতীন সেনের সঙ্গে। যতীন সেন তখন বিদেশী পণ্য বর্জনে অগ্রগামী শিবিরের সৈনিক। হেমন্তকুমার যতীন সেনের সঙ্গে সারা কলকাতায় বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলন করেছিলেন। ৫ই মার্চ দিল্লিতে গান্ধী আরউইন চুক্তিটি সম্পাদিত হল এবং সমস্ত সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। ৮ই মার্চ সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করলেন। তিনি জেল থেকে বেরিয়েই সোজা চলে গেলেন গান্ধীজির কাছে। গান্ধীজির কাছে সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ—হয় গান্ধী-আরউইন চুক্তি বাতিল করতে হবে, অথবা ভগৎ সিংদের ফাঁসি বন্ধ করতে হবে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

করাচী-কংগ্রেস মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে।

করাচী-কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যক

প্রতিনিধি করাচী নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলেন। এ কাজের প্রধান দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করলেন হেমন্তকুমার বসু তাঁদের অন্যতম। অকস্মাৎ ২৪শে মার্চ প্রভাতী-সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল "পূর্বদিন রাত্রে ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরুকে লাহোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।" এই ফাঁসির সংবাদ সারা দেশে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধের সৃষ্টি করল। ২৪শে মার্চ ডাক দেওয়া হল 'ভগৎ সিং শোকদিবস' পালনের। নওজোয়ান সঙ্ঘের উদ্যোগে বিরাট বিক্ষোভ-মিছিল—তাদের হাতে কালো পতাকা—ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির জন্য গান্ধীজিকে দায়ী করল তারা।

করাচী-কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রকে খুব তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। কারণ, এদিকে বাংলা কংগ্রেসের সেনগুপ্ত-সুভাষ বিরোধ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন নিয়ে তুঙ্গে উঠেছে। অবশ্য এই বিরোধের মীমাংসা হয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সর্বসম্মতভাবে মেয়র নির্বাচিত হলেন এবং আব্দুল রেজাক খাঁ হলেন ডেপুটি মেয়র। মেয়র নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে হলেও সেনগুপ্ত-সুভাষ বিরোধ কিন্তু কোনক্রমেই হ্রাস পায় না। কংগ্রেসের ছাত্র প্রতিষ্ঠানটি দুই ভাগ হয়ে গেল—যথা বি. পি. এস. এ. ও এ. বি. এস. এ.। দুই ছাত্রসংস্থারই সম্মেলন ডাকা হল ময়মনসিং জেলায়। বি. পি. এস. এ-র সম্মেলন হবে নেত্রকোণায় আর এ. বি. এস. এ-র সম্মেলন হবে ময়মনসিং শহরে। সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন দুইজনেই তখন পূর্ববঙ্গে। যতীন্দ্রমোহন ময়মনসিং শহরে উপস্থিত হলে সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয় এবং ছাত্রসম্মেলন পণ্ডও হয়ে যায়। সেনগুপ্ত-সুভাষ বিরোধ মেটাতে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজিকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। সেনগুপ্ত-সুভাষের বিরোধ যখন চলছে তখন পুলিশের নির্যাতন ও দমননীতির বেশ সুযোগ জুটে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও ঘটে গেল। ৭ই এপ্রিল

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডি বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ হারান। পুলিশ যেন ক্ষেপে গেল। রাজ্যব্যাপী তাণ্ডবলীলা শুরু করল। এর মধ্যে ৭ই জুলাই দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে গেল। সর্বনাশের পর সর্বনাশ। ২৮শে এপ্রিল উত্তর ও পূর্ববঙ্গে ভয়াবহ বন্যা। [এই বন্যায় অগণিত মানুষ সর্বস্বান্ত হল—ধনসম্পদ প্রাণ-হানি ঘটল বহু। কিন্তু এতবড় দুর্ভাগ্যের মধ্যেও ত্রাণকার্য নিয়ে সেনগুপ্ত-সুভাষের দল ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না। শুধু অনৈক্যই নয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র, এন. এল. দত্ত, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তর দুটো ত্রাণ কমিটি গঠন নিয়ে বিবৃতি পাল্টা-বিবৃতি—বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করল। কিন্তু এই বিরোধের ব্যতিক্রম ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমন্ত বসু, অমর বসু সহ বেশ কিছু কর্মী। এই কর্মীরা নেতাদের ঝগড়ার মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে কখনো কাজের ক্ষতি হতে দিতেন না। তাই বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে এঁরা চলে গেলেন নাটোর, রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর। কিন্তু বন্যা মহামারী যাঁদের এক করতে পারল না তাঁদের এক করে দিল দুই অমর শহিদ—সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত]

১৬ই সেপ্টেম্বর খবর এসে পৌঁছল হিজলী বন্দীশালায় পুলিশের নৃশংস গুলী চালনায় সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হয়েছেন এবং আরও বহু বন্দী আহত হয়েছেন। খবর পৌঁছনো মাত্র সেনগুপ্ত ও সুভাষ দুই শিবিরের কর্মীদের ছোটাছুটি পড়ে গেল। এই কর্মীদের উদ্যোগেই বাংলাদেশের দুই নেতা এক হলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসু দুজনেই রওনা হলেন হিজলীর পথে। সঙ্গে চললেন অধ্যাপক নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। হিজলী বন্দীশালায় পেডি ও গার্লিকের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল ইংরেজ। গার্লিক দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। দীনেশের ফাঁসির

ঠিক ২০ দিন পরে বিচারকের আসনে বসা গার্লিককে খুন করল এক যুবক। গার্লিকের হত্যার পরই সেই যুবক মুখে পুরে দিল বিষের পুরিয়া, পকেটে লেখা একখানা চিরকুট "দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেবার পুরস্কার—ইতি বিমল দাশগুপ্ত।" বিমল দাশগুপ্ত, যে কিছুদিন আগে পেডিকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। মৃতদেহ সনাক্ত করবার জন্য বিমল দাশগুপ্তের বাবা-মাকে নিয়ে আসা হল। কিন্তু তাঁরা মৃতদেহ দেখে বললেন, "না, এ বিমল দাশগুপ্ত নয়।" তবে কে এই যুবক? পুলিশের মাথায় নূতন ভাবনা—বিমল দাশগুপ্তের নামে চিরকুট পকেটে রেখে গার্লিককে হত্যা করল কে? আর এই গার্লিক হত্যারই প্রতিশোধ নিল হিজলী বন্দীশালার ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার। গুলী চলল—নিহত হল সন্তোষ মিত্র, তারকেশ্বর সেন। সন্তোষ মিত্র হেমন্তকুমারের বন্ধু,—সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী। তাই সুভাষচন্দ্র গেলেন সহপাঠী বন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে আসতে আর হেমন্তকুমার বসু সারা কলকাতাকে প্রস্তুত করলেন সেই মৃতদেহকে নিয়ে শোকযাত্রা সংগঠন করতে। ১৮ই সেপ্টেম্বর স্পেশাল ট্রেনে মৃতদেহ নিয়ে যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলেন। সেখান থেকে শোকযাত্রা গেল কেওড়াতলা শ্মশানে।

মোড় ঘুরে গেল বাংলাদেশের রাজনীতির। ১৮ তারিখ রাত্রেই সুভাষচন্দ্র বি. পি. সি. সি. থেকে পদত্যাগ করলেন এবং এক বিবৃতিতে বললেন, "আমাদের বন্ধুবর্গকে জেলের মধ্যে কুকুর-বেড়ালের মত গুলী করিয়া মারিবে আর আমরা তখন বিবাদ বিসম্বাদে রত থাকিব? সকল বিভেদ ভুলিয়া আমাদের মিলিতে হইবে। শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।"

পরদিন ১৯শে সেপ্টেম্বর মনুমেণ্ট ময়দানের পাদদেশে অভাবনীয় দৃশ্য। সভামঞ্চে পাশাপাশি দাঁড়ালেন যতীন্দ্রমোহন ও

সুভাষচন্দ্র। মুহূর্তে নেতৃবৃন্দের ঐক্যবদ্ধ রূপে শোক ভুলে শপথ নিল সহস্র সহস্র জনতা। সুভাষচন্দ্র বললেন, "আত্মোৎসর্গীদের এই মহান আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার বিরাট ঐক্য-সৌধ গড়িয়া উঠিবে।"

সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ, সভা হোক, সে সভায় তিনি সভাপতিত্ব করবেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর সভা ডাকা হল টাউন হলে। রবীন্দ্রনাথ সভায় বক্তৃতা দেবেন এই সংবাদে সভা শুরুর অনেক আগেই শুধু টাউন হল নয়, টাউন হলের চতুর্দিক জনসমুদ্রে পরিণত হল। উদ্যোক্তারা বাধ্য হয়ে সভাস্থল ময়দানে পরিবর্তন করলেন। রবীন্দ্রনাথ মনুমেন্টের ময়দানে অসুস্থ শরীরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ পাঠ করলেন। তিনি বললেন,—"এত বড় সভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তি-জনক। কিন্তু ডাক যখন পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে। রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত চিরনীরব করে দিয়েছে।"

সুভাষচন্দ্র দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করলেন। তারকেশ্বর সেনগুপ্তের চিতাভস্ম নিয়ে সুভাষচন্দ্র গেলেন তারকেশ্বরের নিজ গ্রাম গৈলাতে। গৈলায় দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন, "হিজলী আর চট্টগ্রামের ঘটনা বাংলা কখনও নীরবে সহ্য করবে না।" সুভাষচন্দ্র গৈলায় যে সময় সভা করছেন—হেমন্তকুমার বসু তখন সভা করছেন বিডন স্কোয়ারে। বিডন স্কোয়ারে সভায় ভাষণ দিয়ে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে হেমন্তকুমারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আবার জেল। জেল থেকে বেরিয়ে দুটো দিন না যেতেই এসে গেল ক্ষুদিরামের মৃত্যুবার্ষিকী। রাজ্যব্যাপী সর্বত্র ক্ষুদিরামের মৃত্যুবার্ষিকী পালনের আহ্বান জানানো হল। হেমন্তকুমার বসু আহ্বান জানালেন,

"ক্ষুদিরামের আদর্শ গ্রহণ করে ইংরেজকে ভারত ত্যাগে বাধ্য কর।" আবার গ্রেপ্তার—আবার জেল। জেল থেকে যেদিন বেরিয়ে এলেন সেইদিনই প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার—আবার জেল। মুক্তি পেলেন ছ-মাস পরে।

কিন্তু কোথায় মুক্তি? বিলাতী গোল-টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে ব্যাপক ধরপাকড়, শুরু হয়েছে দমননীতি। ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজি বোম্বাই পৌঁছলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা দ্রুত এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ঘোষণা করলেন, সরকার তাঁর নীতি পরিবর্তন না করলে কঠোর সংগ্রাম শুরু হবে। ২রা জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজি, সর্দার প্যাটেল। জওহরলাল আগেই গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। পরবর্তী ২০শে জানুয়ারী—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বিলেত থেকে বোম্বাই পৌঁছবামাত্র তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হল। যতীন্দ্রমোহন অসুস্থ শরীরে বিলাত থেকে ফিরেছিলেন। বন্দীবাস তাঁর পক্ষে কাল হল। ২২শে জুলাই তিনি মারা গেলেন। সরকার সমস্ত রকম আন্দোলন দমনে নৃশংস অত্যাচার শুরু করল। কংগ্রেস কমিটি, কংগ্রেস সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। কংগ্রেস দপ্তরসমূহ অধিকার করে নেওয়া হল। কংগ্রেসের সমস্ত টাকা-কড়ি তহবিল সরকার দখল করে নিলেন। কিন্তু সরকারী আইন অমান্যে এগিয়ে এল যুবকরা। বাংলাদেশের নেতৃত্ব তখন দ্বিতীয় সারির নেতাদের হাতে।

১৯৩২ সালে আবার আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হলেন হেমন্ত-কুমার বসু। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে হেমন্তকুমার বসুকে হিজলী বন্দী নিবাসে রাখা হল। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র জেলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সরকার তাঁকে ইউরোপে যাওয়ার চুক্তিতে মুক্তি দিলেন। ১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইউরোপ যাত্রা করলেন।

ওই বছরের শেষ দিকে হেমন্তকুমার জেল থেকে মুক্ত হলেন। জেল থেকে বেরিয়েই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ভ্রমণ করলেন।

১৯৩৩ সালে বাংলাদেশের কর্মীদের উপর এক গুরু দায়িত্ব এসে পড়ে। ঠিক হয় ১৯৩৩ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। মদনমোহন মালব্য সভাপতি। সরকার অভ্যর্থনা সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করল। কিন্তু তবু নিশ্চেষ্ট করা গেল না সেদিনকার কলকাতার কংগ্রেস কর্মীদের। যাদের মুখপাত্র ছিল উত্তর-কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটি—যার প্রধান নেতাদের মধ্যে ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, অমর বসু, হেমন্ত বসু প্রমুখ। কলকাতায় আসবার পথে নির্বাচিত সভাপতি মালব্যজী, স্বরূপরানী নেহরু, দেবীদাস গান্ধী সহ প্রতিনিধিবর্গকে পথমধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। কলকাতায় সমস্ত পার্ক পুলিশ দখল করে নিল। কারো প্রবেশাধিকার নেই কোন পার্কে। কিন্তু বন্ধ করা গেল না সেই অধিবেশন। চৌরঙ্গী ও ধর্মতলার মোড়ে উন্মুক্ত রাস্তার উপর কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। দ্রুত কয়েকটি প্রস্তাব পাঠ করা হল অধিবেশনে। কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সহধর্মিনী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা।

১৯৩৪ সালে জেল থেকে বেরুতেই বিহারের ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের কারণেও সরকার অনেককে মুক্তি দিয়েছিল। জওহরলাল এই সময় মুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন। তিনিও দ্রুত ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বিহারে চলে যান। কলকাতায় বিহারের দুর্গত মানুষদের জন্য দুটি ত্রাণকমিটি গঠিত হয়। একটি মেয়র সন্তোষকুমার বসুর নেতৃত্বে, অপরটি জনাব এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে। হেমন্তকুমার বসু ছিলেন এই কাজে ফজলুল হকের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। এদিকে সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি সংবাদ পেলেন পিতা জানকীনাথ বসু গুরুতর অসুস্থ। বিমানপথে স্বদেশ

অভিমুখে রওনা হলেন। কিন্তু শেষ দেখা হল না পিতার সঙ্গে। পিতার শেষকৃত্য শেষ করে আবার ফিরে গেলেন ভিয়েনায় ১০ই জানুয়ারী ১৯৩৫ সালে। ইতিমধ্যে জওহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্রকে দেশে ফিরে আসবার জন্য খবর পাঠালেন। কিন্তু সরকার জানিয়ে দিল সুভাষ দেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। সুভাষচন্দ্র সরকারী চোখরাঙানি অগ্রাহ্য করে ভারতে রওনা হলেন। ৮ই এপ্রিল ১৯৩৬ সালে বোম্বাইয়ে জাহাজ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। সুভাষচন্দ্র বিদেশে থাকা কালে ডি-ভ্যালেরা সহ বহু আইরিশ বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সরকারের অভিযোগ হল সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে—সুভাষ এদেশে আইরিশ কায়দায় বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করছেন।

৮ই এপ্রিল সুভাষচন্দ্র যেদিন গ্রেপ্তার হলেন সেইদিনই লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল। কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ই হ'ল বন্দীমুক্তি। কংগ্রেস থেকে ১০ই মে সারা ভারতে সুভাষ দিবস পালনের নির্দেশ দেওয়া হল।

সুভাষ দিবস পালন হবে—কলকাতাতেই তোড়জোড় বেশী। আর এই তোড়জোড়ের মূল কর্মকাণ্ডে আছেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমন্ত বসু, নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, দেবেন্দ্রলাল খাঁ, বসন্তলাল মুরারকা প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ 'সুভাষ দিবস' পালন তথা হাজার হাজার বন্দীর মুক্তি দাবী করে বললেন—"বিনা-বিচারে যারা দণ্ডভোগ করছে অপরিমিতকাল ধরে, তাদের জন্য দেশের যে বেদনা আছে তার চেয়ে অনেক বড় আছে দেশের অসম্মান। বিচারের অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান। তা থেকে আমরা বঞ্চিত।"

'সুভাষ দিবস' উপলক্ষে মনুমেণ্ট ময়দানে সুবিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ড। এই ফাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল বন্দীনিবাস থেকে সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ

করলে তাঁর হাতে একলক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ঐ অর্থে বাংলা কংগ্রেসের জন্য কলকাতার মধ্যস্থলে একটি গৃহ-নির্মাণ করা হবে এবং ঐ গৃহে একটি হল্ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নামে হবে।

১৭ই মার্চ ১৯৩৭ সাল—সুভাষচন্দ্রকে অসুস্থ অবস্থায় জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। ৬ই এপ্রিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুভাষচন্দ্রের সম্বর্ধনা সভা। অসুস্থ শরীরে সুভাষচন্দ্র এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ এই সভা উপলক্ষ করে বাণী পাঠিয়ে বললেন, "সমগ্র জাতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সুভাষকে অভিনন্দিত করছি।"

জেল থেকে মুক্ত হয়েছেন সুভাষচন্দ্র। হাজার হাজার বন্দী তখনো জেলে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন খাজা নাজিমুদ্দিন। ২৪শে জুলাই আন্দামান জেলের বন্দীরা স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসা সহ অনেকগুলি দাবীতে অনশন শুরু করলেন। রাজ্যব্যাপী গড়ে উঠল বন্দীমুক্তি আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র অসুস্থ অবস্থায় ডালহৌসী পাহাড় থেকে খাজা-হক মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারী জানালেন। ২রা আগস্ট আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবীতে সভা অনুষ্ঠিত হল। সভাপতিত্ব করলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। আন্দামান রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য কমিটি গঠিত হল। রবীন্দ্রনাথ হলেন এই কমিটির সভাপতি। সভা থেকে ১৪ই আগস্ট আন্দামান-দিবস পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুকে বন্দীমুক্তি সম্পর্কে তৎপর হবার অনুরোধ জানান রবীন্দ্রনাথ। ২৫শে সেপ্টেম্বর ৭৪ জন বন্দীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন রাজ্য সরকার। এই যে বন্দীমুক্তি আন্দোলন—এই আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন হেমন্ত বসু তাঁদের অন্যতম।

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস/শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস/বিদায় নেবার আগে তাই/ ডাক দিয়ে যাই/দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"—চীনে জাপানীদের ফ্যাসিস্ত-সুলভ আক্রমণের তাণ্ডবলীলায় ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লেখেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চীনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। বন্দীমুক্তি আন্দোলনও তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন জেলে বন্দীরা অনশন করছিলেন এবং অনশনের জন্য চরমপত্র দিচ্ছিলেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বন্দীমুক্তির দাবীতে সুবিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। সভাপতিত্ব করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আর প্রধান বক্তা ছিলেন সি. এফ. এণ্ডরুজ। হেমন্তকুমার বসু এই বন্দীমুক্তি আন্দোলনের প্রধান সংগঠক।

সুভাষচন্দ্র ২৪শে জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন এবং ২৬শে জানুয়ারী শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল জনসভায় বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে জোরদার এবং চূড়ান্ত স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানালেন। ১৯শে জানুয়ারী বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে ঠিক হল যে ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বন্দীমুক্তি দিবস পালন করা হবে। ৮ই ফেব্রুয়ারী টাউন হলের সভায় বক্তৃতা করলেন সুভাষচন্দ্র বসু, হেমন্তকুমার বসু।

হরিপুরা কংগ্রেস এসে গেছে। ১৮ই জানুয়ারী ১৯৩৮ সাল। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী ঘোষণা করলেন কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু। হরিপুরা কংগ্রেস। বাংলাদেশের কংগ্রেস অনুরাগীদের, সেই সঙ্গে সুভাষ-অনুগামীদের মনে তীব্র উন্মাদনা। গান্ধীজির নেতৃত্ব এই

সময় অনেকের কাছেই বেশ কিছুটা শ্লথ ও স্থবির মনে হচ্ছিল। সুভাষচন্দ্রকে নেতারূপে পেয়ে নতুন অনুপ্রেরণা এল। ১৫ই থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী হরিপুরা কংগ্রেস। ১১ই ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র হরিপুরা যাত্রা করলেন। কলকাতা থেকে কংগ্রেস কর্মীরা যত বেশী পারলো রওনা হল হরিপুরার পথে। হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যে শোভাযাত্রা বের হল কংগ্রেসের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। পাঁচ মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা, লক্ষ লক্ষ মানুষ ধ্বনি তুলল 'রাষ্ট্রপতি সুভাষ জিন্দাবাদ'। সভাপতির ভাষণ দিলেন সুভাষচন্দ্র—অভূতপূর্ব ভাষণ। ভাষণে নেই চরকার কথা, নেই গোরক্ষা সমিতির কথা, নেই অসহযোগ আইন অমান্যের কথা। সেখানে আছে সমাজতন্ত্রের কথা—সেখানে আছে শিল্পোন্নয়নে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কথা—আছে ইউরোপ খণ্ডে আসন্ন যুদ্ধের সুযোগ নেবার কথা। হরিপুরা কংগ্রেসেই সুভাষচন্দ্র গঠন করলেন 'পরিকল্পনা কমিশন'—যার সভাপতি করা হল জওহরলাল নেহরুকে। হরিপুরা কংগ্রেসেই বিশ্ব-কমিউনিস্ট-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যথা ব্রেন ব্রাডলে, রজনী পাম দত্ত, হ্যারি পলিট এক যুক্ত বিবৃতি সুভাষচন্দ্রের কাছে পাঠালেন। এই বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হল—"হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশন ভারতের জনসাধারণের মুক্তিপন্থার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিবে—ইহাই আমরা আশা করি।"

হরিপুরা কংগ্রেসের পরেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলেন। কিন্তু নতুন কমিটিতে অচ্যুত পট্টবর্ধন ও আচার্য নরেন্দ্র দেব থাকতে রাজী হলেন না। ফলে সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দকে নিয়েই নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হল। সুভাষচন্দ্র—রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র তখন সারা ভারতবর্ষে নতুন আশার প্রদীপ জ্বেলেছেন। সুভাষচন্দ্রের এই কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন হেমন্তকুমার বসু, সুরেশচন্দ্র

মজুমদার ও অন্যান্যরা। সুভাষচন্দ্রের এই সময়কার তৎপরতার মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল জিন্নার সঙ্গে আপোস আলোচনা করে সাম্প্রদায়িক সমস্যার এক স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা। ৮ই মে সুভাষচন্দ্র বোম্বাই যাত্রা করলেন। প্রথমে গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করে জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। চারদিন ধরে সুভাষ-জিন্না আলোচনা হল। কিন্তু কোন ফল হল না।

চীন জাপান যুদ্ধ আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সুভাষচন্দ্র চীনা কনসাল জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চীনে মেডিক্যাল মিশন প্রেরণের পরিকল্পনা করেন। চীনের মেডিক্যাল মিশনের জন্য ৭ই, ৮ই, ৯ই জুলাই চীন-দিবস পালন করা হয়। কলকাতায় হেমন্তকুমার বসু ছিলেন এই চীনা-দিবস পালন উদ্যোগ কমিটির প্রধান নেতা। হেমন্তকুমার বসুর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকরা হাজার হাজার টাকার চীনা-পতাকা বিক্রয় করলেন।

১৪ই আগস্ট ডাঃ রণেন সেন ও ডাঃ দেবেশ মুখার্জীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে। ডাঃ সেন ও ডাঃ মুখার্জী চীনা মেডিক্যাল মিশনের সদস্যরূপে বোম্বাই হয়ে চীন যাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে ২৫শে জুলাই কংগ্রেস ভবনের জন্য একখণ্ড জমির আবেদন করলেন সুভাষচন্দ্র। ৩রা আগস্ট কর্পোরেশন থেকে মঞ্জুর করা হল সেই জমি। ১৯৩৮ সাল শেষ হতে চলেছে—নতুন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনেরও তোড়জোড় ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। ১৬ই অক্টোবর ন্যাশনাল ফ্রন্ট দাবী তুলল সুভাষচন্দ্রকেই কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি হিসাবে চাই। ইতিমধ্যে কলকাতাতেও সুভাষচন্দ্রকেই পরবর্তী সভাপতি করবার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাজ্য কংগ্রেস দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। ১৮ই আগস্ট কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে বামপন্থী অনেকগুলি সংগঠন মিলিত হয়ে সভা করলেন। দিল্লীতে

ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসল। সে সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল মিউনিক চুক্তি ও তার ভবিষ্যৎ।

অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির' সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন। জওহরলাল তখন ইউরোপে ছিলেন। জওহরলালকে এই প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি করা হল। ১৭ই অক্টোবর সাজ্জাদ জাহির, জেড. এ. আমেদ, মোহন সিং যশ, পি. রামমূর্তি, পি. সুন্দরাইয়া, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ এবং ২২শে অক্টোবর হুমায়ুন কবীর, মোয়াজ্জেম আলি চৌধরী, আবু হোসেন সরকার প্রমুখ বিবৃতি দিয়ে জানালেন সুভাষচন্দ্রই বর্তমানে কংগ্রেস সভাপতি হবার যোগ্যতম ব্যক্তি। কলকাতা থেকে মেঘনাদ সাহা উদ্যোগ নিলেন রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে গান্ধীজি ও জওহরলালকে প্রভাবিত করে যাতে কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি সুভাষচন্দ্রকেই রাখা যায়। মেঘনাদ সাহা রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী অনিল চন্দের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে নির্বাচন করা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল করেন।

সুভাষচন্দ্র এই সময়ে যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ ভ্রমণ করছিলেন। দুদিনের জন্য কলকাতায় এসে ১১ই ডিসেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করতে ওয়ার্ধা যাত্রা করেন। সুভাষচন্দ্র দুদিন কলকাতায় থেকে শরৎচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমন্তকুমার বসুর সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে করনীয় কাজের নির্দেশ দিয়ে যান। ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্থির হয়—১০ থেকে ১৩ই মার্চ ত্রিপুরীতে পরবর্তী কংগ্রেস হবে।

এতদিন গান্ধীজির মনোনীত ব্যক্তিই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হতেন। গান্ধীজির মতকেই সর্বসম্মত মত বলে গ্রহণ করা হত। কিন্তু এবার সেই রেওয়াজের ব্যতিক্রম ঘটার লক্ষণ দেখা

দিল। সুভাষচন্দ্র নীতিগত প্রশ্নে কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলেন। কিন্তু গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীরা চাইলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সভাপতি করতে। ১৫ই জানুয়ারী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল। আসামের গোপীনাথ বরদলুই, ফকরুদ্দীন আমেদ, কলকাতাতে জে সি গুপ্ত সহ দশজন সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করলেন। অপর দিকে গান্ধীজির অনুগামীরা মৌলানা আজাদ ও পট্টভি সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাব করলেন। ঠিক হল ১৯শে জানুয়ারী সমস্ত প্রদেশে ভোট হবে। ১৬ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসু কলকাতায় ফিরলেন। অন্তহীন কর্মব্যস্ততা। ২২শে জানুয়ারী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, রাজাগোপাল আচারিয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বললেন, "আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে মৌলানা আজাদ নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাই আমাদের প্রস্তাব পট্টভি সীতারামাইয়া-ই পরবর্তী সভাপতি হোন।" সুভাষচন্দ্র এক বিবৃতিতে এই জাতীয় বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ইতিমধ্যে ২২শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানালেন তাঁকে। সুভাষচন্দ্র জাতির মুক্তিসাধনায় কবিগুরুর নির্দেশিত পথ অনুসরণের প্রতিজ্ঞা করলেন। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে আরো তুলকালাম শুরু হল। সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি, রায়পন্থীরা (এম. এন. রায়ের দল) সুভাষচন্দ্রের জন্য প্রচার অভিযানে নেমেছেন। বিরুদ্ধপক্ষও নিশ্চেষ্ট নয়। ২৯শে জানুয়ারী ভোট গ্রহণের দিন সুভাষচন্দ্রের জয় নিশ্চিত জেনে হেমন্তকুমার বসু ও অন্যান্যেরা ৩রা ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্রকে ময়দানে প্রকাশ্য সভায় সম্বর্ধনার.কর্মসূচী স্থির করে রেখেছেন। কথা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথই সুভাষচন্দ্রের

অভিনন্দন পত্রটি রচনা করেন। এই অভিনন্দন পত্রে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়ক বলে উল্লেখ করেছিলেন। ২৯শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হল। সুভাষচন্দ্র পেলেন ১৫৭৫ ভোট, পট্টভি সীতারামাইয়া পেলেন ১৩৭৬ ভোট। নির্বাচনে জয়লাভ করে সুভাষচন্দ্র বললেন, "ভারতের স্বাধীনতার শত্রুদের উৎফুল্ল হবার কারণ নেই। আমি সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই—কংগ্রেসে পূর্বেও মতানৈক্য হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা সকলেই একমত।" কিন্তু হায়, সুভাষচন্দ্রের এই প্রত্যাশা তাঁকেই উপহাস করল। কংগ্রেসের তীব্র অন্তর্বিরোধ দলাদলি বিদ্বেষ কলহ নগ্নভাবে প্রকাশিত হল। ৩১শে জানুয়ারী বরদৌলা থেকে গান্ধীজি যে বিবৃতি দিলেন সেই বিবৃতিতে এই বিশ্রী কলহের রূপ আরো প্রকট হয়ে উঠল। গান্ধীজি তাঁর বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্রের উল্লেখ করলেন মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু বলে (এখানে উল্লেখ করা দরকার, জিন্না প্রমুখ নেতারা মহাত্মা গান্ধীকে মিঃ গান্ধী বলাতে কংগ্রেসী মহলে ক্ষোভের অন্ত ছিল না)। গান্ধীজি তাঁর বিবৃতিতে বললেন :

"মিঃ সুভাষ বসু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুস্পষ্টরূপেই জয়লাভ করিয়াছেন। আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, গোড়া হইতেই আমি তাহার পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। ইহার কারণ এ স্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নির্বাচনী প্রচারপত্রে তিনি যে সকল তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি না। আমি মনে করি যে, সহকর্মীদের কথা তিনি যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাহার পক্ষে অযৌক্তিক ও অশোভন হইয়াছে। তথাপি তাঁহার জয়লাভে আমি আনন্দিত। মৌলানা সাহেব তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিবার পর আমার চেষ্টাতেই ডাঃ পট্টভি নির্বাচন হইতে সরিয়া

দাঁড়ান নাই। অতএব এই পরাজয় তাঁহার অপেক্ষা আমারই অধিক। আমি যদি সম্পূর্ণ নীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে না পারি, তবে আমার কোনই মূল্য নাই। অতএব আমার নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, আমি যে নীতি ও কার্যপদ্ধতির পরিপোষক, ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাহা সমর্থন করেন না। এই পরাজয়ে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।"

বিবৃতিতে সারা দেশ বিস্মিত হল। গান্ধীজি অনেক আগেই কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন—অথচ তিনি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। এই বিবৃতিতে আরো দুটি অতি-নগ্ন ইঙ্গিতও তিনি দিলেন। "যখন তাঁহারা সহযোগিতা করিতে অসমর্থ হইবেন তখন তাঁহারা সহযোগিতা হইতে বিরত থাকিবেন। যাঁহারা কংগ্রেসী হইয়াও কংগ্রেসের বাহিরে থাকেন তাঁহারাই কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।"

শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু, শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। মাতৃহারা কন্যার পাশে পিতা জওহরলাল এসেছেন ৩১শে জানুয়ারী। কিন্তু সে কি শুধু কন্যার কাছে পিতার আগমন? না গান্ধী-সুভাষ এই যুদ্ধে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা? গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্বে অশান্ত মনকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে রেখে শান্ত রাখার চেষ্টা? গান্ধীজির বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর তিনদিন কেটে গেল। কিন্তু চুপ করে আছেন জওহরলাল। ২রা ফেব্রুয়ারী গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র—গাড়ী ছুটল জি টি রোড ধরে বর্ধমান। পানাগড় থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে সোজা শান্তিনিকেতন। উপস্থিত হলেন জওহরলালের কাছে। সুভাষ-জওহরলাল বৈঠক—মাঝে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও একপ্রস্থ আলোচনা করলেন। জওহরলাল সুভাষচন্দ্রকে দু-একটি উপদেশ দিয়েছিলেন—সে উপদেশ হল "গান্ধীজির সঙ্গে দেখা কর। আলোচনা কর। দরকার হলে

আত্মসমর্পণ কর।" কিন্তু সুভাষচন্দ্র পারলেন না। গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন, আলোচনা করলেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ? সুভাষচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব।

৭ই মার্চ ১৯৩৯ সাল। ত্রিপুরী কংগ্রেস। ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। গুরুতর অসুস্থ সুভাষচন্দ্র। ডাঃ নীলরতন সরকার বললেন, সুভাষচন্দ্রের পক্ষে যোগদান করা অসম্ভব। সুভাষচন্দ্রের শেষ চেষ্টাও বুঝি বিফল হয়ে যায়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সেবাগ্রামে গান্ধীজির কাছে সহযোগিতা ও পরামর্শ চেয়েছিলেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যরা তাঁর সঙ্গে কাজ করতে রাজী নন। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে রাজাজী, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের মন জয়ের চেষ্টা করবেন। কিন্তু ওয়ার্ধায় আর যেতে পারলেন না। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়ে তারবার্তা পাঠালেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতেই ওয়ার্কিং কমিটির সভা হল। প্যাটেল, রাজাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি ১২ জন সদস্য একযোগে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করে বিবৃতি দিলেন। আর জওহরলাল? জওহরলালও ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। তবে আলাদাভাবে আলাদা বিবৃতি দিয়ে।

"৭ই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেস শুরু হবার কথা। সুভাষচন্দ্র তখনও অসুস্থ। ডাক্তারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অসুস্থ শরীরেই তিনি ত্রিপুরী যাত্রা করেন। ৬ই মার্চ ১০৩ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে তিনি জব্বলপুরে পৌঁছন। এদিকে রাজকোটে দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের সৃষ্টি হলে ৪ঠা মার্চ থেকে গান্ধীজি অনশন শুরু করেন। ৭ই মার্চ বড়লাটের কাছ থেকে রাজকোট সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার আশ্বাস পেয়ে গান্ধীজি অনশন ত্যাগ করেন। ঐ দিনই ত্রিপুরীতে এ আই সি সি-র

বৈঠক শুরু হয়। জ্বর বৃদ্ধি পাওয়ায় সুভাষচন্দ্র এতে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। পরদিন ৮ই মার্চ বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠকে সুভাষচন্দ্রকে অসুস্থ অবস্থায় স্ট্রেচারে করে আনা হয়। ঐদিনই গোবিন্দবল্লভ পন্থ গান্ধীজির নেতৃত্ব ও তাঁর অনুসৃত নীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সুভাষচন্দ্র আলাপ আলোচনার দ্বারা প্রস্তাবটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করার অনুরোধ জানান। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দুদিন আলোচনার পর—১০ই মার্চ বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভায় পণ্ডিত পন্থের ঐ প্রস্তাবটি ২৯৮-১৩৫ ভোটে গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র অবশ্য ঐদিন উপস্থিত হতে পারেন নি। সেইদিনই ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয়। সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র বসু সভাপতির অভিভাষণটি পাঠ করেন।”

(“রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র” : নেপাল মজুমদার, পৃঃ ১৬৩)

পরদিন সমস্ত সংবাদপত্রে খবর পড়ে বাংলাদেশের মানুষ ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে একটি পত্র লেখেন যাতে সুভাষ দুঃখে ভেঙে না পড়েন। পত্রটি এইরূপ :

“কল্যাণীয়েষু

অসুস্থ শরীর নিয়ে কংগ্রেসের দুঃসাধ্য কাজ তোমাকে পীড়িত করেছিল সেজন্য আমরা সকলে উৎকণ্ঠিত ছিলেম। এখনো উৎকণ্ঠার কারণ আছে। আশা করি উপযুক্ত শুশ্রূষায় ও বিশ্রামে তুমি আরোগ্যের পথে চলেছ ; এবং বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে সম্মান দানের যে সংকল্প আমার মনে আছে তা সফল হতে বিলম্ব হবে না। ইতি—

১১।৩।৩৯ তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—”

পরে অবশ্য এই চিঠিটি পাঠাননি তিনি—কারণ এত সংক্ষিপ্ত চিঠিতে মনের কথা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব বলে তাঁর মনে হয়নি।

ত্রিপুরী কংগ্রেস শেষ হল। অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে ফেরার পথে জামাডোবায় অগ্রজ সুধীর বসুর বাড়ী নিয়ে যাওয়া হল। তার ঠিক তিনদিন পরেই ১৫ই মার্চ হিটলারের নাৎসী বাহিনী প্রাগ্ অধিকার করল। মাত্র কয়েকদিন আগেই ১০ই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস তাঁর ভাষণে মহাত্মা গান্ধীকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করে বলেন—"ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে স্টালিনের যে স্থান, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই মার্চ ১৯৩৯)

এরপরই যখন হিটলার প্রাগ্ অধিকার করলেন তখন রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এইজন্য যে হিটলারের এই সাম্রাজ্যবাদী ও সর্বগ্রাসী নীতির নিন্দা না করে ত্রিপুরী অধিবেশনে গান্ধীজিকে তাঁর সঙ্গে তুলনা করে নিজ দেশের অপমানই করা হয়েছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস থেকে পদত্যাগই দক্ষিণপন্থী নেতৃগণ তথা গান্ধীজির কাম্য। এই ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশে দিনের পর দিন সভা সমিতি ও মিছিল, নিন্দা ও বিক্ষোভ প্রকাশ চলতে থাকে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়ে চরম অচল অবস্থা দেখা দিল। সুভাষচন্দ্র অসুস্থ, কিন্তু সেই অসুস্থতা নিয়েও কুৎসার বন্যা বইতে আরম্ভ করল। অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি গান্ধীজিকে পত্র লিখে জানতে চান—পন্থ-প্রস্তাবকে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বলে মনে করেন কি? উত্তেজনা চরমে—চারিদিকে আলোচনা, সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করবেন। সারা বাংলা দেশের মানুষ সুভাষের প্রতি কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের এই ব্যবহারকে চ্যালেঞ্জ

হিসাবে গ্রহণ করল। ২১শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র জামাডোবা থেকে কলকাতা ফিরে এলেন। গান্ধীজি এলেন ২৭শে এপ্রিল। ২৮শে এপ্রিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসবে। এবার কংগ্রেসের জি. ও. সি. হেমন্তকুমার বসু। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র জি. ও. সি.—হেমন্তকুমার বসু ছিলেন অ্যাডজুটেণ্ট। এবার সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি—হেমন্তকুমার জি. ও. সি.। এক কঠিন ও কঠোর দায়িত্বের সম্মুখীন হলেন হেমন্তকুমার বসু। সুভাষচন্দ্রের প্রতি অসহযোগিতামূলক ব্যবহারের প্রতিবাদে অপরিমিত বিক্ষোভ; বাংলাদেশ থেকে যে ৭৯ জন সদস্য সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনের সময় বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কেও বিক্ষোভের অন্ত নেই। এ অবস্থায় কংগ্রেস সদস্যদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে, সম্মানহানিকর কিছু না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২৯শে এপ্রিল—সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন। সুভাষচন্দ্র শেষ চেষ্টা করলেন গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে আপোসের। সুভাষচন্দ্র বললেন অন্তত চারজন সদস্যকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হোক। কিন্তু গান্ধীপন্থীরা তাঁদের দাবীতে অনড়। তাঁদের এক কথা—সবকটি আসন তাঁদের চাই। তাই সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। কংগ্রেস সদস্যরা বুঝি এই পদত্যাগের অপেক্ষাই করছিলেন। এক মুহূর্তে রাজেন্দ্রপ্রসাদ অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হলেন। বাংলাদেশ থেকে দুজনকে নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হল—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। গান্ধীজি কিন্তু ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় যোগ দিলেন না। তিনি সমস্ত সময় সোদপুরে আশ্রমে বসে চরকা কেটে কাটালেন। ত্রিপুরীতে যখন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করেন তখনও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, আজও অনুপস্থিত থাকলেন। অথচ যা কিছু ঘটল সবই গান্ধীজির অভিপ্রায় অভিলাষ অনুসারেই বলা যায়। গান্ধীজি

কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও নন, অথচ গান্ধীজি মানেই কংগ্রেস। সুভাষচন্দ্র ক্ষোভ ও খেদের সঙ্গে বলেছিলেন—"The entire intellect of Congress has been mortgaged to one man."

এই দিনের কথা বলতে গিয়ে সেদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় উপস্থিত অমর বসু বললেন :

"ওয়েলিংটনের সভায় সুভাষচন্দ্র পদত্যাগপত্র দাখিল করে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় হেমন্তকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন কোনরকম বিশৃঙ্খলা যেন না ঘটে।" গাড়ীতে উঠলেন সুভাষচন্দ্র ও অমর বসু। সারাক্ষণ গাড়ীতে চুপ করে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। গড়ের মাঠে গাড়িটা পড়তেই নিজে থেকেই বললেন, "অমরবাবু, এসব চলবে না—নতুন কিছু ভাবুন।"

কিন্তু বাড়ী গিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র, জরুরী-খবর গেল—হাজার হাজার মানুষ ওয়েলিংটন স্কোয়ার ঘিরেছে—নেতাদের তারা বেরুতে দেবে না। ক্রোধে উত্তেজনায় জনতা ক্ষিপ্ত। চপেটাঘাত খেয়েছেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—রেহাই পাননি জওহরলালও। ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র। আদেশ দিলেন হেমন্তকুমারকে—কোন অসম্মান যেন না ঘটে, কোন অসৌজন্য যেন প্রকাশ না পায়, স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্বপালনে কোনপ্রকার ত্রুটি যেন না ঘটে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ীর সিঁড়ির ওপর দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্র আর হেমন্তকুমার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় উত্তেজিত জনতার হাত থেকে নেতাদের এক-একজনকে নিরাপদে গাড়ীতে তুলে দেন। সকলে চলে যাওয়ার পর সুভাষচন্দ্র ও হেমন্তকুমার হাওড়া স্টেশনে গিয়ে নেতাদের নিরাপদে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলেন।

"নতুন একটা কিছু করতে হবে, নতুন কিছু ভাবুন"—ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্র নতুন ভাবনাকে রূপ দিতে শুরু করলেন। দু-একদিনের মধ্যে কলকাতার সমস্ত প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের এক ঘরোয়া বৈঠকে ডেকে বললেন, "কংগ্রেসের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করতে হবে, ফরোয়ার্ড ব্লকই কংগ্রেসকে দক্ষিণমুখী পথ থেকে বামমুখী করবে।"

৩রা মে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক সুবিশাল জনসভায় সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করবেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের সংহত করাই হবে ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্য। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রাম ও গতিশীলতা সঞ্চারের জন্য ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের যে চেষ্টা করছেন তার প্রতি পরোক্ষে তাঁর সাফল্য ও সিদ্ধি কামনা করে উৎসাহ জানান রবীন্দ্রনাথ।

সুভাষচন্দ্র পরিপূর্ণ উদ্যোগ নিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। ভ্রমণ করলেন রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলা। সর্বত্র গড়ে উঠল কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের নূতন মোর্চা। 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত উত্তেরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলো। গান্ধীজি ৪ঠা জুন অনির্দিষ্ট কালের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করলেন। এরপরেই বোম্বাইতে এ. আই. সি. সি-র বৈঠকে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের এই আপোসমুখী প্রচেষ্টা প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন। জুলাই মাসের ৯ তারিখে সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের "মাস অ্যাকশন" বর্জনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ২৬শে জুলাই প্রদেশ কংগ্রেসের এক রিকুইজিশন সভায় নূতন করে কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করা হল। নূতন কমিটিতে ২৮ জন সদস্যকে বাদ দিয়ে দেওয়া হল। ১২ই আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির

বৈঠকে কংগ্রেসের হাইকম্যাণ্ডের অনুমতি না নিয়ে আন্দোলন করায় সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হল, "গুরুতর নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য তিনি কোন নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।" এছাড়া ২৬শে জুলাইয়ের রিকুইজিশন সভাকেও বেআইনী ঘোষণা করা হল।

সুভাষচন্দ্রকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে অ্যাডহক কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হল। সেক্রেটারী হলেন সুভাষচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ। বাংলাদেশে দুটো কংগ্রেস—সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এক কংগ্রেস আর কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের নেতৃত্বে আর এক কংগ্রেস। হাইকম্যাণ্ডের নেতৃত্বের কংগ্রেসে আছেন সুরেন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ, অরুণ গুহ,—সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসে আছেন রাজেন্দ্র দেব, আসরফ-উদ্দিন চৌধুরী, বঙ্কিম মুখার্জী, সুরেশ মজুমদার, হরেন ঘোষ, হেমন্ত বসু। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার সুভাষচন্দ্রকে কিন্তু কোনক্রমেই গতিহীন বা দমিত করতে পারল না।

ওয়ার্কিং কমিটির দণ্ডাদেশ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র এক বিবৃতিতে বললেন ঃ

"ওয়ার্কিং কমিটি আমাকে তিন বৎসরের জন্য কার্যতঃ বহিষ্কৃত করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দক্ষিণপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি করিবার যে প্রক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে যে প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হইয়াছে, ইহা তাহারই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। ওয়ার্কিং কমিটির এই কার্যে কংগ্রেসের বর্তমান সংখ্যাগুরু দলের প্রকৃত পরিচয় এবং তাঁহারা যে ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া

পড়িয়াছে। তবে আমার এই শাস্তিবিধান তাঁহাদের দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হইয়াছে। আমি নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কার পন্থার দিকে যে ঝোঁক ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিয়াছি। কংগ্রেসের বিপ্লবাত্মক মনোভাব বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। বামপন্থীদিগকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং সর্বোপরি আসন্ন সংগ্রামের জন্য পুনঃ পুনঃ দেশকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছি। আমার এই সকল অপরাধের শাস্তি আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। এই দণ্ডাদেশে আমার বহুসংখ্যক দেশবাসীর মনে আঘাত লাগিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার কোন ক্ষোভ নাই। নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণসংগ্রামের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাঁধিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক পরিণতি এবং আমাদের রাজনৈতিক বিবর্তনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে এই শাস্তিবিধান সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত। কাজেই ইহাতে আমার মনে বিন্দুমাত্র তিক্ততা বা ক্ষোভের সঞ্চার হয় নাই। আমার কেবল এই বলিয়া দুঃখ বোধ হইতেছে যে, এই ধরনের কার্যে আমার অপেক্ষা ওয়ার্কিং কমিটিরই ক্ষতি অধিক হইবে, একথাটা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই!

ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যগণ, সমস্ত বামপন্থী এবং জনসাধারণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এই ব্যাপারে উত্তেজিত না হইয়া অবিকল্পিত চিত্তে এবং অধিকতর ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে তাঁহাদের কার্য করিয়া যান। আমার শাস্তি হইল তাহাতে কী আসিয়া যায়? আমি বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠা সহকারে কংগ্রেসকে কংগ্রেস ও দেশের জন্য আঁকড়াইয়া থাকিব এবং জাতির দীন সেবক হিসাবে কাজ করিয়া যাইব। তাই দেশবাসীর নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা লাখে লাখে কংগ্রেসে যোগ দিন এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য হউন। এই উপায়েই আমরা কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদিগকে আমাদের মতে

আনয়ন করিতে সমর্থ হইব, বর্তমানের নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কার-পন্থার দিকে ঝোঁক রোধ করিতে পারিব এবং সমগ্র ভারতের সমবেত শক্তির সাহায্যে পুনরায় স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারিব।

পরিশেষে আমি জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আজ যাহা ঘটিয়াছে তাহা ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। বহু বৎসর পূর্বে তদানীন্তন বামপন্থীরাও এই প্রকারে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া পুনরায় কংগ্রেসে ফিরিয়া আসেন এবং কংগ্রেসকে তাঁহাদের নীতি এবং কার্য-ক্রমই গ্রহণ করিতে হয়। আমি নিঃসন্দেহে মনে করি যে আমরা বামপন্থীরা যে উদ্দেশ্যে চলিতেছি তাহা ন্যায়সঙ্গত এবং ওয়ার্কিং কমিটির এইরূপ কার্যই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিক সহায়ক হইবে। দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ফরোয়ার্ড ব্লকের আহ্বানে যে অত্যাশ্চর্য সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, অবিলম্বে এমন দিন আসিবে যেদিন আমরা কংগ্রেসকে নবজীবন দিতে পারিব এবং উহার বৈপ্লবিক মনো-ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিব এবং কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করিতে সক্ষম হইব।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ আগস্ট ১৯৩৯)

১৯শে আগস্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। শরৎ বসু, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমন্তকুমার বসু সকলে উপস্থিত সেখানে। সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন, ইউরোপে যুদ্ধ আসন্ন, তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে—চাই সংগ্রাম। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সুভাষচন্দ্র সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই ভ্রমণের একটি মাত্র লক্ষ্য—ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন আর আসন্ন যুদ্ধের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ।

এসে গেল ১৯৪০ সাল।

১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ রামগড় কংগ্রেসে ভারতের রাজনীতিতে এক নূতন দিক্‌দর্শন রচিত হয়।

কংগ্রেস কি করবে সেটা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব থেকে আগেই জানা গেছে। তাই সুভাষচন্দ্র এই কংগ্রেসের পাশাপাশি রামগড়ে আহ্বান করলেন আপস বিরোধী সম্মেলন। পাশাপাশি দুটি অধিবেশন হবে, তার প্রস্তুতি চলল সারা দেশে। আসরফউদ্দিন চৌধুরী, গোপীনাথ বরদলুই, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, এইচ. বি. কামাথ, নরীম্যান, এন. জি. রঙ্গ, সোমনাথ লাহিড়ী, শীলভদ্র যাজী, সুরেশ মজুমদার, অমর বসু, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনকে এক অভূতপূর্ব সংগ্রামী মঞ্চে উন্নীত করলেন। কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম আজাদ, অভ্যর্থনা সভার সভাপতি ছিলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সম্মেলনে গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘর্ষে দ্বিধা ও দোমনা ভাব দেখালেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর সম্মেলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানালেন। এর অল্পকাল পরেই জাতীয় সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানানো হয়—যে জাতীয় সপ্তাহ হবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সূচনা। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী এই সংগ্রামী কর্মসূচীর প্রচার করেন। এই সময় ন্যাশানাল ফ্রণ্ট বা কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্রের পিছন থেকে সরে দাঁড়ায়। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও এম. এন. রায় পন্থীরা আগেই সুভাষচন্দ্রের পিছন থেকে সরে গেছেন। জাতীয় সপ্তাহ পালন উপলক্ষ করে কলকাতায় বাংলা কংগ্রেস ও অ্যাড্‌হক্‌ কংগ্রেস অথবা সুভাষপন্থী ও খাদিপন্থীদের মধ্যে কলহ বিবাদ সংঘর্ষ বেঁধে যায়। তীব্র বিবাদ ও বাদানুবাদ, বিতণ্ডা, চেয়ার টেবিল ভাঙা-ভাঙিতে সভা সমিতি পণ্ড হওয়া একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে

দাঁড়ায়। বাংলা দেশের একটি ইংরাজী দৈনিক সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালায়।

সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়েছিল ন্যাশানাল ফ্রন্ট ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিদের তাঁর পিছন থেকে সরে যাওয়া। কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল পি. সি. যোশীর বিবৃতির মাধ্যমে।

পি. সি. যোশীর বিবৃতি ঃ

রামগড়ে আপোস বিরোধী সম্মেলনে 'জাতীয় সপ্তাহ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র সংগ্রামের কর্মসূচী ঘোষণা করার পর কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে পি. সি. যোশী সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেন :—বোম্বাই, ১লা এপ্রিল ১৯৪০

"রামগড়ে আপোস বিরোধী সম্মেলনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবসে বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় আন্দোলনগুলিকে উগ্রতর করা হইবে এবং নিখিল ভারতীয় একটি আন্দোলন করা হইবে। এই আন্দোলন আরম্ভ এবং পরিচালনার জন্য আপোস বিরোধী সম্মেলন একটি নিখিল ভারতীয় সমর পরিষদ গঠনেরও প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পালটা একটি জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহার মারফতে ও তাহার নেতৃত্বে একটি জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা করা হইতেছে। এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে জাতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ করা হইবে। প্রস্তাবিত সমর পরিষদ যে আন্দোলন করিবে তাহা 'জাতীয়' কিংবা 'আন্দোলন' কোনটাই হইবে না। অধিকন্তু ইহার দ্বারা কংগ্রেসকে উদ্দীপিত এবং গণ-আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে ইহা কংগ্রেসের ঐক্যকে শিথিল করিবার অর্থাৎ একমাত্র যে প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে প্রকৃত এবং কার্যকরী জাতীয়

আন্দোলন পরিচালিত করা যাইতে পারে সেই প্রতিষ্ঠানকেই শক্তিহীন করিয়া ফেলিবে। ইহাতে আপোসবিরোধী আন্দোলনের শক্তিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিবে এবং জাতীয় আন্দোলনকে দ্রুততর করিবার পরিবর্তে বরং তাহাকে ব্যাহতই করিবে।

এমতাবস্থায় উল্লিখিত প্রস্তাবানুযায়ী যে সমর পরিষদ গঠিত হইবে তাহার সহিত কমিউনিস্টদিগের কোনই সম্পর্ক থাকিবে না অথবা প্রস্তাবক তথাকথিত যে নিখিল ভারত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিতে চাহেন তাহার সহিত আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকারেই যোগদান করিব না—ইহা নিশ্চিত। কারণ কমিউ-নিস্টগণ পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত বসুর কর্মপন্থা সংহতি ক্ষুণ্ণকারী এবং সেজন্যই তাঁহারা আপোস বিরোধী সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। বর্তমান গান্ধীবাদ কংগ্রেসের ঐক্য ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলনের পথ হইতে অপসারিত করিতেছে বলিয়াই কমিউনিস্টগণ উহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। ঠিক এই কারণেই আমরা শ্রীযুক্ত বসুর কর্মপন্থার বিরোধী, কারণ উক্ত কর্মপন্থানুযায়ী একটি সমর পরিষদ গঠন করিয়া কংগ্রেসের ঐক্য বিনষ্ট করিবার এবং জাতীয় আন্দোলনকে দ্রুততর করিবার পরিবর্তে বরং ব্যাহত করিবারই চেষ্টা করা হইতেছে। বর্তমানে ভারতের যে কোন স্থানে স্থানীয় কিংবা আংশিকভাবে যেসব আন্দোলন চলিতেছে, তাহা হয় কমিউনিস্টদিগের নেতৃত্বে অথবা তাহাদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে পরিচালিত হইতেছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪০)

কিন্তু সুভাষচন্দ্র এক মুহূর্তের জন্য পিছন ফিরে তাকালেন না। কে পিছনে আছে, কে কখন পিছন থেকে সরে গেছে সেদিকে লক্ষ্য নেই সুভাষচন্দ্রের। তবে সুভাষচন্দ্র একক নন, বাংলা দেশের তরুণ ও যুবসম্প্রদায় সুভাষচন্দ্রের পিছনে। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন নিয়ে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হল। সুভাষচন্দ্র মিস্টার সিদ্দিকিকে

মেয়র করলেন। সুভাষচন্দ্র এই সময় থেকেই মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন বাংলা দেশে মুসলমান সম্প্রদায়কে তাঁর সঙ্গে সংগ্রামী মঞ্চে সমবেত রাখতে, যাতে জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করতে না পারে।

সুভাষচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসার জবাব দিয়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় বললেন, "ভারতের সামনে এক মহা সুযোগ এগিয়ে এসেছে। কি কংগ্রেস, কি মুসলীম লিগ, কি হিন্দু মহাসভা যেই হোক না কেন তারা যদি এই সংগ্রামে এগিয়ে আসে, তবে তাদের সঙ্গে গোপন চুক্তি কেন আজীবন তাদের গোলামী করতে রাজী আছি। ইংরেজের গোলামী শেষ করবার জন্য স্বদেশবাসীর গোলামী করতে আমি সব সময় প্রস্তুত।"

সুভাষচন্দ্র। সারা ভারতবর্ষে এই একটি নাম তখন জনমানসে নূতন আশার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেসের সম্পর্কে আর কোন আশা নেই বললেই চলে। সম্মানের সিংহাসন থেকে নেমে এসেছেন জনতার মাঝখানে—ব্রতী হয়েছেন দেশের বামপন্থী শক্তিকে সংহত করবার দৃঢ় সাধনায়। সুভাষচন্দ্রের সেই ঘরে-বাইরে সংগ্রামের দিনে ছায়ার মত সঙ্গী ছিলেন হেমন্তকুমার। যেখানে সুভাষচন্দ্র সেখানেই হেমন্তকুমার। সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি আহ্বান রূপ পেয়েছে হেমন্ত-কুমারের কর্মশক্তিতে। এই সময়ের কিছু পূর্বে জওহরলালকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একখানা চিঠিতে জওহরলাল সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়। সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে বলছেন, "তুমি কখনও কখনও ওয়ার্কিং কমিটিতে আদুরে গোপালের মত ব্যবহার করতে, রেগে উঠতে মাঝে মাঝে। তোমার এই স্নায়ু দুর্বলতায় ও লাফানি ঝাঁপানিতে কি ফল পেলে? আমি জানতে চাই তুমি সমাজবাদী, না বামপন্থী, অথবা মধ্যপন্থা, না দক্ষিণপন্থী, না গান্ধীপন্থী, না আর কিছু?"

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন বসল ঢাকায়। এখানেই গৃহীত হল হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের পরিকল্পনা। বাঙালী জীবনের সবচাইতে বড় কলঙ্ক এই হলওয়েল মনুমেণ্ট। একে নিশ্চিহ্ন করে দাও বাংলার বুক থেকে। ঢাকায় প্রাদেশিক সম্মেলনের পর নাগপুরে বসল ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রথম নিখিল ভারত সম্মেলন। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে বোম্বাইতে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তখনও ফরোয়ার্ড ব্লককে দল হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। নাগপুর সম্মেলনে ফরোয়ার্ড ব্লককে দল হিসাবে ঘোষণা করা হল। নাগপুর থেকেই ফরোয়ার্ড ব্লক গ্রহণ করল আন্দোলনের কর্মসূচী। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, ফরোয়ার্ড ব্লককে যুদ্ধের পরিপূর্ণ সুযোগ নিতে হবে। নাগপুর সম্মেলন থেকেই হেমন্তকুমার বসুকে বাংলাদেশে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। নাগপুর সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল ঐতিহাসিক। নাগপুর সম্মেলনে সেদিন যারা যোগদান করেছিলেন তাদের অবশ্য অনেকেই শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বা ফরোয়ার্ড ব্লকে থাকেননি। সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে ফরোয়ার্ড ব্লকের যৌক্তিকতা গ্রন্থে কেন ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন তার বিস্তৃত বক্তব্য রেখেছিলেন। কাবুল থেকে এই বইখানি তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে দেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে।

নাগপুরের ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা

১৯৩৯ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের উত্তেজনাময় কলিকাতা অধিবেশনের ঠিক পরেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ফরোয়ার্ড ব্লক (অর্থাৎ অগ্রগামী দল) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৩৯ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইতে ফরোয়ার্ড

ব্লকের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং দলীয় নীতি ও কর্মপদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়। তারপর আরও একবছর পেরিয়ে গেছে—বছরটি শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সুতরাং আমরা এক বিশেষ মুহূর্তে এখানে সমবেত হয়েছি। আজ আমাদের সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টার মূল্যায়ন এবং নিজেদের সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপর আজকের দিনে ভারতবর্ষে এবং সমগ্র বিশ্বে যে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে ঐ দুর্যোগ কেবল ঐ দিনই খারাপের দিকে যাচ্ছে না, তা প্রতি মুহূর্তেই গভীরতর সংকটের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যে দুর্যোগ প্রতি মুহূর্তে গভীরতর এবং ব্যাপকতর হচ্ছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

আপনাদের সামনে আমি প্রথম যে প্রশ্নটি রাখছি তা হচ্ছে—আমাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি কি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে? এবং ফরোয়ার্ড ব্লক সৃষ্টির দ্বারা আমরা কি দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাজ করেছি? এ দুটি ক্ষেত্রেই আমার জবাব হচ্ছে—হাঁ নিশ্চয়ই। আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে চারটি বিশেষ প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আমরা ফরোয়ার্ড ব্লক করতে বাধ্য হয়েছি। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসসেবীরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে ভবিষ্যতে তারা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না, তাছাড়া সম্মিলিত কার্যকরী সমিতি গঠনের জন্য আমাদের যে ন্যূনতম দাবী ছিল তাও তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। দ্বিতীয়তঃ মহাত্মা গান্ধী ও দক্ষিণপন্থীরা সাফ্ জবাব দিয়েছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে কোন জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করার কথা ভাবা যায় না। তৃতীয়তঃ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও প্রগতিবাদীদের 'লেফট ব্লক' হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ করার পরিকল্পনা সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। আর এসবের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের একমাত্র করনীয়

ছিল—নিজেদের চেষ্টায় সমস্ত বামপন্থীদের সংহত করা এবং তাই ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন অপরিহার্য ছিল। চতুর্থতঃ দক্ষিণপন্থী বা গান্ধীবাদীরা গান্ধী সেবা সঙ্ঘের ছায়াতলে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। আমাদের পক্ষে আর দেরী করার অর্থ কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের বিলুপ্তিসাধন।

১৯৩৯ সালে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ১৯২০-২১ সালে যাঁরা বামপন্থী হিসেবে কংগ্রেসের ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং দু'দশক ধরে তার নেতৃত্ব করেছেন, তাঁরা আজ বিপ্লব তো দূরের কথা পরিবর্তনও চান না। কাজেই রাজনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে সর্বশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, পরিবর্তনকামী ও প্রগতিবাদীদের কংগ্রেসের মধ্যে সংহত করতে হবে।

১৯৩৯-এর শেষাশেষি আমি যখন কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করার কথা ভীষণভাবে ভাবছি সেসময় কংগ্রেসের জনৈক বিশিষ্ট বামপন্থী নেতার সঙ্গে আমার কিছু কথোপ-কথন হয় (অবশ্য বর্তমানে তিনি পুরোপুরি গান্ধীবাদী)। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যেহেতু একটা আন্তর্জাতিক ঝড় উঠতে আরম্ভ করেছে, সেই হেতু কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল ধরতে পারে এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই উচিত। আমি তার উত্তরে বলি, যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং পাছে দক্ষিণপন্থীরা যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন, সে কারণ বামপন্থীদের পূর্ব থেকেই সুসংহত এবং প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে আমরা নিজ শক্তিতে অন্তত কিছু করতে পারি। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে চিরকালের মতই হোক বা সাময়িকভাবেই হোক বিচ্ছেদ অনিবার্য। আর তা যদি হয় তাহলে বাহির বিশ্বের বিপর্যয় আমাদের গ্রাস করার পূর্বেই আমাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদের একটা বোঝাপড়া হওয়া উচিত। আমি

তাঁকে এও বলি যে, তাঁর পরামর্শ শুনে আমি যদি বর্তমানে নিজেকে মানিয়েও নিই তাহলে আন্তর্জাতিক ঘনঘটার সময়ে আমাদের অবস্থা আরও খারাপই হবে। সেরকম পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আমরা কখনই একমত হতে পারব না। কিন্তু সে সময় নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে যদি আমরা কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরাই তখন অনেকেই হয়ত আমাদের প্রতি দোষারোপ করবে। তদুপরি কংগ্রেসের বাইরে স্বাধীনভাবে যদি আমরা কোন কাজ করতে চাই তাহলে নিজেদের কোন সংগঠন না থাকায় তা করা সম্ভব হবে না। ফলতঃ আমার বন্ধুটির যুক্তি আমার বক্তব্যকে যথার্থই প্রমাণ করল।

বিগত এক বছরের ঘটনাবলী কি আমাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতির যথার্থতা প্রমাণ করছে না। স্বামী সহজানন্দের (অধ্যাপক রঙ্গ, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক প্রভৃতিও আছেন অবশ্য) কিষাণ সভা ও ফরোয়ার্ড ব্লক ব্যতীত আজ আর কোন্ প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা এই দক্ষিণপন্থীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে? ১৯৩৯ সালের জুন মাসে যে বাম সমন্বয় কমিটির উদ্ভব হয়েছিল, ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের পর তা আজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। বামপন্থীরা (র‍্যাডিক্যাল লীগ), কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রী এবং কম্যুনিস্টরা (ন্যাশানাল ফ্রন্টার্স) একে একে বাম সমন্বয় কমিটি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আজ একমাত্র কিষাণ সভা ও ফরোয়ার্ড ব্লকই বামপন্থী আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে কাজ করে চলেছে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড় আপোস বিরোধী সম্মেলনে যখন আমরা মিলিত হয়েছিলাম সে সময়ই উপরোক্ত বাম-পন্থী দলসমূহ সে সম্মেলন বর্জন করে এবং গান্ধীবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

আজ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, গত বারো মাস ধরে গান্ধীবাদীরা যে নীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে, কিষাণ

সভা ও ফরোয়ার্ড ব্লক না থাকলে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই শোনা যেত না।***

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি দু-একটি সমালোচনার জবাব দিতে চাই—যে সমালোচনার বাণ প্রায়ই আমাদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়। যেমন প্রায়ই বলা হয় যে আমরা কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরিয়েছি। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে গান্ধীবাদীরাই বরং ভাঙ্গনের দরজা খুলে দেন। সম্মিলিতভাবে কাজ করার উপর আমরা বরাবরই জোর দিয়েছি আর তারই জন্যে বিভিন্ন দলের লোক নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হোক—এটা আমরা চেয়েছি

আমাদের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ হচ্ছে এই যে আমরা বামপন্থী ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছি। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। রায়পন্থী সমাজতন্ত্রী ও ন্যাশনাল ফ্রন্টার্স বা কম্যুনিস্টরাই একের পর এক বাম সমন্বয় কমিটি ছেড়ে গিয়েছে। একবৃছর আগে আমরা যেখানে ছিলাম আজও ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। আর এ সময়ের মধ্যে আমরা আত্মপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছি। নির্যাতন, নিগ্রহ, পরিহাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—কি আমরা ভোগ করিনি? কিন্তু আপস-হীন সংগ্রামের পথে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছি। আমাদের অসংখ্য সহকর্মী কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনুমোদন বাতিল হয়ে যাওয়ায় আমরা কংগ্রেসের বাইরে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি।***

একথা আমরা শুনেছি যে গান্ধীবাদীদের সাহায্য ব্যতীত আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ সংগ্রাম সফল হবে কি ব্যর্থ হবে তা বলার সময় এখনও আসেনি। জনসাধারণের সহযোগিতা আমরা পাব কি পাব-না তার উপরেই তা নির্ভর করে। কোন্ অহিংস সংগ্রামের পতাকাতলেও

জনসমাবেশ ঘটতে সময় লাগে ; কাজেই আরও কিছু সময় ধৈর্য ধরা দরকার।

আর তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে সংগ্রাম ব্যর্থ হবে, তার অর্থ কি এই যে—সংগ্রাম শুরু করা উচিত হয়নি? তাহলে কি বলব, যেহেতু ১৯২১, '৩০ ও ১৯৩২-এর আন্দোলনে স্বরাজ লাভ হয়নি সেহেতু আন্দোলন করা উচিত হয়নি? ব্যর্থতাই সাফল্যের সোপান। কাজেই চতুর্থ দফায়ও যদি আমরা ব্যর্থ হই তাতে ক্ষতি কি? চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার চাইতে চেষ্টা না করাই বেশী অসম্মানজনক। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আজ আমাদের প্রতি নিবদ্ধ। কোন জাতির জীবনে যে সুযোগ কদাচিৎ আসে সে সুযোগ পেয়েও যদি আমরা তা গ্রহণ না করি তাহলে পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহ আমাদের সম্পর্কে কি ভাববে? কিন্তু লড়াই করে হেরে গেলে তাদের কিছু ভাববার অবকাশ থাকবে না।

এর আরেকটা দিকও রয়েছে যা আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। আজ যদি আমরা মানুষের মত ব্যবহার না করি তাহলে আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববে, সেটাও আমাদের বিবেচনা করা দরকার নয় কি? ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে যে সব নেতৃবৃন্দ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন নি, দেশবাসী আজ তাদের সম্বন্ধে কি বলে? কাজেই আজ আমি দৃঢ়ভাবে এ ঘোষণা করছি যে, আজ যদি আমরা অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করি, অবিলম্বে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে না পড়ি, তাহলে কী ইতিহাস, কী ভবিষ্যৎ বংশধররা—কেউই আমাদের ক্ষমা করবে না!***

****আজ ইয়োরোপে যা ঘটছে ভারতবর্ষে তার প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য। ইউরোপে বৃটেন যে রকম আঘাতের পর আঘাত খাচ্ছে, তাতে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক শক্তির দৃঢ়মুষ্টি ভারত ও অন্যান্য

অধীনস্থ উপনিবেশের উপর শিথিল হতে বাধ্য! আমরা ভারতবর্ষে যাই করি না কেন, ইতিহাসের চাকা তার আপন গতিতে ঘুরে চলেছে। শিশুরও আজ বোঝা উচিত যে আজকের পরিবর্তিত অবস্থাতে এক বছর আগের তুলনায় অনেক কম পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেই আমরা পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করতে পারি। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের যে সুযোগ এনে দিয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে আমাদের নিজেদের মধ্যে দৃঢ়সংবদ্ধ ঐক্য প্রয়োজন। ভারতবর্ষ আজ যদি সমবেত কণ্ঠে বলতে পারতো তবে দাবি প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো না। তার অর্থ—আমরা একদিকে যেমন জাতীয় সংগ্রামকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করব, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায়ও সচেষ্ট হব। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই সংগ্রাম অপরিহার্য। সংগ্রাম না করলে আমাদের শাসকদের নোয়ানো যাবে না। তদুপরি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজ বামপন্থীরা যে চাপ সৃষ্টি করছে, তা না থাকলে আমাদের নেতারাই হয়তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করে ফেলতে পারেন। কাজেই সংগ্রাম এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য আমাদের এখনই সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় ঐক্য গতিশীল সংগ্রামের পরিকল্পনার ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভিতরে যেমন তেমনি সাথে সাথে বাইরেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রভৃতির ন্যায় দলসমূহের মধ্যে ঐক্য সাধন করে আমরা যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে ইয়োরোপে যুদ্ধের যে বিপর্যয়ই ঘটুক বা ভারতবর্ষ যে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হোক—এ আশা আমরা পোষণ করতে পারি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়েই ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। ভারতীয় বিপ্লব রক্তপাত এবং বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতার মধ্য দিয়েই আসবে এটা মনে করার প্রয়োজন নেই। বরং যতটা সম্ভব শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা

হস্তান্তরিত হতে পারে যদি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

আপনাদের সামনে আমাদের নিজস্ব বক্তব্য হচ্ছে, এখুনি দেশব্যাপী সংগ্রামী ধ্বনি তোলা দরকার—"সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে চাই!" এই ধ্বনি মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র জনসমাজকে সম্পৃক্ত করে দেবে।***

আমি আপনাদের কাছে ফরোয়ার্ড ব্লকের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্ম। এ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির প্রয়াসের ফল নয়। যতদিন পর্যন্ত সে ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধিত না হবে ততদিন পর্যন্ত ভিতরের ও বাইরের সব বাধা সত্ত্বেও তার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। এটাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, দেশের সংগ্রামোত্তর পরিস্থিতিতে ফরোয়ার্ড ব্লকের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর একদিকে যেমন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের ভিত্তিতে এক নূতন সুখী ও সমৃদ্ধ ভারত গঠনে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংগ্রামের অবসান ঘটবে—এই মারাত্মক ভুল ধারণা যেন আমরা না করি। যে সংগঠন বা দল স্বাধীনতা আনবে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ভারও তাকেই নিতে হবে। এভাবেই শুধু প্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে।

যুদ্ধের কঠিন বাস্তব দিকটি সম্পর্কে পর্যালোচনার অধিকার আমাদের রয়েছে। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করা দরকার। ফরাসী ও ব্রিটেনের নেতৃবৃন্দ পরিষ্কার ভাষায় খোলাখুলি কথা বলছেন। আমাদেরও তাই বলা উচিত।

এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি—এ প্রশ্নই নিজেদের করা উচিত। মিত্রপক্ষের রাজনীতিতে এবং সমর-

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুধাবন করলে এ প্রশ্ন না জেগে পারে না যে, ব্রিটিশের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে আমরা কি করব ?

ব্রিটিশ পরাজিত হলেও যুদ্ধ চলবে একথা ভাবা বাস্তবের দিক থেকেই অসঙ্গত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইয়োরোপে সীমিত সাহায্যই শুধু পাঠানো সম্ভব, কারণ ওধারে দূর প্রাচ্যে জাপান হাঙ্গামা বাঁধাতে পারে। আর স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যে জার্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়াকে আলাদা করতে পারবে তাও মনে হয় না।

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন যদি জার্মানী ও ইটালীর আক্রমণ থেকে নিজেকে ও সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে না পারে তাহলে আমরা বলব, মিঃ চার্চিল মিথ্যাই এই দুরাশা পোষণ করছেন, সাম্রাজ্যই নিজেকে এবং ব্রিটেনকে বাঁচাবে—এ এক আকাশকুসুম কল্পনা। কাজেই সাম্রাজ্যের বা ভারতবর্ষের সাহায্যে ব্রিটেনকে বাঁচাবার আলোচনা বাদ দেওয়া যাক। এই সঙ্কটমুহূর্তে ভারতবর্ষকে তার নিজের কথা ভাবতে হবে। সে যদি আজ স্বাধীনতা লাভ করে নিজেকে রক্ষা করতে পারে তাহলেই তার দ্বারা মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে। একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকারের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি আজ এই মুহূর্তে ভারতীয় জনগণ কর্তৃক তুলতে হবে। এর বিপক্ষে ব্রিটেনের পক্ষে সাংবিধানিক অসুবিধার কথা বলার অবকাশ নেই, কারণ পার্লামেন্টের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টায় এ কাজ করা যেতে পারে। তারপর ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাইরে অবস্থা স্থিতিশীল হলে এই অস্থায়ী জাতীয় সরকার এক গণপরিষদ আহ্বান করবে যারা ভারতের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান রচনা করবে।

বন্ধুগণ, আজকের দিনে আমার চিন্তাধারা ও প্রস্তাবনার কয়েকটি আপনাদের সামনে রেখেছি। আপনারা সেগুলো বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করবেন বলেই আমি আশা রাখি। সর্বশেষে অদূর-ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ আদায়ের জন্য কর্মপদ্ধতির সুবদ্ধ পরিকল্পনা

হাতে না নিয়ে নাগপুর ত্যাগ না করতে আমি আপনাদের অনুরোধ জানাই।

আবার আমরা বলি—"ভারতীয় জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দাও!—এখানে এবং এখনই!"

* * *

কোন প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বর্তমানের সমস্যাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। পরদেশের চিন্তা, ভাব, প্রতিষ্ঠান বা আদর্শের হুবহু অনুসরণ বা অনুকরণ করার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। পরাধীন দেশের যদি কোন "Ism"কে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা "NATIONALISM."

—সুভাষচন্দ্র বসু

২৯শে জুন অ্যালবার্ট হলে এক বিরাট জনসভায় হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করলেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র বললেন, "৩রা জুলাই সিরাজদ্দৌলা স্মৃতি দিবসের মধ্যে সরকার যদি হলওয়েল মনুমেণ্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে না নেন তা হলে আমরাই এই জাতির কলঙ্ককে অপসারণ করব। ৩রা জুলাই থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে। আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে প্রথম দিনের বাহিনী পরিচালনা করব আমি নিজে।"

২রা জুলাই মঙ্গলবার হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনের মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে সুভাষচন্দ্র বেলা ১১টার সময় রওনা হলেন জোড়াসাঁকোর দিকে। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন সুভাষচন্দ্র। বন্ধ ঘরে দীর্ঘ আলাপন, তারপর সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন এলগিন রোডের বাড়ীতে। হঠাৎ কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিস্টার জানভ্রিন ভারত

রক্ষা বিধির ১২০ ধারা মতে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলেন। সুভাষ-চন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই দিনের এই সাক্ষাৎকারই ছিল শেষ সাক্ষাৎকার। গুরু শিষ্যে আর সাক্ষাৎকার হয় নি। সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। সর্বপ্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হল কর্পোরেশনের মেয়র সিদ্দিকি সাহেবের কণ্ঠ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বললেন, "আমি সুভাষকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে সুভাষই সবচেয়ে জনপ্রিয়।" সুভাষচন্দ্র হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে টানতে চেয়েছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন পরিপূর্ণ ভাবে। তাই ১৩ই জুলাই সবচেয়ে আগে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রগণ। পুলিশের বেপরোয়া আক্রমণ, হিংস্র লাঠি চালনা তাদের দমন করতে পারে নি। অবশেষে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হল। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করা হবে। জয় হল সুভাষচন্দ্রের, জয় হল হিন্দু মুসলমান মিলিত শক্তির, আর এই জয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হল নতুন এক সম্ভাবনার। সেকথা পরে বলছি। কিন্তু এই আন্দোলন সংগঠনের পিছনে সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ যিনি কাজ করেছিলেন তিনি হলেন হেমন্তকুমার বসু। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখল—সেদিন বাংলাদেশের হৃদয় জুড়ে শুধু একটি নাম। নগরীর পথে শোনা যায় রোল 'সুভাষচন্দ্র, 'সুভাষচন্দ্র'।

১৯৪০ সালের কথা। বিদ্রোহী বাংলার প্রাণপুরুষ সবে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেছেন। সেদিন তাঁর বিজয়াভিযানে যাঁরা বিশ্বস্ত সঙ্গী তাঁদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এক ঋজুদেহ দৃঢ়চেতা মানুষ—তাঁর নাম শ্রীহেমন্ত বসু।

সামনে বিরাট আন্দোলন। হলওয়েলের পঙ্কিল স্মৃতিস্মারক উপড়ে ফেলতে হবে মহানগরীর বুক থেকে। ৩রা জুলাই এক বৃহত্তর

আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র, কিন্তু ঠিক তার আগের দিন ভারতরক্ষা আইনে আকস্মিকভাবে গ্রেপ্তার হলেন তিনি। এই তাঁর অষ্টম গ্রেপ্তার।

সেদিন সন্ধ্যায় অ্যালবার্ট হলে হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার কথা ছিল সুভাষচন্দ্রের। সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা দিতে পারলেন না। কিন্তু সভা হল। সভায় একের পর এক বক্তা বক্তৃতা দিয়ে গেলেন সরকারের দমন নীতির প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে। বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বিমল প্রতিভা দেবী, মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিঞা), আর একজন ৪৫ বছরের তরুণ—দৃপ্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। কণ্ঠস্বরে দৃঢ় আত্মচেতনার দার্ঢ্য। তিনি শ্রীহেমন্তকুমার বসু। হেমন্তকুমার সেদিন বলেছিলেন, হলওয়েলের প্রতীক বাংলা তথা বাঙালীর লজ্জা। বিদেশী শক্তির অহঙ্কারে এই কলঙ্কসৌধকে বাঙালী কখনও ক্ষমা করবে না। তাকে চুরমার করে ধুলায় না মিশিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হবে না।

৩রা জুলাই বিকেলে প্রথম সত্যাগ্রহীদল কদম কদম এগিয়ে গেলেন হলওয়েল মনুমেণ্টের দিকে। শত শত কণ্ঠের বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল ডালহৌসি স্কোয়ার। কিন্তু সেদিন সকালেই পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করল শ্রীহেমন্ত বসুকে। তখন বেলা ১১টা। হেমন্তবাবু কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ের একটি দোকানে কাজ সেরে ট্রামে উঠতে যাবেন সেই সময় রাস্তার মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। হেমন্ত বসু তখন বি-পি-সি-সি'র সদস্য—উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রথম সারির নেতা।

এই আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে সেদিনের স্মৃতিচারণ করলেন অমর বসু। অমর বসু বলেন: "২রা তারিখে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হবার আগেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। তিনি

গ্রেপ্তার হবেন এটা আগেই অনুমান করেছিলেন। হেমন্ত, আমি আর পান্না মিত্তির গেলাম এলগিন রোডের বাড়িতে। সুভাষচন্দ্র বললেন আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব তোমাদের তিনজনের উপর। ঠিক হল কাল (৩রা জুলাই) হাওড়ার কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম হাতুড়ি নিয়ে মনুমেণ্টে আঘাত করতে যাবে। রাজেন দেবের বাড়ীতে আমরা একত্র হব সেটাও ঠিক হল। সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। হেমন্ত, পান্না মিত্তিরও গ্রেপ্তার হল পুলিশের হাতে। কাজেই আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম! এর মধ্যে কৃষ্ণকুমারও গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। হাতুড়িটা ছিল কৃষ্ণ-কুমারের কাছে। আগেই ঠিক হয়ে ছিল রাজেন দেবের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমরা কর্পোরেশনের শৈলেন ঘোষের ঘরে মিলিত হব। সেখানে গিয়ে পেলাম নির্মল সিংহকে।

আমি আর নির্মল বেরিয়ে সুরেন ব্যানার্জি রোডে গিয়ে সুরেশ মুখার্জির কাছ থেকে একটা হাতুড়ি যোগাড় করলাম। নির্মল সিংহ আর ৪ জনকে সঙ্গে নিয়ে হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙতে গেল। এর পরে শুরু হল আরও গ্রেপ্তার আরও নির্যাতন! আমিও গ্রেপ্তার হলাম।"

এই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর গ্রন্থে বলছেন—"ফরোয়ার্ড ব্লকের চরম পত্রের ফলে ইংরেজের আসল চেহারাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফরোয়ার্ড ব্লক যাতে সংগ্রাম শুরু করতে না পারে তার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। নির্বাসনে পাঠিয়ে, অন্তরীণ করে এবং অনুরূপ অন্যায় ভাবে ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের নানা ভাবে জব্দ করতে ইংরেজ এতটুকুও দ্বিধা করল না। জুলুমের প্রতিবাদে আত্মসম্মান বজায় রাখতে গিয়ে দলে দলে তারা কারাবরণ করতে লাগল।"

জেলে সুভাষচন্দ্র,—জেলে এসেছেন অমর বসু, হেমন্ত বসু, সকল

সহকর্মী। এই সময়ে জেল-জীবনের কথা বলতে গিয়ে অমর বসু বললেন—"সুভাষচন্দ্র ছিলেন ইউরোপীয় ওয়ার্ডে। আমাদের স্থান হয়েছিল সাতখাতা ওয়ার্ডে। আমি, হেমন্ত, প্রমোদ দাশগুপ্ত, আবদুল রেজাক, হরেন ঘোষ, জ্যোতিষ ঘোষ, পূর্ণ দাস, পান্না মিত্র, আমরা সকলে একসঙ্গে থাকি। সুভাষবাবু জেল কর্তৃপক্ষকে জানালেন হয় আমাকে ওদের কাছে থাকতে দাও, না হয় ওদের আমার কাছে থাকতে দাও। এই সময়ে আমাদের কাছে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আভাস দিলেন একদিন। আলোচনা হচ্ছিল গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর ঝগড়া নিয়ে। আমরা আলোচনা করছি, সুভাষচন্দ্র বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে যেন অন্য জগৎ থেকে ফিরে এসে বললেন—"আমি চলে যাব।"

"আমি চলে যাব।" জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর এলগিন রোডের বাড়ীতে আমাদের অনেককে আলাদা আলাদা করে ডাকলেন। আমি, সুরেশ মজুমদার, হেমন্ত, সবাই দেখা করলাম সেদিন। আমাদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল সেকথা আমরা কেউ কারো কাছে প্রকাশ করি নি।

আমার হাতে একটা চিঠি দিলেন সুভাষবাবু। চিঠিটা নিয়ে দ্রুত চলে গেলাম সুরেশ মজুমদারের কাছে। সুরেশবাবু খেতে বসেছেন—হাতে চিঠি দিলাম। সুরেশবাবু চিঠিটা পড়ে শুধু বললেন, "এত টাকা?" সুরেশবাবু টাকা দিলেন। সেই টাকা নিয়ে সুভাষ-বাবুকে পৌঁছে দিলাম।"

সবাইকে মুক্তি দেওয়া হল জেল থেকে একে একে। একমাত্র ব্যতিক্রম সুভাষচন্দ্র। তাঁর বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ। জেল থেকেই সুভাষচন্দ্র অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র মুক্তি চান—শুধু এ কারাগার থেকে নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতা থেকে। ২৯শে নভেম্বর সুভাষচন্দ্র

ঘোষণা করলেন—“হয় মুক্তি না হয় আমরণ অনশন।” আমরণ অনশন শুরু করলেন সুভাষচন্দ্র। ৫ই ডিসেম্বর সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হল সুভাষচন্দ্রকে। অনশন শুরুর মুহূর্তে চিঠি লিখলেন বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে। ঐতিহাসিক সেই চিঠি।

[ভারত ত্যাগের আগে অমরণ অনশনব্রত করে নেতাজী খাজা নাজিমুদ্দিনকে যে চিঠি দেন এটি তার প্রতিলিপি।]

“আমার জীবনের সর্বোত্তম সংকল্প গ্রহণে কেন আমি বাধ্য হলাম কালির অক্ষরে আমি তার কারণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাই। আপনাদের [সরকার] কাছ থেকে আমার অভিযোগগুলির কোন সুরাহা হবে এই আশা আমার নেই। আমার পক্ষে তাই দুটি অনুরোধ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। দ্বিতীয় অনুরোধ আমি পেশ করব পত্রের শেষাংশে।

আমার প্রথম অনুরোধ,—আমার এই পত্রটি যেন সরকারী দলিলাগারে রক্ষা করা হয়—যারা এই সরকারের উত্তরাধিকারী হবে তাদের হাতে যেন এই পত্রটি পড়ে। আমার দেশবাসীর কাছে এটি আমার বাণী—

তাই এটি আমার রাজনৈতিক অন্তিম ইচ্ছা [পলিটিক্যাল টেস্টামেণ্ট]।

গত দু’মাস থেকে বিবেকের দুয়ারে এসে এই প্রশ্নটি বার বার করাঘাত করেছে যে, বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থায় আমি কি করব। আমি কি বর্তমান পরিবেশের চাপের সামনে আত্মসমর্পণ করব,—ভাগ্যে যা ঘটে তাই বরণ করে নেব?—না, যাকে অন্যায় অসঙ্গত ও নীতি বিগর্হিত বলে মনে করি তার প্রতিবাদ করব? গভীর

আত্মানুসন্ধানের পরে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমার পক্ষে আত্মসমর্পণ অসম্ভব। কোন অন্যায়কে বরণ করার চেয়ে কোন অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা আরও জঘন্য অপরাধ বলে আমি মনে করি। সুতরাং প্রতিবাদ আমাকে করতে হবে।

আজকাল অনেক প্রতিবাদই করা হয় কিন্তু প্রতিবাদের সাধারণ পন্থাগুলি সবই অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে। সংবাদপত্র বা জনসভায় আন্দোলন, সরকারের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ, আইন সভায় দাবি উত্থাপনের বৈধানিক পন্থা কি অর্থহীন প্রতিপন্ন হয় নি? আমার মত একজন কারাবন্দীর হাতে শুধু একটিমাত্র অস্ত্র আছে,—সে অস্ত্র হল অনশন বা উপবাস।

নিরুত্তাপ যুক্তিতে আমি এর সম্ভাব্য সমস্ত দিকই বিবেচনা করে দেখেছি এবং এর ফলে লাভ বা লোকসান কি হতে পারে তার সব কিছুই বিবেচনা করেছি। এ সম্বন্ধে আমার কোন দুরাশা নেই এবং এ সম্বন্ধে আমি পূর্ণ সচেতন যে এ কাজে আপাতত লাভ কিছুই নেই। এমনি সংকটে সরকার ও আমলাতন্ত্র কি করে থাকে সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। টেরেন্স ম্যাকসুইনি ও যতীন দাসের অমর ও অবিস্মরণীয় কাহিনী আজ আমার মানসনেত্রের সামনে ভাসছে। সরকারী প্রথায় এমন কোন হৃদয় নেই—যাকে ভাবাপ্লুত করা যায়—যদিও মিথ্যা মর্যাদাবোধকে আঁকড়িয়ে ধরার মত জেদ এর খুবই আছে।

বর্তমান. পরিবেশে জীবন আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপস-রফা করে নিজের অস্তিত্বকে ক্রমাগত জিইয়ে রাখা আমার সমস্ত অস্থি-মজ্জার বিরোধী। এমনি মূল্য দেওয়ার চেয়ে বরং আমি জীবনকে বিসর্জন দিয়ে দেব। শক্তির বলে সরকার আমাকে জেলে রাখতে বদ্ধপরিকর। উত্তরে আমি বলব, হয় আমাকে মুক্তি দিতে হবে, নইলে জীবনের আমার কোন

প্রয়োজন নেই। মৃত্যু চাই—না জীবন চাই তার পন্থা বরণের মালিক আমি নিজে।

হয়ত প্রত্যক্ষ করার মত কোন আশু লাভ না হতে পারে কিন্তু কোন আত্মত্যাগই বৃথা যায় না। একমাত্র ত্যাগ ও লাঞ্ছনাবরণের পথেই কোন আদর্শ পূর্ণ প্রকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারে এবং প্রতি দেশে জাতির জীবনে এই চিরন্তন নিয়মই প্রবহমান যে একমাত্র শহীদের শোনিতেই আদর্শের বীজ বোনা সম্ভব।

এই মরজগতে সব নষ্ট হয়ে যায়—নষ্ট হয়ে যাবেও—কিন্তু আদর্শ, মনীষা ও স্বপ্নের মৃত্যু নেই। কোন আদর্শের জন্য কেউ হয়ত প্রাণ দিতে পারে-- কিন্তু সেই আদর্শ তার জীবনাহুতির পরে সহস্র আত্মায় পুনর্জন্ম লাভ করে। এই হল রীতি যাতে বিবর্তনের চাকা এগিয়ে চলে—এই যুগের স্বপ্ন ও আদর্শ পরের যুগে পূর্ণ মূর্ত হয়ে ওঠে। ত্যাগ, লাঞ্ছনাবরণ ও দুঃখব্রত ছাড়া এ পৃথিবীতে কোনদিনই কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি।

আদর্শের জন্যই জীবনধারণ এবং মৃত্যুবরণ—এই কল্পনা অপেক্ষা আর পরম তৃপ্তির কি হতে পারে? নীজের করনীয়কে অসম্পূর্ণ রাখেনি এমনি অনুভূতির চেয়ে একজনের কাছে মহত্তর আনন্দের আর কি হতে পারে? পর্বতে, গিরিপথে, স্বদেশের বিস্তীর্ণ সমতলের কোণে কোণে, সমুদ্রোত্তীর্ণ দূরদূরান্তে তার বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে—একজনের আত্মার কাছে এর চেয়ে পরম পুরস্কার আর কি হতে পারে? নিজের আদর্শের বেদীমূলে শান্তিতে আত্ম-বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা জীবনের বৃহত্তম সার্থকতা আর কি হতে পারে?

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ত্যাগ ও লাঞ্ছনাবরণের পথে কেউ কিছু হারায় না। যদি জগতের কিছু সে হারায়ও বা তবুও সে অনেক কিছু লাভ করে—লাভ করে এক অমর জীবনের উত্তরাধিকার।

এই আত্মার ধর্ম। জাতিকে বাঁচাবার জন্য ব্যক্তিকে মরতেই

হবে। আজ আমি মৃত্যুবরণ করব, যাতে জাতি যেন বাঁচতে পারে—অর্জন করতে পারে স্বাধীনতা ও গৌরব।

আমার স্বদেশবাসীকে আমি বলব, একথা ভুলো না যে গোলামীর চেয়ে চরম অভিশাপ আর কিছু নেই। একথা ভুলো না যে অন্যায় ও অবিচারের চেয়ে নগ্ন অপরাধ আর নেই। সেই চিরন্তন নীতির কথা স্মরণ রেখো—যদি তাকে পেতে চাও, তবে তোমাকে দিতে হবে। মনে রেখো অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই জীবনের মহত্তম সার্থকতা।

আমি শেষ করছি। আমার দ্বিতীয় ও শেষ অনুরোধ—আমার জীবনের পরিসমাপ্তির উপর জোর করে হস্তক্ষেপ করো না,—আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। টেরেন্স ম্যাকসুইনি, যতীন দাস, মহাত্মা গান্ধী বা ১৯২৬ সালে আমাদের বেলাও সরকার জোর-জবরদস্তি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। আমি আশা করি সরকার এবারও সে নীতি অনুসরণ করবে।"

সুভাষচন্দ্র অনশন করছেন—আমৃত্যু অনশন। সারা ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠল—সুভাষচন্দ্রের মুক্তি চাই। সুভাষচন্দ্রের মুক্তি দেওয়া হল ৫ তারিখে—একই সঙ্গে মুক্তি পেলেন সত্য বক্সী। বাড়ী ফিরে দোতলার ঘরে আশ্রয় নিলেন সুভাষচন্দ্র। রুদ্ধদ্বার কক্ষে সাধন, ভজন আর বুঝি ধর্মচর্চায় নিমগ্ন রয়েছেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু এ সাধন ভজন কোন ঈশ্বরকে পাবার জন্য নয়, পরলোকের শান্তির জন্যও নয়। যোগাযোগ হয়ে গেল কলকাতা থেকে পেশোয়ার। ঘরের মধ্যে সুভাষচন্দ্র আর ঘরের বাইরে সত্য বক্সী সহ সুভাষ অনুগামী ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্যরা। পাকা হয়ে গেল ব্যবস্থা। পাঞ্জাব থেকে কীর্তিকিষাণ পার্টির তিনজন সদস্য কলকাতায়

এসে মট লেনের পাঞ্জাবী হোটেলের ৪ নম্বর ঘরে থেকে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে গেলেন। কলকাতা থেকে কাবুল যাবার পথ প্রস্তুত। কে কবে কোথায় সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যাবে, টাকা সংগ্রহে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন সত্য বক্সী। নগদ টাকা পাওয়া যাচ্ছে। শুধু নগদ টাকা নয় বেশ কিছু সোনার গহনা সংগ্রহ করে আনলেন উজ্জ্বলা মজুমদার, সুবলা সেন, ঊষা সেন। সংগ্রহ হয়ে গেল টাকা।

অবশেষে এল সেই অবিস্মরণীয় লগ্ন। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী রাত ১টা বেজে ২৫ মিনিট। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরুলেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র নয় এক পাঠান যুবক। নীচে গাড়ী নিয়ে প্রস্তুত শিশির বসু। স্টিয়ারিং ধরলেন শিশির বসু। মৌন রাতের অন্ধকারের বুক চিরে গাড়ী ছুটল। গাড়ী ছুটে চলেছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে। পেরিয়ে গেল হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান। বরাকর ব্রীজ পার হয়ে গাড়ী পড়ল বিহারের সীমানায় ধানবাদের কাছে। তখন সকাল হয়ে আসছে।

১৯৪১ সালের ১৯শে জানুয়ারী থেকে ফরোয়ার্ড ব্লক সভ্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছিলেন। সেবার সুভাষচন্দ্রের ৪৫তম জন্মদিবস। হেমন্তবাবু এক বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। ১৯শে জানুয়ারী ছাত্র ও যুবক দিবস। ২০শে জানুয়ারী শ্রমিক দিবস। ২১শে জানুয়ারী ঐক্য দিবস। ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস। ২৪শে জানুয়ারী কর্মী ও সদস্য সংগ্রহ দিবস। ২৫শে জানুয়ারী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস ও ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস।

সুভাষচন্দ্র তখনও বন্দী। প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় রাজবন্দীদের সমর্থনে অনশন করেছিলেন তিনি। সরকার বাধ্য হয়ে অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে এলগিন রোডে তাঁর বাসভবনে স্থানান্তরিত করেছেন। কিন্তু তাঁর বাড়ীর চারিদিকে সতর্ক প্রহরা। অসুস্থ বন্দীকে কারও সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই সেবার এল ২৩শে জানুয়ারী।

সারা ভারত জুড়ে সুভাষ দিবস উদ্‌যাপন। দিল্লীর উর্দু পার্কে সুভাষচন্দ্রের রোগমুক্তির কামনা করে বক্তৃতা দিচ্ছেন মৌলানা ইমজাদ সাবরী।

কলিকাতায় ৬নং ভবানী দত্ত লেনে ফরোয়ার্ড ব্লক অফিসে সভা ডেকেছেন হেমন্তকুমার বসু। সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেব। মঞ্চের উপর সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি—ভারতআত্মার প্রাণ-পুরুষ, ৪৪ বছরের চির উন্নত শির দেশনায়ক। বক্তৃতা মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন হেমন্তকুমার। বললেন, আজ আমরা দেশ জুড়ে উৎসব করব ভেবেছিলাম। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিষেধ করে পাঠিয়েছেন। নেতা বলেছেন, জাতির এই সংকটময় সময়ে দেশের মুক্তির আন্দোলনকে জয়যুক্ত করবার জন্য সচেষ্ট হলেই দেশকর্মীদের প্রতি সম্মান দেখানো হবে। সুতরাং আমার জন্মদিবস পালন করা থেকে আপনারা নিবৃত্ত হন।

হেমন্তকুমার বলে চলেছেন, বন্ধুগণ, সুভাষচন্দ্র আজ গুরুতর অসুস্থ। কদিন ধরে তাঁকে কারুর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। তিনি যাতে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করেন—আসুন, তার জন্য আমরা প্রার্থনা জানাই।

১৯৪০ সালের ২৬শে জানুয়ারী। কলকাতার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। সারাদিন ধরে চলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবু তার মধ্যে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বন্দেমাতরম্। স্বাধীনতা দিবসের পবিত্র দিনে তেরঙ্গা পতাকা বাড়িতে বাড়িতে উড়ছে। ঠিক সেইদিনই এলগিন রোডের বাড়ি থেকে তাঁর অন্তর্ধান সংবাদ ঘোষণা করা হল। দেশের সীমিত গণ্ডী তাঁকে আর আটকে রাখতে পারল না। বিরাট বিশ্বের বৃহত্তর পটভূমিতে ব্যাপকতর সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্রকে সেদিন নেতাজী হতে হয়েছিল। সে আর এক ইতিহাস।

সুভাষচন্দ্র চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষের অনুগামীরা সেদিন নেতৃত্বহীন বাংলায় জ্বালিয়ে রেখেছিলেন সুভাষচন্দ্রের আদর্শের অনির্বাণ দীপশিখা। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ফরোয়ার্ড ব্লক নিখিল ভারত সুভাষ দিবস উদযাপনের আহ্বান জানায়। ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে হেমন্তকুমার সেদিন বাংলার মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আসুন, সুভাষ দিবসে আমরা তিনদফা কর্মসূচী গ্রহণ করি। ভোরবেলা ঘরে, মসজিদে, গীর্জায়, মন্দিরে সুভাষচন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনার আয়োজন করি। অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য কর্মবিরতি হোক। সন্ধ্যায় জনসভায় তাঁর আদর্শ প্রচারের ব্যবস্থা করি। তিনি বলেছিলেন, সমস্ত ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে না আসা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম থামবে না। আসুন, ভারত যতদিন না স্বাধীন হয় ততদিন তাঁর অসমাপ্ত কাজ করার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করি।

সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান হয়েছিলেন এলগিন রোডের বাড়ী থেকে, কিন্তু কি ভাবে গেলেন, কোন পথে গেলেন—সেকথা প্রায় অজ্ঞাত রয়ে গেল দেশবাসীর কাছে। প্রকাশ পেল অনেক পরে। এই রহস্য রোমহর্ষক অন্তর্ধানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন ভকতরাম তলওয়ার। তলওয়ার তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :

"জেল থেকে নেতাজীর মুক্তিলাভের পর পলায়নের পরিকল্পনা আবার শুরু হল। নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা দরকার, তিনি ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করলেন। বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল মিঞা আকবর শাহ্-এর সঙ্গে দেখা করা। আকবর শাহ্ পরিকল্পনা কার্যকর করতে রাজী হলেও, স্বীকার করলেন কার্যকর করবার মত যোগাযোগ তাঁর নেই। তাই তিনি আমাদের এলাকার দু-তিনজনের সঙ্গে পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন।

সংবাদ আদান প্রদানের জন্য সংকেতবাক্য স্থির করে তিনি সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করলেন। কলকাতা থেকে ফেরার পরদিন আকবর শাহ্ আমার গ্রামে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি নেতাজীর পরিকল্পনা প্রকাশ করে খোলাখুলি বললেন তাঁর দরকারি যোগাযোগ নেই। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ, তাঁর সঙ্গে আমি আমাদের পুরনো পরিকল্পনাটি আলোচনা করলাম। আমি তাই পরামর্শ দিলাম যে পেশোয়ারে গিয়ে দেখা যাক পুরনো পরিকল্পনা অনুযায়ী এখনও কাজ করা সম্ভব কি না। আবাদ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম আমরা। পুরনো পরিকল্পনাটা পরীক্ষা করে দেখা হল, আরো নতুন কতকগুলি বিষয়ও আলোচনা করা হল। দেখলাম পূর্ব নির্ধারিত পথটি এখনও সন্তোষজনকই রয়েছে। পথটা ছিল এই : শাবকাদার হয়ে কানভাব উপত্যকা—তারপর কুত্তাখেল হয়ে লালপুরা। এরপর ঠিক হল আকবর শাহ্ নেতাজীর সঙ্গে দেখা করে পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন। তিনি কলকাতা গেলেন। কর্মসূচী নির্ধারিত হল। আমি, আকবর শাহ্ ও মহম্মদ শাহ্ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম—নেতাজীর সঙ্গে কাবুল পর্যন্ত কে যাবে, কারণ তাঁর পক্ষে স্বভাবতই একলা যাওয়া সম্ভব ছিল না এবং সাধারণ কোন গাইডের হাতেও এ কাজ ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে নির্বাচিত হলাম আমি।

বাজুরি গেটের ভিতর ছুটি বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল। বাড়ী ছুটির মালিক ছিলেন মিঞা ফিরোজ শাহ্।

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪১। বিকেল বেলা ফ্রন্টিয়ার মেলে নেতাজীর পৌঁছনোর কথা। পেশোয়ার সিটি স্টেশনে আকবর শাহ্ সেই ট্রেনেই উঠলেন। আগেই ঠিক করা হয়েছিল নেতাজী নামবেন পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী নেতাজী সেখানেই নামলেন। তিনি নিজেই একটা টাঙ্গা ভাড়া করে তাজমহল

হোটেলের দিকে এগোতে থাকলেন। আরেকটি টাঙ্গায় আকবর শাহ্ তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন, উদ্দেশ্য কেউ তাঁকে অনুসরণ করতে না পারে। নেতাজী হোটেলে ঢুকে গেলেন আর আকবর শাহ্-এর টাঙ্গা হোটেলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবদুল কোয়াইয়ুম খাঁর ছোট ভাই আবদুল মজিদ খাঁকে নেতাজীর কাছে পাঠানো হল একথা বলবার জন্য যে, সবকিছুই নিরাপদ এবং পরদিন সকালে তাঁকে সে জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে। আবদুল মজিদকে অনাবশ্যকভাবে ব্যাপারটার মধ্যে টেনে আনাটা নেতাজী পছন্দ করেন নি কারণ এর ফলে সে পরিকল্পনাটা ভালোভাবেই জেনে গেল। তাঁর এই প্রতিক্রিয়ার কথা তিনি পরে আমাকে বলেছিলেন। যাই হোক, পরদিন সকালে নেতাজীকে হোটেল থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হল।

নেতাজীর পৌঁছানোর পূর্বে পূর্বনির্ধারিত পথে একটা পরিবর্তন আমাদের করতে হয়েছিল। কারণ সেই পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটায় আমরা একটু ভয় পেয়েছিলাম। আমাদের পরিকল্পিত নতুন পথটি ইতিপূর্বে কোন বিপ্লবীই ব্যবহার করেন নি, তাই এই পথটাকেই আমরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করেছিলাম। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, এই পথে গেলে কাবুল নদী পার হবার অসুবিধাটা এড়ানো যাবে। এ পথটার দূরত্ব ছিল অনেক কম, যদিও কিছুটা দুর্গম! তাই নেতাজী আসার পর তাঁকে কয়েকদিনের জন্য পেশোয়ারেই থাকতে হোল—যতদিন পর্যন্ত নতুন ব্যবস্থা না করা হোল। পেশোয়ারে অবস্থানকাল বাড়ানোতে নেতাজীর আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন কলকাতা থেকে তাঁর অন্তর্ধানের সংবাদ প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারে। তৃতীয় দিনে নেতাজীকে নিয়ে যাওয়া হোল দ্বিতীয় বাড়িটায়। নতুন পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য গাইডও খোঁজার জন্য আমাদের সময় দরকার

ছিল। এই নতুন পথটি ছিল মিলিটারি ক্যাম্পের কাছ থেকে খাজুরি ময়দান হয়ে—আফ্রিদি উপজাতি অঞ্চল হয়ে এবং শিনওয়ারি এলাকা দিয়ে আফগান সীমান্তে যাওয়া। গাইড এসে পৌঁছল ২৫শে জানুয়ারী বিকেলে।

আমি নেতাজীর সঙ্গে দেখা করি ২১শে জানুয়ারী বিকেল প্রায় ৪টা নাগাদ—প্রথম বাড়ীতে। তাঁর পরনে ছিল শার্ট এবং ধূসর বর্ণের সাধারণ কাপড়ের সালোয়ার। মাথায় ছিল হাল্কা নীল রঙের পাগড়ি, এবং একটি খাকি কোশহা—এগুলি আমিই পেশোয়ারে তাঁর জন্য কিনেছিলাম। আমার চেহারা দেখে আমার সম্পর্কে নেতাজীর ধারণাটা খুব অনুকূল হয়নি। আমি বেঁটে, রোগা চেহারার লোক। তিনি আমার রাজনৈতিক অতীত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আমি তাঁকে বললাম, তাঁর যে প্রথম পরিকল্পনাটি তিনি কমঃ বিনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং পাঞ্জাব পার্টির নেতৃত্ব যে পরিকল্পনা নিয়ে (জুন, ১৯৪০ পরিকল্পনা) পরিপূর্ণরূপে আলোচনা করেছেন, সেটা চূড়ান্তভাবে স্থির করেছিলাম আমিই ; এবং সে সময়ে আমার পার্টি-নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত হবে। তাঁকে আরো বললাম যে আমি সেই তলওয়ার পরিবারেরই ছেলে যেখানে আমার বড় ভাই হরিকিষেণ জন্মেছিলেন। হরিকিষেণ ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে লাহোরে পাঞ্জাবের ছোটলাট স্যর জিওফ্রে দ মণ্টমোরেন্সিকে গুলী করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৩১ সালে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর ফাঁসী হয় ৯ই জুন, ১৯৩১। আমার কথা শুনে নেতাজী অত্যন্ত প্রীত হন।

১৬শে জানুয়ারী ১৯৪১ ভোর ৬টা নাগাদ—তখনও একটু একটু অন্ধকার রয়েছে—আমরা যাত্রা শুরু করলাম। গাড়িতে ছিলাম আমরা পাঁচজন—নেতাজী, আবাদ খাঁ, গাইড, ড্রাইভার এবং আমি। জামরুড চেকপোস্টে যথারীতি গাড়ী চেক করা হোল। আমরা এগিয়ে

চললাম এবং প্রায় ১১ মাইল দূরে খাজুরি ময়দান মিলিটারি ক্যাম্পে এসে পৌছলাম। যে জায়গায় এসে গাড়ি থেকে নামলাম সেখান থেকে একটা পথ চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। জায়গাটা উপজাতি সীমান্ত থেকে এক ফার্লং দক্ষিণে। গাড়ি থেকে নামার পরেই আমরা তিনজন এগিয়ে চললাম। আবাদ খাঁ আর ড্রাইভার সেখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িটা যেখানে থেমেছিল সেখানেই উপজাতি এলাকা ও ব্রিটিশ এলাকার সীমান্ত। আমরা এ পথটাই বেছে নিয়েছিলাম, যদিও এটা মিলিটারি ক্যাম্পের বেশ কাছ দিয়েই গেছে। —উপজাতি অঞ্চলের প্রায় এক ফার্লং ভিতরে এক মুসলমান পীরের দরগা আছে, সেখানে লোকজন শ্রদ্ধা জানাতে এবং আশীর্বাদ নিতে যায়। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে মনে হয় কেউ বুঝি পীরকে দর্শন করতে গেছে এবং আবার গাড়ীতেই ফিরে যাবে।

ব্রিটিশ সীমান্ত অতিক্রম করতে হলে আমাদের যে মাত্র এক ফার্লং গিয়ে উপজাতি এলাকায় ঢুকতে হবে, নেতাজীকে একথা না বলে মনে হয় ভুল করেছিলাম। সীমান্ত পেরিয়ে মাইল দুয়েক যাবার পর নেতাজী বললেন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। আমরা থেমে আগুন জ্বালালাম এবং তাঁর শয়নের ব্যবস্থা করলাম। তিনি যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন তাঁকে জানালাম যে আমরা ইতিমধ্যেই দেড় মাইল পিছনে ব্রিটিশ সীমান্ত অতিক্রম করে এসেছি। তাঁর উপর এই খবরটির প্রভাব হোল লক্ষণীয়, মনে হল যেন তাঁর শ্রান্তি কেটে গেল অতি তাড়াতাড়ি। এই দেড়মাইল পথ অতিক্রম করতে আমাদের লেগেছিল প্রায় দু-ঘণ্টা, কারণ পথটা ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা দরকার, কলকাতার বাড়ী থেকে নেতাজীর নিখোঁজ হবার সংবাদ তাঁর পরিবার থেকে প্রকাশ করা হয় ২৬শে জানুয়ারী অর্থাৎ যেদিন আমরা ব্রিটিশ সীমান্ত অতিক্রম

করেছি। খবরটা সেদিনই রাত্রে রেডিওতে প্রচারিত হয়। ২৭শে জানুয়ারী কলকাতার কোন এক আদালতে নেতাজীর একটি মামলা ছিল, সেখানে অবশ্য তিনি হাজির থাকতে পারতেন না, তাই একদিন আগে তাঁর বাড়ি থেকে খবরটা প্রকাশ করা হয়।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম এবং একমাইল চলার পর আবার বিশ্রাম নেবার জন্য বসে আমাদের খাবার খেয়ে নিলাম—আলু, ডিম ইত্যাদি। পুনরায় যাত্রা শুরু করে পথে দু-একবার বসে রাত ৮টা নাগাদ গিরিপথের চূড়ায় এসে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার চলা শুরু হোল। আকাশে চাঁদ থাকা সত্ত্বেও পাহাড় আর ঝোপঝাড়ের ছায়ার ফলে পথটা ছিল অন্ধকার। পাহাড়ের ওপারের নীচে এসে রাত্রি ১২টা নাগাদ পৌঁছলাম পিশকান মহনী নামক গ্রামে। গ্রামের মসজিদের কাছে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলাম। কে যেন দরজা খুলে দিল, দেখলাম ভিতরে জনা-পঁচিশেক লোক ঘুমোচ্ছে। ঘরটায় একটা দরজা, কোনো জানালা নেই, ভিতরে আগুন জ্বলছে। তাদের বললাম, আমরা আসছি পেশোয়ার থেকে, কিছু খাদ্য ও চা পেলে ভাল হোত। ওদের মধ্যে একজন দুটো পট নিয়ে এল, আরেকজন নিয়ে এল কয়েকটা ভুট্টার রুটি। এসব খেয়ে নিয়ে সেইখানেই আমরা শুয়ে পড়লাম। একঘণ্টা বাদে নেতাজী আমাকে ডেকে তুলে বাইরে আসতে বললেন। বাইরে এসে তিনি বললেন যে ঘরের ভিতরে অত্যন্ত গুমোট, তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি তাঁকে বললাম, বাইরে থাকাটা আমাদের পক্ষে ভুল হবে, আমাদের যতক্ষণ সম্ভব ভিতরেই থাকতে হবে। কিন্তু তিনি ঘুমোতে পারেন নি। দুবার বাইরে বেরিয়েছিলেন খোলা হাওয়া পাবার জন্য।

পরদিন সকালে আমাদের চা-পরোটা দেওয়া হল। সেখানকার লোকেরা আমাদের জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছি। তাদের বললাম

আমরা রাজমিস্ত্রী, যাচ্ছি পাশের গ্রাম কোহিতে লতিফ খাঁর বাড়ি তৈরী করতে। ২৭শে তারিখ সকাল প্রায় ৯টায় আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম এবং দুপুর ১২টা নাগাদ পরবর্তী গ্রামে এসে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছনোর আগে নেতাজী আমায় বললেন, খচ্চর ভাড়া পাওয়া সম্ভব কিনা দেখতে। তিনি বললেন, দূর পথের সমস্তটা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

তাই, সেখানে এক শিখ আফ্রিদি দোকানদারের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম একটা খচ্চরের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। তার নিজের একটা খচ্চর ছিল ; তার সঙ্গে স্থির হোল আফগান সীমান্তের মধ্যে প্রথম গ্রামটি পর্যন্ত খচ্চরে চেপে যাওয়া যাবে, দিতে হবে ৮ টাকা। খাওয়া দাওয়ার পর সেখান থেকে বেলা ১টা নাগাদ রওনা হলাম। শুকনো ঘাস-ভর্তি দুটি থলি খচ্চরটার পিঠে চাপানো হোল, যাতে নেতাজী অনায়াসেই তার উপর চড়ে যেতে পারেন। রাত প্রায় ৯টায় আমরা গিরিপথের চূড়ায় পৌঁছলাম। পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তের উৎরাই দিয়ে নামার সময় দেখলাম পথ তুষারে ঢেকে রয়েছে। আমি পিছলে পড়লাম, খচ্চর-চালক ও খচ্চরটি আছাড় খেয়ে পড়ল। নেতাজী পড়ে গেলেন। কিন্তু পথটা কোমল তুষারে আবৃত ছিল বলে নেতাজীর কোন আঘাত লাগেনি।

আফগান এলাকার প্রথম গ্রামে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম ২৮শে জানুয়ারী রাত প্রায় দুটায়। এ গ্রামটি ছিল শিনওয়ারী উপজাতি অঞ্চলে। খচ্চর-চালক আমাদের একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়ির লোকজন সবাই তখন নিদ্রামগ্ন। আমরা তাদের ডেকে তুললাম। ঘটনাচক্রে দেখা গেল বাড়ির মালিক আমাদের গাইডেরও পরিচিত। তাঁরা আমাদের অভ্যর্থনা করে খাবার ইত্যাদি দিলেন। খচ্চর-চালক আমাদের বলল পেশোয়ার কাবুল-রোডের পাশে গার্দি নামক গ্রাম পর্যন্ত যাবার জন্য তার খচ্চর ভাড়া করতে। আমরা

রাজী হলাম। ঠিক হল এই পথটুকু যাবার জন্য ১৩ টাকা ভাড়া দেব। সেখান থেকে আমাদের গাইডকে আমরা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম, তার হাতে দিলাম আবাদ খাঁর জন্য একটা চিঠি। গার্দি অভিমুখে রওনা হলাম আমরা। প্রায় ১১ মাইল চলার পর বেলা দশটা নাগাদ গ্রামে পৌঁছলাম। এইভাবে, আমাদের প্রথম লক্ষ্য, অর্থাৎ পেশোয়ার-কাবুল প্রধান সড়কে পৌঁছনোর লক্ষ্য—সাধিত হল।

খচ্চর-চালককে বলেছিলাম আমরা আড্ডা শরিফে তীর্থযাত্রায় যাচ্ছি। তা সত্ত্বেও সে আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য ও চরিত্র সম্পর্কে তখনও সন্দিহান ছিল। তাই সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, যাতে রাত্রেই আমরা পথ চলি। উপজাতীয়রা সব সময়েই পর্যটকদের সম্বন্ধে সন্দেহ করে, যদিও এ সন্দেহ সবসময় রাজনৈতিক নয়।

এরপর থেকে সব জায়গায় বলতে লাগলাম, নেতাজী বোবা ও বধির।

পথ ধরে চলতে থাকলাম। আশা করছি পেশোয়ারের দিক থেকে কোন ট্রাক এলে তাতে জালালাবাদ পর্যন্ত যাওয়া যাবে। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে নেতাজী জায়গাটাকে প্রদক্ষিণ করলেন। মন্তব্য কবলেন, "কী সুন্দর দেশ!" জিজ্ঞাসা করলাম, এই উর্বর তরাইতে সুন্দর কী দেখবার আছে—অবশ্য দেশটা স্বাধীন এই যা। তিনি উত্তর দিলেন যে, দেশটা সুন্দর কারণ তা মুক্ত, স্বাধীন; সব কিছু দেশের জনগণের হাতেই ন্যস্ত।

এই কথোপকথনের আগে আলোচনা হয়েছিল আমরা যদি আফগানিস্থানে গ্রেপ্তার হয়ে পড়ি তাহলে কী হবে। নেতাজীর অভিমত এই ছিল যে, যেহেতু আফগানিস্থানের বর্তমান শাসকরা বৃটিশের সাহায্যে ক্ষমতায় এসেছে—সেইহেতু তারা আমাদের বৃটিশের হাতে তুলে দিতে পারে এ সম্ভাবনা রয়েছে। আমার

বক্তব্য ছিল আফগান গভর্নমেণ্ট একটা স্বাধীন পথ গ্রহণ করবে—যেমন করেছিল বাবা গুরুমুখ সিং, বাবা পৃথ্বী সিং ও অন্যান্যদের সম্পর্কে। আমার মত ছিল নেতাজীর ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাই বেশী, তাঁর উঁচু রাজনৈতিক পদাবস্থান ও ব্যক্তিত্বের জন্য।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আর্জানা গ্রামে পৌঁছে বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বসলাম। পাহাড়ের দিক থেকে এক বলিষ্ঠ পাঠান বেরিয়ে এল, আমাদের পাশে বসল, জিজ্ঞেস করল কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব। আমি উত্তর দিলাম আমরা যাচ্ছি আড্ডা শরিফে। নেতাজী হলেন আমার কাকা—অসুস্থ। সে জানতে চাইল অসুখটা কী? জানালাম—উনি বোবা-কালা। সে আবার জিজ্ঞাসা করল কোথা থেকে আসছি আমরা। বললাম, আমরা লালপুরা থেকে আসছি। সে কথার সত্যতা চ্যালেঞ্জ করে বলে বসল সে। বলল যে, তা হতেই পারে না। কারণ সে নিজেই লালপুরার লোক। তখন স্বীকার করলাম আমরা সীমান্তের ওপার থেকে আসছি। কিন্তু কাকাকে আড্ডা শরিফে নিয়ে গেলে তাঁর অসুখ সেরে যাবে শুনে আমরা সেখানে যাচ্ছি। এবার মনে হল সে সন্তুষ্ট হয়েছে। বলল সেও ওষুধপত্রের কিছু কিছু জানে। সে জিভ দেখতে চাইল। আমাকে বলল নেতাজীকে হাঁ করাতে। আমি তাই করালাম—নেতাজী জিভ বার করলেন। জিভটিকে তিনি শক্ত করে রেখেছিলেন। পাঠানটি তার গায়ের শার্টে হাত মুছে নেতাজীর জিভ ধরে দেখল। স্বীকার করল, জিভটা শক্ত বলেই গোলমাল। সে নিদান দিল, গরম জলে ফিটকিরি মিশিয়ে সেটা নেতাজীকে মুখে পুরে রাখতে হবে। ঐ চিকিৎসা বেশ কিছুদিন চালাতে হবে। আমরা আবার চলা শুরু করার জন্য উঠে পড়তে সেই পাঠানটিও উঠে পড়ল। সেও জানে না আমরা কারা। তবু যদি সাহায্য দরকার হয় তবে তার কাছে তা পেতে পারি। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, আমাদের

কোন অসুবিধা হবে না। এবার আড্ডা শরীফের দিকে যাত্রা শুরু করব এবং ফেরার পথে চেষ্টা করব লালপুরা হয়ে যেতে।

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা বাসোন নামে এক গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে পেশোয়ারের দিক থেকে একটা ট্রাক এল। হাত নাড়লাম তাকে থামাবার জন্য। সে অবশ্য আমাদের জালালাবাদ নিয়ে যেতে রাজী হল না। সে জানালো যে, এর পিছনেই আর একটা ট্রাক আসছে, সেটা আমাদের জালালাবাদ নিয়ে গেলেও যেতে পারে। দ্বিতীয় ট্রাকটা এল—চায়ের পেটিতে বোঝাই। সে আমাদের জালালাবাদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজী হল। আমরা ট্রাকে চড়ে বসলাম। বিকেল তখন প্রায় চারটা (২৮শে জানুয়ারী)। আমরা সাতঘণ্টায় প্রায় পাঁচমাইল হেঁটেছি। পথে ট্রাকটার দু ঘণ্টারও বেশী দেরী হল। কারণ ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ও তাঁর পিয়নেরা এই ট্রাকেই যেতে চাইলেন। অফিসার ট্রাকে চড়ে বসার পর ট্রাকটা আবার চলতে শুরু করলো। জালালাবাদ পৌঁছলাম প্রায় রাত দশটায়। আমরা বসেছিলাম চায়ের পেটিগুলোর ওপর। আর অফিসার সায়েব গাড়ীর সামনে।

জালালাবাদ পৌঁছে একটা হোটেলে গিয়ে আলাদা একটা ঘর আর দুটি চৌকী চাইলাম। একটা ঘর, আলাদা বিছানা, আলাদা আগুনের ব্যবস্থা আমাদের জন্য করা হল। সেইখানে ঘুমোলাম। পরদিন অর্থাৎ ২৯শে জানুয়ারী সকালে প্রাতরাশের পর আড্ডা শরিফ যাত্রা করলাম ওখানে হাজি মহম্মদ আমিনের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে।

পরদিন সকালে অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারী প্রাতরাশের পর কাবুলের পথে সুলতানপুর পর্যন্ত একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম। সেখান থেকে টাঙ্গা নিলাম সুলতানপুর থেকে প্রায় ১৪ মাইল দূরে একটা জায়গা পর্যন্ত। সেখানে বিকেলটা কাটালাম। সে পথে কোন ট্রাক এল না।

তাই পায়ে হেঁটেই যাত্রা শুরু করলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মিমলা নামক এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম। সেখানে একটা হোটেলে গিয়ে বসে রইলাম একটা ট্রাকের অপেক্ষায়। খাবারের অর্ডারও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু খাবার আসতে আসতে সেখানে একটা ট্রাক এসে গেল। তাই খাবার ফেলেই ট্রাকে চড়ে বসলাম। প্রায় রাত ৯টায় ট্রাক এসে পৌঁছল গণ্ডামাক-এ। সবাই সেইখানেই খেয়ে নিল। প্রায় রাত সাড়ে দশটায় কাবুল অভিমুখে যাত্রা করলাম। আমরা ৩১শে জানুয়ারী বাডখাক পৌঁছলাম। তখনও অন্ধকার ছিল, চারদিকে প্রচুর তুষার।

পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী, আমি অফিসের দিকে গেলাম আর নেতাজী ড্রাইভারদের পেছনে পেছনে গেলেন হোটেলের দিকে। আমি সকলের আগেই অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে অন্য সবাইকে জানালাম যে অফিস বন্ধ, সবাই ঘুমোচ্ছে। একথা শুনে যাত্রীরা সবাই চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে হোটেলের দিকে গেল। নেতাজী ড্রাইভারদের সঙ্গে হোটেলে পৌঁছনোর আগেই আমি তাঁর কাছে চলে এলাম। হোটেলে চা-পান করে ঘণ্টাখানেক ঘুমোলাম আমরা। ৩১শে জানুয়ারী সকাল প্রায় ৯টায় কাবুলের উদ্দেশ্যে একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম। কাবুল গিয়ে পৌঁছলাম বেলা প্রায় ১১টায়।

আমরা একটা সরাইখানার সন্ধান করতে লাগলাম। লাহোরি গেটের ভেতরে একটা সরাইয়ের দোতলায় একটা ঘর পেলাম। তখন বেশ শীত। তাই ঘরে তালা লাগিয়ে বাজারে গেলাম কিছু কাপড়-চোপড় কিনতে। দুটো লেপ ও অন্যান্য কয়েকটা দরকারী জিনিস কিনে আমাদের ঘরে ফিরে এলাম। জিনিসপত্র ঘরে রেখে আবার বেরিয়ে পড়লাম শহরটা দেখার জন্য। বিকালে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

১লা ফেব্রুয়ারী রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। শাহী বাজার রোডের উপর তাদের ট্রেড এজেন্সির দপ্তর খুঁজে বার করলাম। এজেন্সি অফিসের বাইরে এক রুশ ভদ্রলোককে দেখা গেল, কাছের এক দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল উনিই এজেন্ট। আমরা বাজারে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি কোন সাড়া দিলেন না। তাই পরদিন আমি তাঁর অফিসেই চলে গেলাম। তাঁকে বললাম আমরা ভারত থেকে এসেছি একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে এবং আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নে যেতে চাই। তিনি দূতাবাসের সেক্রেটারিয়েটে যেতে বললেন। কিন্তু সরাসরি সেখানে যাওয়ার অসুবিধা থাকায় ৩রা ফেব্রুয়ারী দূতাবাসের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম যদি কোন পরিচিত লোক পাওয়া যায়। কিন্তু তাতেও বিফল হলাম। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমরা আকস্মিকভাবে রুশ রাষ্ট্রদূতের গাড়ী দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর কাছে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলাম এবং ৬-৭ গজ দূরে দাঁড়ানো নেতাজীর দিকে দেখিয়ে বললাম যে উনিই ভারতের সুভাষচন্দ্র বসু, উনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে চান। রাষ্ট্রদূত প্রমাণ চাইলেন উনি সত্যিই সুভাষচন্দ্র বসু কিনা। আমি বললাম ওঁকে ভালো করে দেখে নিয়ে ওঁর কোন ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে। রাষ্ট্রদূত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গাড়ী নিয়ে চলে গেলেন। রুশদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হল। আমরা তখন এক অপরিচিত জায়গায়।

রুশদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের থাকার পক্ষে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। শেষ পর্যন্ত জার্মানদের সাহায্য নেওয়া হবে ঠিক হল। কৌশলে সান্ত্রীকে কিছু মিথ্যা বলে নেতাজী লিগেশনের ভিতরে যাবেন আর আমি বাইরে অপেক্ষা করব ঠিক হল। আমরা একথাও ভেবে রাখলাম যে, যদি জার্মান লিগেশনে প্রবেশ

করতে পারেন, তাহলে জার্মানরা হয়তো তাঁকে দূতাবাসেই থাকতে বলবে—যতদিন না তাঁর পরবর্তী যাত্রার ব্যবস্থা হয়।

নেতাজী যদি আমার মারফৎ কোন বার্তা ভারতে পাঠাতে চান, তাহলে তা তাঁর লিগেশনের ভিতরে যাবার আগেই রেখে যাওয়া দরকার—এজন্য তিনি দুটি চিঠি লিখে রাখেন। পরে অবশ্য এ দুটি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

৬ই ফেব্রুয়ারী নেতাজী জার্মান লিগেশনে গেলেন। ভিতরে কী হল আমি দেখিনি। বাইরে লিগেশনের সীমানার কাছে বসে থাকা একটা সাদা পোশাকের লোক আমার দিকে হেঁটে আসছে দেখে আমি উঠে দৌড় দিলাম। এরপর নানা কৌশলে বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে, একবার দৌড়তে দৌড়তে কোটটাকে উল্টে পরে (কারণ কোটটার ভিতরের রঙ আলাদা ছিল) ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে বেড়িয়ে সরাইতে ফিরে এসে দেখি নেতাজী বাইরে বসে আছেন। কারণ তাঁর কাছে চাবি ছিল না। আমার কাহিনী তাঁকে শুনিয়ে তাঁর খবর জানতে চাইলাম। নেতাজী জানালেন যে, তিনি জার্মান মিনিস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলতে তাঁরা সম্মতি প্রকাশ করে বলেন তাঁকে তাদের কাছে আফগান কর্মচারীদের সাক্ষাতে রেখে দেওয়া মুশকিল হবে, সেইজন্য তাঁরা অবিলম্বে বার্লিনে সংবাদ পাঠিয়ে নির্দেশ চাইলেন। আর বাইরে যোগাযোগের জন্য হের টমাস নামে একজনের নাম করলেন, যিনি কাবুলে সীমেন্স-এর প্রতিনিধি ছিলেন।

কথামতো তিনদিন পরে আমরা হের টমাসের অফিসে গিয়ে সংবাদ পেলাম যে, বার্লিন তাঁর সফল পলায়নে অত্যন্ত আনন্দিত এবং তাঁর যে সাহায্য দরকার সেই সাহায্য দিতে জার্মান লিগেশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বার্লিন তাঁর আফগানিস্থান থেকে নিরাপদ যাত্রার জন্য চেষ্টা করছে। আপাতত আমাদের নিরাপত্তার জন্য তাঁরা কী করতে পারেন জানতে চাইলে হের টমাস

জানালেন যে সেরকম কোন প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে পারেন না। তবে তিনদিনের মধ্যে অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারী আমাদের বার্লিনের উত্তর জানাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ইতিমধ্যে ৯ই ফেব্রুয়ারী আবার গোয়েন্দাটা এসে জ্বালাতন করায় তাকে বললাম হাসপাতালে সীট না পাওয়ায় আমাদের দেরি হচ্ছে। তথাপি সে নাছোড়বান্দা হওয়ায় তাকে কিছু অর্থ দিয়ে বিদায় করলাম। ১১ই ফেব্রুয়ারী তৃতীয়বার সে এল এবং এবার টাকা-কড়িতেও তাকে বশ করা গেল না। তার লক্ষ্য আমার হাতে পরা নেতাজীর ঘড়ির প্রতি। আমি জানতাম এই মূল্যবান সোনার ঘড়িটি নেতাজীর বাবার দেওয়া বলে তার প্রতি তাঁর একটা হৃদয়াবেগ ছিল। সেই জন্য আমি কিছুতেই রাজী হচ্ছিলাম না ঘড়িটা দিতে। কিন্তু নেতাজী অবস্থাটা বুঝে ইঙ্গিত করলেন লোকটাকে ঘড়িটা দিয়ে দিতে। ঘড়ি নিয়ে যাবার সময় গোয়েন্দাটা বলে গেল এখন সে আমাদের বন্ধু এবং নেতাজীর চিকিৎসা সংক্রান্ত সবরকম সাহায্য দিতে চাইল।

পরদিন ১২ই ফেব্রুয়ারী হের টমাসের সঙ্গে দেখা করার কথা। যদি তাতে কিছু না হয় তবে আমাদের তিনটি পথের একটি অনুসরণ করতে হবে। (১) সাহায্যের জন্য উত্তমচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। এই প্রথম আমি নেতাজীর কাছে উত্তমচাঁদের কথা বললাম। (২) অন্য কোন পাড়ায় আর একটা সরাইয়ে চলে যাওয়া, এবং (৩) এ পর্যন্ত যা করেছি, নিজেরা নিজেরাই আরো এগোবার চেষ্টা করা।

পরদিন টমাসের কাছে গিয়ে শুনলাম মিনিস্টার তাঁকে বলেছেন আমাদের সম্পর্কে সযত্ন হতে হবে, এর বেশী কোন নির্দেশ বার্লিন থেকে তিনি পাননি। তিনি জানতে চাইলেন কী সাহায্য আমাদের দরকার। আমি জানালাম যে আফগানিস্থানের বাইরে যাওয়া সর্বাগ্রে

দরকার। তিনি এসম্বন্ধে মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আমাদের আবার তিনদিন পরে দেখা করতে বললেন। টমাসের কাছ থেকে ফিরে এসে আমরা খুঁজেপেতে বাজারের মধ্যে একটা ঘর ভাড়া নিলাম। এরপর উত্তমচাঁদের খোঁজ করে শুনলাম তিনি এক দোকান করেছেন এবং সেখানে গিয়ে তাঁকে পেলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করে পুরো ব্যাপারটা তাঁকে বলে বললাম যে, আমার সঙ্গে যিনি আছেন তিনি আর কেউ নন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। তারপর তিনি পরামর্শ দিলেন কয়েকজন কাবুলে বসবাসকারী প্রবীণ বিপ্লবীর সাহায্য আমরা পেতে পারি। উত্তমচাঁদ তাঁর বাড়ীতে আমাদের থাকার কথা বললেন; কারণ তাঁর বাড়ী নিরাপদ এলাকায়। আমি সরাইতে ফিরে গিয়ে নেতাজীর কাছে এই ব্যবস্থার কথা বললাম। শুনে তিনি খুব খুশী হলেন। অবশেষে ১৩ই ফেব্রুয়ারী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে—যাতে কেউ কোন সন্দেহ করতে না পারে সেজন্য—উত্তমচাঁদের বাড়ী গেলাম।

১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হের টমাসের কাছ থেকে শেষবারের হতাশাজনক বার্তা পাবার পর, নিজে থেকে চলার প্রশ্নটা আবার উঠল। ২০শে ফেব্রুয়ারী টমাস মারফত নেতাজী জার্মান মিনিস্টারকে একটা চিঠি লিখলেন। এতে তিনি নিজে থেকেই যাত্রা করার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন এবং তাঁরা যে কোন ধরনের সাহায্য দিতে পারেন তাই চাইলেন। তিনি চাইলেন আমাদের যাত্রাপথের জন্য প্রয়োজনীয় আরো কিছু টাকা। ২৩শে ফেব্রুয়ারী চূড়ান্তভাবে স্থির করলাম যে রুশ সীমান্ত অভিমুখে, খানাবাদ যাবার জন্য ২৪ তারিখের বাসের টিকিট সেদিনই অগ্রিম কিনে রাখব।

এরপর নির্দিষ্ট সময়ে জার্মান মিনিস্টারের কাছ থেকে নেতাজীর চিঠির জবাব নেবার জন্য টমাসের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে

আমাকে বলল এ ব্যাপারে ইতালির মিনিস্টার আমাদের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবেন। অগত্যা ইতালির লিগেশন অফিসে পৌঁছে মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করায় তিনি প্রথমে আমার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। আমি হের টমাসের নাম করাতে তিনি ফোন করে টমাসের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা জেনে নিলেন।

জার্মান মিনিস্টারের কাছে লিখিত যে চিঠিতে নেতাজী অবস্থা ব্যাখ্যা করে আমাদের কী সাহায্য দরকার লিখেছিলেন সেই চিঠিটির কথা আমি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। এই আলোচনা দীর্ঘকাল ধরে চলল। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন নেতাজী ও তাঁর সঙ্গে একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে। তাঁকে জানালাম যে, আমি যে তাঁর কাছে এসেছি একথা নেতাজী জানেন না এবং পরদিন যাত্রার জন্য আমাদের বাসের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, অতএব নেতাজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না।

এই মিনিস্টার ভদ্রলোকের নাম মিঃ পিয়েত্রো কোয়ারোনি। ইনি আমাকে মিঃ মাৎজোণ্ডা নামে লিগেশনের আরেক ইতালীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রস্তাবিত সাক্ষাতের ব্যাপারে ব্যবস্থা হল—সেদিনই (২০শে ফেব্রুয়ারী) ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে আমরা লিগেশনে আসব।

বাড়ী ফিরে নেতাজীকে আমার ইতালীয় লিগেশনে যাওয়ার কথা জানালে প্রথমে নেতাজী বিরক্ত হলেন—পরে চিন্তা করে দেখা করতে যেতে সম্মত হলেন। বিকেল বেলা উত্তমচাঁদের স্যুট পরে নেতাজী আমার সঙ্গে রওনা হলেন। ইতালীয় মিনিস্টার ভদ্রলোক আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নেতাজীর সফল পলায়নের জন্য অভিনন্দন জানালেন। সে রাতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনার জন্য নেতাজীকে লিগেশন অফিসেই থাকতে হল। আমি ফিরে এলাম উত্তমচাঁদের বাড়ী। অগত্যা বাসের টিকিটগুলো

আমাদের ফেরৎ দিতে হল সেদিন, কারণ পরদিন রওনা হওয়া সম্ভব ছিল না।

এরপরে জার্মানদের সঙ্গে এবং টমাসের সঙ্গে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ বস্তুত শেষ হল। ইতালীয়দের সঙ্গে সংযোগ ভালোভাবেই স্থাপিত হল। ২০শে ফেব্রুয়ারী ইতালীয়দের সম্পর্কে নেতাজীর ধারণা এবং তারা তাঁকে কী সাহায্য দিতে চেয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ হল। ইতালীয়রা নেতাজীর কাছে তিনটি বিকল্প পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিল। পরিকল্পনাগুলি হল: (১) রুশীয়দের কাছ থেকে ট্রানজিট ভিসা নিয়ে তার সাহায্যে ভ্রমণ, (২) ক্যুরিয়ার পরিকল্পনা, এবং (৩) ইরান ও সিরিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা। তারা বলেছে তারা তিনটি পরিকল্পনা নিয়েই কাজ করছে এবং অতি শীঘ্রই সফল হবে বলে নেতাজীকে আশ্বাস দিয়েছে। ইতালীয় লিগেশনে সেই রাত্রির পর নিজেরাই এগিয়ে চলার পরিকল্পনাটি কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছিল।

নেতাজীর কাবুল ত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ আগে ইতালীয় মিনিস্টার আলবার্তো পিয়েত্রো কোয়ারোনির স্ত্রী শ্রীমতী কোয়ারোনি উত্তমের দোকানে এলেন এক বার্তা নিয়ে। এটা ছিল (১) নেতাজীর পাসপোর্ট ফটোগ্রাফের ব্যবস্থা করার জন্য, এবং (১) নেতাজীর জামা-কাপড় তৈরী রাখার জন্য। ফটোগ্রাফের জন্য পরদিন বেলা ৪টা নাগাদ দারুল আমন রোডে ওদের গাড়ীর কাছে গিয়ে দেখা করতে হবে। পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী যথাস্থলে গিয়ে হাজির হলাম। দারুল আমনে গিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গীতে নেতাজীর তিনটি ফটো তোলা হল। জামা-কাপড়ের ব্যাপারে, হাজীর বাড়ীতে নিয়ে আসা প্রচুর পরিমাণ কাপড়চোপড়ের মধ্য থেকে দু ধরনের কাপড় বাছা হল। হাজী সাহেব একজন ভালো দর্জির ব্যবস্থা করে দিলেন। সে চার-পাঁচদিনের মধ্যে পোশাক তৈরী করে দিল।

আমাদের কাছে আফগানিস্থানের একটা বিস্তারিত পথ-মানচিত্র

ছিল, তাতে সবকটি সীমান্তই ভালোভাবে দেখানো ছিল। যখন নিজেরাই যাত্রা করব ভেবেছিলাম তখন সেটা কাজে লেগেছিল, পরে অবশ্য কাজে লাগেনি ; কারণ আমরা একা যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলাম।

ট্রানজিট ভিসা দেবার জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে অক্ষশক্তির সরকারগুলি যে অনুরোধ করেছিলেন, সে সম্পর্কে কী হয়েছিল আমার সঠিক জানা নেই। তবে ঘটনা হল, নেতাজী আফগানিস্থান ত্যাগ করেছিলেন অরল্যাণ্ডো মাৎজাওয়ার নামে একটা পাসপোর্টের সাহায্যে—পথ ছিল রাশিয়া হয়ে।

উত্তমচাঁদের সঙ্গে থাকার সময় তাঁর স্ত্রী আমাদের সুরক্ষার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা সামলানোতে তিনি চমৎকার কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়েছেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে, আসবাবপত্র সম্পর্কিত আরাম দেওয়ার ব্যাপারে, সব ব্যাপারেই তাঁর বাড়িতে নেতাজীর অবস্থান যাতে যথাসম্ভব আরামপ্রদ হতে পারে সেজন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। আমার মনে হয় তাঁর স্বামীর কর্তব্য পালনে তাঁর সহায়তা ছিল অমূল্য। আর উত্তমচাঁদ নিজেও নেতাজীর জন্য যা করেছেন, তা যে-কোন সাধারণ লোক করতে ইতস্তত করত।

মিঃ কোয়ারোনির সঙ্গে ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবার পর, চুপচাপ বসে চূড়ান্ত বার্তার জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার ছিল না। এই কদিন নেতাজী লিখে চলেছিলেন। তিনি দুটো চিঠি লিখেছিলেন—একটি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুকে, অপরটি ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যকর সভাপতি সর্দার শার্দুল সিং কবিশেরকে। দাদার কাছে বাংলায় আর শার্দুল সিংএর কাছে ইংরাজীতে লিখেছিলেন। এইভাবে অপেক্ষা করতে করতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

অবশেষে ১৫ই মার্চ তারিখ বিকেলে চূড়ান্ত বার্তা এল—১৬ তারিখে উত্তমের দোকানে নেতাজীর স্যুটকেশ তৈরী রাখতে হবে। বেলা ছটোয় একজন লোক সেটা নিতে আসবে। আর ১৭ তারিখ বিকেলে আমাদের যেতে হবে ক্রেশিনির বাড়ীতে। ১৮ মার্চ সেখান থেকে যাত্রার দিন স্থির হয়েছে।

১৬ তারিখে নেতাজী আমার হাতে চারটি দলিল দিলেন। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কখনও কলকাতা গিয়েছি কিনা। আমি কলকাতায় যাইনি শুনে তিনি আমাকে শুধু জানালেন যে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। তাঁর পরিবারের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করাও ঠিক হবে না, কারণ পুলিশ তাঁদের উপর কড়া নজর রাখছে।

১৬ তারিখে নেতাজীর স্যুটকেশ দোকানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৭ তারিখ সকালে, আমাদের সেখানে থাকার শেষ দিনে আমাদের গৃহকর্ত্রী বিশেষ প্রাতরাশ তৈরি করলেন। প্রাতরাশের পর নেতাজী বাচ্চাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টা করলেন। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সে দিনটির কিছুটা আমরা কাটালাম শহরের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখে, এদিক-ওদিক ঘুরে। সন্ধ্যা প্রায় ৭টা নাগাদ আমরা ক্রেশিনির বাড়ী গেলাম। উত্তম আমাদের সঙ্গে এলেন। আমরা সেখানেই নৈশভোজ গ্রহণ করলাম। নৈশভোজের পর উত্তমচাঁদ চলে গেলেন। আমাদের ভবিষ্যৎ কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক আলোচনার ছিল বলে আমি সেখানেই থেকে গেলাম। ক্রেশিনি ও সেখানে উপস্থিত অন্য একজন ইতালীয় ভদ্রলোককে নেতাজী বললেন যে আমিই হব ভারত ও কাবুলের মধ্যে যোগসূত্র। আর নেতাজী ও কাবুলের মধ্যে যোগাযোগের উপায় যোগাবে তারা। তিনি তাঁদের জানালেন যে উপজাতি এলাকায় আমার কিছু কিছু যোগাযোগ আছে এবং আমার কাজকর্ম প্রধানত উপজাতি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

নেতাজী ও আমি সে রাত্রে শয়ন করলাম অতিথি-কক্ষে। পরদিন সকালে অন্ধকার থাকতে থাকতেই তাঁরা চলে গেলেন। ডাঃ ওয়েনগার ও জার্মান লিগেশান থেকে আরেক ভদ্রলোক আগেই এসেছিলেন। গাড়ীতে সবসুদ্ধ পাঁচজন যাত্রী ছিলেন। নেতাজী, ডাঃ ওয়েনগার, অন্য জার্মান ভদ্রলোক, একজন ইতালীয় 'কুরিয়ার' (কূটনীতিক) এবং ড্রাইভার—সেও বিদেশী। তাঁরা চলে যাবার পর আমি উত্তমের বাড়ী গিয়ে তাঁদের চলে যাবার খবর জানালাম। আমি কাবুল ত্যাগ করলাম ১৯শে মার্চ।"

[সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান : ভগৎরাম তলওয়ার]

সুভাষচন্দ্র দেশ থেকে অন্তর্ধান করেছেন। বিশ্বমহাযুদ্ধের সমরানল ইউরোপ খণ্ডের সীমানা ছাড়িয়ে এশিয়াখণ্ডে বিস্তৃত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর তাঁদের অনেককেই আটক করা হয়—অবশ্য ছেড়ে দেওয়াও হয় খুব শীগগির। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন খাতে মোড় নিল। ফরোয়ার্ড ব্লক আহ্বান জানাল "এ যুদ্ধে এক পাই নয়, এক ভাই নয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সঙ্গে কোন সহযোগিতা নয়।"

ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ যখন বলছেন এক পাই নয়, এক ভাই নয় —১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান যখন অকস্মাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ ও দখল করে নিল এবং বৃটিশ যখন জার্মানী ও জাপান এই দুইয়ের সাঁড়াশী আক্রমণের মধ্যে পড়েছে এবং চারিদিকে যখন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সুভাষচন্দ্র ভারত মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য বিদেশ থেকে আহ্বান জানাচ্ছেন—তখন জওহরলাল বললেন, "বাইরে থেকে যে-কোন সৈন্যদলই ভারত আক্রমণ করুক তারা প্রকৃতপক্ষে জাপানীদের হাতের পুতুল। আমি সর্বপ্রথম তাদের

বাধা দেব তলোয়ার হাতে নিয়ে।” গান্ধীজি হরিজন পত্রিকায় লিখলেন—“এক্সিস শক্তির মিত্রজনোচিত কথার ওপর আমি কোন গুরুত্ব দিই না। তারা যদি ভারতে উপস্থিত হতে পারে তবে আসবে লুঠের বখরা নিতে। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের নীতি সমর্থনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।” কম্যুনিস্ট পার্টি ধুয়ো তুলল, “জাপানকে রুখতে হবে—সুভাষচন্দ্র ট্রেটার।”

এসময় কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে ভারতে ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যমকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও ‘যুদ্ধে ইংরেজকে কোন সহযোগিতা নয়’ এই প্রচার অভিযানে অংশ গ্রহণ করে হুগলী জেলার হরিপালে গ্রেপ্তার হলেন হেমন্তকুমার বসু। হরিপালে সভা হচ্ছে। ধরানাথ ভট্টাচার্য সভাপতি। বক্তা জ্যোতিষ ঘোষ, অমর বসু, হেমন্ত বসু। পুলিশ গিয়ে গ্রেপ্তার করল—বিচারে দেড় বৎসর জেল। অবশ্য হাইকোর্ট থেকে এই আদেশ বাতিল হয়ে যায়—হেমন্তকুমার মুক্তি পান।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসল বোম্বাইতে। ৮ই আগস্ট ১৯৪০ সালে “ইংরেজ ভারত ছাড়ো” প্রস্তাব গৃহীত হল। ৯ই আগস্ট শুরু হল গ্রেপ্তার—গ্রেপ্তার শুরু হল সারা ভারতবর্ষে। বাংলা দেশের বাতিল বি. পি. সি. সি.-র তথা ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশেষ কেউই বোম্বাই যেতে পারেন নি। তবে সেদিনের তরুণ ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য বোম্বাইতে ছিলেন। বোম্বাইতে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশ তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ল। ১০ই আগস্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। ১১ই আগস্ট গ্রেপ্তার হলেন বাংলাদেশের কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ। সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কলকাতার ছাত্রসমাজ বেরিয়ে পড়ল রাজপথে—“করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।”

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করল। মিছিল বেরিয়েছিল সনৎ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উত্তর কলকাতায়। দক্ষিণ কলকাতাতেও মিছিল বেরিয়েছিল। প্রথম গুলী চলল উত্তর কলকাতার শ্রীমানী মার্কেটের সামনে। নিহত হলেন বৈদ্যনাথ সেন। আগুন জ্বলে উঠল সারা কলকাতায়, সারা বাংলাদেশে। কলকাতায় এক সপ্তাহে কুড়িজন নিহত হল, আহত হল দেড়শো জন—গ্রেপ্তার করা হল তিন হাজার পাঁচশো জনকে। আন্দোলন চলছে—বাংলা-দেশের জেলায়-জেলায়, ঘরে-ঘরে। ঢাকায় নিহত হল সাতজন। শুধু বাংলাদেশে নয়—সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন শুরু হল। আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, আর. এস. পি.। আগস্ট আন্দোলনে প্রথম ভাগলপুর জেলে ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিল তরুণ-বিপ্লবী মহেন্দ্র চৌধুরী। বিক্ষোভের আগুনে সারা ভারতবর্ষ যখন জ্বলছে তখন কম্যুনিস্ট পার্টি বলল, "যারা আন্দোলন করছে তারা দেশদ্রোহী। The Groups which make up the Fifth Column are the Forward Bloc, the party of the traitor Bose, the C.S.P. & the Trotskyte group···The Communist Party declare that all these three must be treated by every honest Indian as the worst enemy of the nation and driven out of political life and exterminated."

(Communist Party : Facts and Fiction)

আগস্ট আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় রচনা করল মেদিনীপুর। এখানে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ সামন্ত ও সুশীল ধাড়া। আন্দোলন ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। লাঠি, গুলি, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, বলাৎকার—কোন অত্যাচারের পথই পরিত্যক্ত হয়নি শাসকশক্তির

দ্বারা। মেদিনীপুরে পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে নভেম্বর মাসে তৎকালীন বাংলার অর্থসচিব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলেন। '৪২-এ আগস্ট-আন্দোলন—'৪৩-এ বাংলাদেশের ভয়াবহ মন্বন্তর—'৪৪ ও '৪৫ সালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান এবং ভারত সীমান্তে ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন—ঘটনাগুলি যখন ঘটে গেল তখন বাংলাদেশ ছিল সম্পূর্ণ নেতৃত্বহীন। নেতারা সকলেই ছিলেন জেলে। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৫-এ জাপান আত্মসমর্পণ করল এবং তারপরই ধীরে ধীরে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হতে থাকল। বাংলাদেশে প্রথম মুক্তি পেলেন শরৎচন্দ্র বসু—১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সাল।

শরৎচন্দ্র বসু জেল থেকে বেরুলে হাওড়া ময়দানে প্রথম সম্বর্ধনা জানান হল। সে এক বিশাল সমাবেশ। এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যবাহিনীও দেশে ফিরতে আরম্ভ করেছে। শরৎচন্দ্র বসু জেল থেকে বেরুবার পর একে একে অন্যান্য নেতারাও মুক্তি পেলেন। মুক্ত নেতৃবৃন্দ শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ঠিক করলেন আর বাতিল বি. পি. সি. সি.-কে বাঁচিয়ে রাখবার দরকার নেই, আসুন সকলে মিলে কংগ্রেসের সঙ্গে, একই সঙ্গে কাজ করি। সত্য বক্সী, পূর্ণ দাস, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন দাশগুপ্ত, হরেন ঘোষ, অনিল রায়, দেবেন দে, আশরাফউদ্দিন চৌধুরী সকলে মিলে ঠিক করলেন কংগ্রেসের সঙ্গে একই সঙ্গে কাজ করবেন। এসে গেল আজাদ হিন্দ ফৌজের নায়কদের মুক্তিদান আন্দোলন। ফরোয়ার্ড ব্লক এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করল। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে ধর্মতলা স্ট্রীটে পুলিশের গুলিতে নিহত হল রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবদুল সালাম।

ফরোয়ার্ড ব্লকের সারা ভারতে তখন বিরাট প্রভাব। এই সময়ে

সর্দার প্যাটেল ও জওহরলাল নেহরু কলকাতায় এলেন। দেশপ্রিয় পার্কে এক সম্বর্ধনা সভায় শরৎচন্দ্র বসু সর্দার প্যাটেলকে বললেন— তিনি শুধু ভারতের লৌহমানব নন তিনি এশিয়ার লৌহমানব। '৪৬ সালে নির্বাচন হল—নির্বাচনে জয়যুক্ত হলেন শরৎ বসু ও হেমন্ত বসু। নির্বাচনের মনোনয়ন কমিটিতে শরৎ বসু ও হেমন্ত বসু ছিলেন সদস্য। পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন পরিচালনার জন্যে শরৎ বসুকে সভাপতি করে এক কমিটি গঠিত হল। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন হেমন্ত বসু, আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন ঘোষ প্রমুখ। শরৎ বসু বাংলা দেশে কংগ্রেসের প্রধান নেতা হলেন। এদিকে তলে তলে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা পাকা হয়ে গেছে, ১৯৪৭ সালেব ৩রা জুন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারত বিভাগের প্ল্যান প্রকাশ করলেন। দেশ বিভাগের প্রশ্ন আসতেই বাংলা দেশের কংগ্রেস এবং ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্যরা সকলেই দেশ ভাগের প্রশ্নে দুই নৌকার যাত্রী হয়ে গেলেন। বাংলা দেশে প্রথম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশভাগের স্বপক্ষে জনমত সংগঠন শুরু করলেন। তারকেশ্বরে এক সম্মেলন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন,— দেশভাগই হল সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীপন্থী ও যুগান্তর দল দেশভাগের পক্ষে ময়দানে নেমে পড়ল। বাংলা দেশে শ্রীঅতুল্য ঘোষের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে আসবার পথ রচনা করল দেশভাগের স্বপক্ষে প্রচার-অভিযানগুলি। শ্রীরামপুর ও মেমারীতে কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন করে অতুল্য ঘোষ লাইমলাইটে এলেন। শরৎ বসু ও সুরাবর্দি বললেন, "না, দেশভাগ নয়, যুক্তবঙ্গ গঠনই সমস্যা সমাধানের পথ।" ফরোয়ার্ড ব্লকের একটি অংশ সম্পূর্ণ-ভাবে দেশভাগের বিরোধিতা করল, কিন্তু হেমন্তকুমার বসু, অমর বসু, পান্না মিত্র, দেবেন দে, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ফরোয়ার্ড ব্লকে থেকেও তাঁরা ছিলেন দেশ ভাগের পক্ষে, আর হরেন ঘোষ, সত্য বক্সী, অনিল

রায়, নান্টু ঘোষ, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন দেশভাগের বিপক্ষে। তরুণ ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী ও নেতারা প্রায় সকলেই ছিল দেশভাগের বিপক্ষে। কানাই ভট্টাচার্য, অশোক ঘোষ, ধীরেন ভৌমিক, অমর চক্রবর্তী, শম্ভু চক্রবর্তী প্রমুখ ছাত্র ও যুব সমাজকে সংগঠিত করে দেশভাগের বিপক্ষে প্রবল জনমত গড়ে তোলেন। এই সময় ঠনঠনিয়ায় রাজেন দেবের বাড়িতে দেশভাগ সম্পর্কে ফরোয়ার্ড ব্লকের মতামত স্থিরের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় না। তরুণ কর্মী ও নেতৃবৃন্দ রাজপথে শুয়ে পড়ে দেশভাগের পক্ষের নেতৃবৃন্দের পথরোধের চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে দেশভাগের প্রশ্নে রাজ্য ফরোয়ার্ড ব্লক সম্পূর্ণভাবে দুটি মতে বিভক্ত হয়ে যায়। এর জের চলেছিল অনেকদিন। পশ্চিম বঙ্গে ছায়া মন্ত্রীসভা গঠিত হল। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ হলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে হেমন্তকুমার বসুকে মন্ত্রী করার কথা উঠল। হেমন্ত কুমার বসু তখন রাজবল্লভ স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকেন। সেই বাড়ী তখন রাজ্য রাজনীতির একটা কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। শরৎ বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, রাজেন্দ্র দেব, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনেকেই আসেন রাজবল্লভ স্ট্রীটের বাড়ীতে। রাজনীতির অনেক উত্থান-পতনের কাহিনী রচিত হয় সেখানে। হেমন্ত বসু মন্ত্রী হবেন প্রায় ঠিক, এমনি একটা দিনে শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এলেন হেমন্তকুমার বসুর বাড়িতে। দীর্ঘ সময় আলোচনা হল, পরদিন শোনা গেল হেমন্ত বসু নয়—মন্ত্রী হবেন বিমলচন্দ্র সিংহ।

এসে গেল ১৯৪৭ সাল। ১৫ই আগস্ট। সারা দেশে স্বাধীনতার উৎসব পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লক বলল এই দিনটি তারা শোক দিবস হিসাবে পালন করবে। পি. সি. যোশীর নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শ্রীভবানী সেন সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস পালনের নির্দেশ

দিলেন—নির্দেশ দিলেন সর্বত্র কংগ্রেসী পতাকার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা উড়াতে হবে। ১৫ই আগস্ট সারা দেশে যখন অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, তখন কালো পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা বেরুলো আজাদ-হিন্দ পার্ক থেকে দেশপ্রিয় পার্ক। শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করলেন শ্রীহরেন ঘোষ। দেশ ভাগ হল, কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টি কি করবে? ভারত ও পাকিস্তানে দুই পার্টি হবে, না একই পার্টি থাকবে? ঢাকায় পার্টির সম্মেলন হল। বাউড়িয়াতে কাউন্সিল সভা হল। তারপর বেনারসে সম্মেলন। বেনারসে ওয়ার্কিং কমিটি পার্টি ভাগের পক্ষে মত দিল কিন্তু কাউন্সিলে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ভাগ হয়ে যায়। নেতাদের পদত্যাগ করতে হল। এই প্রস্তাব নিয়ে দুরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হল--শীলভদ্র যাজী পার্টি ভাগের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে শ্রীঅনিল রায়কে সভাপতি করলেন।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীহরেন ঘোষকে সভাপতি করা হল। দলের সভাপতি কবিশের শার্দুল সিং বললেন এই সিদ্ধান্ত বে-আইনী। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ফরোয়ার্ড ব্লক নানা মতের সিদ্ধান্তে টাল মাটাল অবস্থায় চলল। হেমন্তকুমার বসু এই সময় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদক। ১৯৪৮ সালে কালা কানুন পাশ হল। বিধান সভার সম্মুখে এক বিক্ষোভ মিছিলে গুলী চলল। নিহত হল শিশির মণ্ডল। এই মিছিলের প্রধানত নেতৃত্ব ছিল ফরোয়ার্ড ব্লকেরই কর্মীদের। ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। ডেকার্স লেনের স্বাধীনতা পত্রিকা অফিস, ন্যাশানাল বুক এজেন্সী পুলিশ তালাবন্ধ করে দেয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে এই সময় এক জোর ওলট পালট হয়ে গেল। পি. সি. যোশীকে সরিয়ে "রাশিয়ান ওয়ে"র প্রবক্তা বি. টি. রণদিভে যোশীকে সংস্কারবাদী আখ্যা দিয়ে সরিয়ে পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব নিলেন।

কলকাতায় আটক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বন্দীদের মা-বোনেরা একটি মিছিল বের করেন। মিছিলটি কলেজ স্ট্রীট ও বউবাজার স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে পৌঁছলে পুলিশ গুলী চালায়। লতিকা সেন সহ পাঁচজন মহিলা নিহত হন। (লতিকা সেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ডঃ রণেন সেনের স্ত্রী)।

এসে গেল ১৯৪৯ সাল। হেমন্তকুমার বসু 'কোরিয়া' যুদ্ধে ভারতের নীতির প্রতি প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করলেন কংগ্রেস থেকে। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে অমর বসু বললেন—"যেদিন বউবাজার স্ট্রীটে পাঁচজন মহিলা পুলিশের গুলীতে নিহত হল সেদিন হেমন্তর মনটা ভয়ানক ভেঙে গিয়েছিল। আমি বললাম, হেমন্ত, কংগ্রেস ছাড়। উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয়েছে, লাখ লাখ উদ্বাস্তু আসছে। হেমন্ত উদ্বাস্তুদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রথম নায়ক হলেন হেমন্তকুমার বসু। প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সরকারী নীতির সঙ্গে কোনরকমে মতের মিল হচ্ছিল না হেমন্তর। কালো-বাজারী দমনে সরকারের ব্যর্থতা হেমন্তর মনকে বিরূপ করে তুলেছিল। এই সময়ে 'কোরিয়া' যুদ্ধে ভারত যখন মার্কিনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল তখন হেমন্ত কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এল।"

সেইদিন হেমন্তকুমার বসুর কংগ্রেস ত্যাগ তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আন্তর্জাতিক কোন প্রশ্নে মতবিরোধে মর্যাদার আসন থেকে নেমে এসে হেমন্তকুমার বসু এক বিরল নজির স্থাপন করলেন। কোরিয়ার প্রশ্নে তিনি শুধুমাত্র যে কংগ্রেস ত্যাগ করলেন তাই নয়, সেইদিন যে বিশ্বশান্তি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে হেমন্তকুমার বসু ছিলেন তার পুরোভাগে। কলকাতায় মহম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত রাজ্য শান্তি সম্মেলনের তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষ

বললেন—"কোরিয়ার যুদ্ধের ইস্যু নিয়ে হেমন্তদা কংগ্রেস ছাড়লেন, শুধু কংগ্রেস থেকেই ইস্তফা নয় আইনসভার সদস্য পদ থেকেও পদত্যাগ করলেন। হেমন্তকুমার বসু হলেন প্রথম ব্যক্তি—যিনি দল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে দলের মনোনয়নে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই পদও ত্যাগ করলেন। বর্তমান দশকে এই কথা শুনে অনেকে বিস্মিত হবেন, কিন্তু হেমন্তকুমার বসু সেই নীতিতে অটল। হেমন্তকুমার বসু ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে দশ পা হাঁটলে সে হয়ে যেত বন্ধু। নিরহঙ্কার স্নেহশীল মানুষটির মনটি ছিল খুব নরম, কিন্তু নীতিতে ছিলেন কঠিন।"

হেমন্তকুমার বসু কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন ও আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন, তাই আবার উপনির্বাচন। উত্তর কলকাতা কেন্দ্র থেকে নির্দল সদস্যরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন তিনি এবং আবার নির্বাচিত হলেন। এদিকে এই সময় থেকেই শুরু হয়েছে কংগ্রেস বিরোধী শক্তি ও বামপন্থী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস। সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে কংগ্রেসের ভিতরের ও বাহিরের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রয়াস সাফল্যলাভ করেনি। দেশত্যাগের পর সুভাষচন্দ্রের সাধনা ও স্বপ্ন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হতে চলেছিল, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অসমাপ্ত প্রয়াসকে আবার নূতন রূপ দান করতে এগিয়ে এলেন হেমন্তকুমার বসু। শরৎচন্দ্র বসুও এই সময়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে এসে এস-আর-পি দল গঠন করেছেন। একদা বাংলা দেশের রাজনীতিতে পঞ্চপ্রধান যেমন ছিলেন, তার কয়েকজন উপপ্রধানও ছিলেন। এই উপপ্রধানদের মধ্যে ছিলেন সুরেশ মজুমদার অমর বসু ও হেমন্ত বসু। দীর্ঘদিন পরে পঞ্চ প্রধানের এক শরৎ বসু ও উপপ্রধানের দুই হেমন্ত বসু, অমর বসু বাংলার রাজনীতিতে নূতন ধারা প্রবাহিত করলেন।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

শুরু হয় দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পর থেকেই। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে শ্রীঅনিল রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতা ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে বামপন্থী দলগুলিকে সর্বনিম্ন কর্ম-সূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানানো হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শ্রীশরৎ বসুর জয়লাভের ফলে বামপন্থী ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে সম্মেলন মনে করেন।

ওই বছরেরই আগস্ট মাসে ৩রা আগস্ট অনুষ্ঠিত কামরূপ (আসাম) জেলা ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে দলের আসাম প্রাদেশিক শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্মা বলেন যে, দেশকে কমিউনিস্ট উপদ্রব এবং পুঁজিবাদী শোষণ থেকে বাঁচাতে হলে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সমস্ত বামপন্থী দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রী আর এস রুইকরের আহ্বানে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এক সভাতেও শ্রীশরৎ বসু, শ্রী এন এম যোশী প্রমুখ নেতা বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

ফরোয়ার্ড ব্লকের দুই পক্ষের নেতা শ্রী আর এস রুইকর এবং শ্রীশীলভদ্র যাজী ২.৯.৪৯ তারিখে নাগপুরে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট কংগ্রেস গঠনে দলের মতানৈক্য ও বিরোধ দূরীকরণে একমত হয়েছেন।

৩রা নভেম্বর ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট অর্গানাইজেশন অল ইণ্ডিয়া দল গঠনে সাফল্য অর্জনের কারণে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীশরৎ বসুকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়।

নেতাজী মর্মর মূর্তি কমিটি গঠিত হলে ২৪শে অক্টোবর ১৯৫০ সালে অনুষ্ঠিত তার প্রথম সভায় হেমন্তকুমার বসু, মোহিত মৈত্র

প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়।

প্রথম সাধারণ নিবার্চনের জন্য (১৯৫২) ৭.১০.৫১ তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট অর্গানাইজেশন-এর বাংলা কমিটি পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠন করে, তাতে শ্রীহেমন্তকুমার বসুকে অন্যতম সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

২১শে ডিসেম্বর ('৫১) তারিখে শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅশোক ঘোষ কর্তৃক প্রচারিত এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয় যে, কমিউনিস্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক নির্বাচনে একজোট হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

কিন্তু নিবার্চনের পর ১১.৬.৫২ তারিখে কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, বিধায়ক মণ্ডলীতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্যে যে আহ্বান জানানো হয়েছিল তাতে আদৌ সাড়া মেলেনি। কাজেই গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছ বলে শ্রীবসু অভিমত প্রকাশ করেন।

কংগ্রেসী শাসনে প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত হয় ১৬ জুলাই ১৯৫২। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণ খাদ্যের দাবিতে বিধানসভা অভিমুখে অভিযান করে। অভিযানকারী জনতার উপর ৪০ বার কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। রাজভবনের সম্মুখে পুলিশের নির্বিচারে লাঠিচালনার ফলে শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীহেমন্তকুমার বসু, কে-এম-পি-পির ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক নেত্রী শ্রীমতী লীলা রায় এবং আর. এস. পি.-র যতীন চক্রবর্তীও ছিলেন।

১৫ ও ১৬ই জুলাই পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৭ জুলাই ভোর ৪টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।

১৭ জুলাই ময়দানে খাদ্যের দাবিতে জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

২৪ জুলাই শ্রীহেমন্ত বসু প্রমুখ ধৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তিলাভ ঘটে এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি. সি. রায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে আপসরফার আলোচনা করেন। ২রা জুলাই—হেমন্ত বসু বিডন স্কোয়ারের জনসভায় ঘোষণা করেন: প্রতিরোধ কমিটির দাবি না মানলে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন চলবে।

৩০শে আগস্ট হেমন্ত বসুর সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা। খাদ্য সঙ্কট মোচনে ১০ দফা দাবি পেশ করেন এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রতিরোধ দিবস পালিত হবে বলে স্থির হয়।

'৫২ সালে নির্বাচন হয়ে গেল। নির্বাচনে সার্বিক ভাবে কোন বামপন্থী ঐক্য হল না। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে অমর বসু বললেন, "দীর্ঘদিন আলাপ আলোচনা করেও বামপন্থী ঐক্য হল না। সেদিন মাত্র তিন বামপন্থী দল ঐক্যের দলিলে সই করেছিল। প্রথম সই ছিল অশোক ঘোষের, দ্বিতীয় সই জ্যোতি বসুর, তৃতীয় সই যতীশ জোয়ারদারের। জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে নিখিল দাস দাঁড়াল, গণেশ ঘোষের বিরুদ্ধে দাঁড়াল যতীন চক্রবর্তী। শরৎ বসু মারা গেলেন, তার পরেও ইউ. এস. ও ছিল অনেক দিন। শরৎ বসুর পর ইউ. এস. ও-র সভাপতি হয় মৃণালকান্তি বসু, তারপর সভাপতি হন জেনারেল মোহন সিং।"

১৯৫৩ সালে আবার খাদ্য আন্দোলন। ২৯শে সেপ্টেম্বর দেউলটি স্টেশনে পুলিশের গুলি চালনায় নিহত হল ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মী অন্নদা দলুই। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশে যে খাদ্য আন্দোলন চলে এবং যে আন্দোলনের কাছে সরকারকে বার বার নতি স্বীকার করতে হয় তার প্রাণপুরুষ ছিলেন হেমন্তকুমার বসু।

হেমন্তকুমার বসুর প্রচেষ্টাতেই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ও খাদ্য অভিযান কমিটির একীকরণ সম্ভব হয়। এই কাজে শ্রীবসুর প্রধান সহযোগী হয়েছিলেন শ্রীমাখন পাল। খাদ্যাভাবগ্রস্ত অঞ্চলের জন্যে জি. আর. ও টি. আর. খাদ্য আন্দোলনের আটক ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা আদায় এবং আজ যে খাদ্য রেশনিং প্রথা সঠিক ভাবে চালু হয়েছে এই সবই হল সেদিনের খাদ্য আন্দোলনের ফল। এই খাদ্য আন্দোলনের বা এই সময়কার প্রতিটি আন্দোলনের যুক্ত কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন হেমন্তকুমার বসু। আজ দেশের সর্বত্র নেতাজীর জন্মদিবস পালিত হয়। নেতাজীর জন্মদিবসে ছুটি ঘোষণা করা হয়। নেতাজীর প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়েছে কলকাতায় সরকারী উদ্যোগে— এই প্রতিটি কাজের পিছনে ছিল হেমন্তকুমার বসুর উদ্যোগ ও অবদান। এর প্রতিটি কাজের জন্যে সংগঠন ও আন্দোলন পরিচালনায় হেমন্তকুমার বসুই ছিলেন প্রধান ঋত্বিক। ১৯৫৩ সালের ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলন— সেখানেও হেমন্তকুমার বসু ছিলেন পুরোভাগে। ১৯৫৫ সালে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ গোয়া, দমন, দিউতে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হলে বাংলা দেশ থেকে দু'জন নেতা সেদিন গোয়া মুক্তি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন ত্রিদিবকুমার চৌধুরী, দ্বিতীয় ছিলেন হেমন্তকুমার বসু।

সেই গোয়া অভিযানে হেমন্তকুমার বসুর অন্যতম সঙ্গী শ্রীসুখেন্দু চট্টোপাধ্যায় সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে বললেন, "হেমন্তদার সঙ্গে আমরা ৩রা আগস্ট হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা হয়ে ৮ই আগস্ট পুনায় পৌঁছলাম। প্রথমে কথা হয় ৯ই আগস্ট আমরা গোয়া সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করব; কিন্তু পরে ঠিক হয় আমরা গোপন পথে গোয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সত্যাগ্রহ করব। সেই মত ট্রাকে করে 'বান্দার' পৌঁছাই, তারপর ১১ই থেকে আমাদের পায়ে

হেঁটে যাত্রা শুরু হয়। দিনে ১৮ ঘণ্টা হেঁটে আমরা দোদেমার্গ পৌঁছাই। প্রথমে চেষ্টা হয় ১৩ মাইল নদীপথ নৌকো করে যাওয়া হবে। কিন্তু স্রোতের কারণে সেটা সম্ভব হয় না।

৪টি আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে পাঞ্জিম লক্ষ্য করে আমরা যাত্রা শুরু করি। দুর্গম জঙ্গল, প্রবল বর্ষণ, তার মধ্য দিয়ে এবং খরস্রোতা নদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে আমরা গোয়ার ৯ মাইল অভ্যন্তরে বিটলী গ্রামে উপস্থিত হই। সেখানে প্রথম জাতীয় পতাকা তোলেন হেমন্তদা। তারপর আমরা আরও অগ্রসর হয়ে যাই। ইতিমধ্যে সাকলিম্ গ্রামে প্রবেশের মুখে পুলিশ আমাদের ঘিরে ফেলে নির্মমভাবে প্রহার করতে থাকে। সালাজারের পুলিশ, নিগ্রো সৈনিকদের নির্মম অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন হেমন্তকুমার বসু। পাঁচজন নিগ্রো অমানুষিক প্রহার করে একটা জাতীয় পতাকায় হেমন্ত বসুকে পা রাখতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। হেমন্তকুমার বসু "সালাজার নিপাত যাক্," "জয় হিন্দ"—মুখে এই ধ্বনি তুলে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে যান, তারপর অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান, মাথাটা পড়ে জাতীয় পতাকার উপর। জ্ঞান থাকতে হেমন্তকুমার বসু জাতীয় পতাকার অসম্মান করেননি। জ্ঞান হারিয়েও জাতীয় পতাকার উপরই মাথা রেখেছিলেন তিনি।"

গোয়া আন্দোলনে হেমন্ত বসুর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন শ্রীধীরেন ভৌমিক। তিনি বললেন, "হেমন্তদার উপরেই সবচেয়ে বেশী নির্যাতন হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন দলের নেতা। ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ সেদিন যেভাবে পর্তুগাল পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেছেন, সেটা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না।"

১৯৫৬ সালে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রতিবাদ আন্দোলনেও হেমন্ত-কুমার বসু ছিলেন পুরোভাগে। ১৯৫৭ সালে আবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা হেমন্তকুমার বসু। ১৯৫৮ সালে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি—সেখানেও নেতা হেমন্ত বসু।

১৯৫৯ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন—যেখানে ৮০ জন ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়—সেই আন্দোলনের সংগঠক ও প্রধান নেতা ছিলেন হেমন্তকুমার বসু। '৫৯ সালে আসামে 'বাঙালী খেদাও' আন্দোলন প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গে জনমত সংগঠনে হেমন্ত-কুমার বসু প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৯৫৯ সালে চীনের ভারত আক্রমণ। হেমন্তকুমার বসু বিধান সভায় ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখলেন—জাতীয়তাবাদী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে। স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠল। সেখানেও হেমন্তকুমার বসু। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য দিল্লীর লোকসভার সম্মুখে বাংলাদেশ থেকে এক প্রতিনিধিদল অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ভারত সরকারকে গ্রহণ করতে হবে—এই ছিল সেদিনের দাবি। এই অনশন সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব করেন শ্রীহেমন্তকুমার বসু। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছ থেকে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তবে ফিরে আসেন হেমন্তকুমার বসু।

১৯৫৬ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিগর্ভ শুধু খাদ্য আন্দোলনের কারণেই নয়, শুধু বসিরহাট-কৃষ্ণনগরে নুরুল ইসলাম-আনন্দ হাইতের শহিদ হওয়ার কারণেই নয়—ইতিমধ্যে বাংলাদেশে কংগ্রেসবিরোধী ও বামপন্থী শক্তিতে নতুন জোয়ার এসেছে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন একদল সৎ ও নিষ্ঠাবান বলে পরিচিত কংগ্রেসকর্মী। আবার অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের মতো জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দও কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন। ১৯৫৯ সাল থেকেই বিধানসভার অভ্যন্তরে কংগ্রেসের পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড দমন-নীতি প্রয়োগ করেও রাজ্যের জনগণকে যেমন শান্ত রাখা যাচ্ছিল না,

তেমনই বিধানসভাতেও বিধানসভার সদস্যরা মন্ত্রীসভার কাজ চালনা অচল করে তুলেছিলেন বিরতিহীন বিক্ষোভের ঢেউয়ে। বিধানসভার অভ্যন্তরে শুধু সরকারী কাজ চালনাই অচল হয়ে গেল না—কোন কোন সময়ে সরকারের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে গেল। বিধানসভার সদস্যরা অনশন করলেন। হেমন্ত বসু, ডাঃ নারায়ণ রায়, যামিনী সাহা, ননী ভট্টাচার্য, নিখিল দাস, ভক্তি মণ্ডল, শম্ভু ঘোষ প্রমুখ সদস্যরা অনশনে যোগ দিলেন।

এসে গেল ১৯৫৯ সাল। ইতিমধ্যে হেমন্তকুমার বসুর নিজের দলের জীবনেও অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিন বৎসর ফরোয়ার্ড ব্লকের দলীয় রাজনীতির বাইরে থেকে আবার তিনি পার্টির নেতৃত্বে ফিরে এলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের পুরী সম্মেলনে দলের ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। তারপর পণ্ডিত নেহরুর আমন্ত্রণে জেনারেল মোহন সিং, শীলভদ্র যাজী যখন দলকে দেউলিয়া করে দেবার চেষ্টায় রাতারাতি কংগ্রেসে চলে গেলেন, তখন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন হেমন্তকুমার বসু। আবার যখন ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া ফরোয়ার্ড ব্লককে সমাজবাদী ঐক্যের নামে বিলীন করতে চাইলেন, তখনও দলকে রক্ষা করলেন হেমন্তকুমার বসু। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রূপে দলকে রক্ষা করেছেন—বর্ধিত করেছেন—দলের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হয়েছেন।

১৯৪৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার জনগণের স্বার্থে ও মঙ্গলের জন্যে যে-কোন আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলনের পুরোভাগে থেকেছেন হেমন্তকুমার বসু। বামপন্থী ঐক্যের তিনি প্রতীক। দলীয় বিবাদ, দলগত কোন বিদ্বেষ স্পর্শ করতে পারেনি—এমন কি কংগ্রেসকে অপসারণের যে বিরতিহীন সংগ্রাম তিনি করেছিলেন, সেই কংগ্রেসেরও হেমন্ত বসু সম্পর্কে মনোভাব ছিল ভিন্নরকম। যাহোক, ১৯৫৯ সাল এল পশ্চিম বাংলার

রাজনীতিতে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে। এল যুক্তফ্রন্ট। ১৯৫৯ সালে যুক্তফ্রন্টের অভিষেক হল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। ২রা মার্চ ১৯৫৯ সাল। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কাছে শপথ নিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহেমন্ত বসু, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীজাহাঙ্গীর কবীর, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। ১৯৫৯ সালের এই নতুন ইতিহাসের পথে যাত্রার আগে একটু পিছন ফিরে তাকানো দরকার।

সেদিন ছিল ৯ই অক্টোবর, ১৯৫৯ সাল।

"আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে
পরিচিত জনতার সরণীতে
আমি আগন্তুক।
আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক
খোল দ্বার
বার্তা আনিয়াছি বিধাতার
মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছ দুর্লক্ষ্য-অক্ষর
বল দুঃসাহসী কে সে
মৃত্যু পণ রেখে
দিব তার দুরূহ উত্তর।"

রবীন্দ্রনাথের এই অমর বাণী উচ্চারণ করে সেদিন ৯ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। পরিচিত জনতার সরণীতে আমি আগন্তুক। আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক, খোল দ্বার বার্তা আনিয়াছি বিধাতার। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সমস্ত জীবন আগন্তুক রূপে বারে

বারে মহাকালেশ্বরের দুর্লক্ষ্য-অক্ষর আর বিধাতার বার্তা বহন করে এনেছেন। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় দুঃসাহসী। মৃত্যুপণ রেখে বারে বারে বন্ধ দ্বার খুলেছেন, অপরিচিতের নাম নিয়ে জনতার সরণীতে এসে দাঁড়িয়েছেন, বারে বারে তাঁকে দ্বারের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অজেয় অজয় বারে বারে সেই বন্ধ দ্বার খুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন বিজয়ী বীরের ভূমিকায়। আজ অজয় মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী—পশ্চিম বাংলার জনগণের প্রত্যাশার প্রতীক।

১৯৫৫ সালের ২৫শে জুলাই বসুমতী পত্রিকার একটি সংবাদ পড়ে চমকে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। অনেকে সেদিন বসুমতী পত্রিকার সংবাদকেও বিশ্বাস করতে পারেনি। এমনকি সেই সংবাদ যখন এসপ্লানেডে কে. সি. দাসের দোকানে এসে আনন্দবাজার, স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার ও বসুমতীর সংবাদিকদের জানিয়েছিলেন আজকের বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া, সে সংবাদ সাহসভরে বসুমতী পত্রিকা ছাড়া অন্য কেউ ছাপতেও পারে নি। সংবাদ ছিল—২৩শে জুলাই রাত ১১-১৫ মিনিটে অজয় মুখোপাধ্যায়কে অভুক্ত অবস্থায় মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে বের করে দিয়েছিলেন চারু মহান্তি, সুবোধ মাইতি ও প্রবীর জানা। আবার ২৭শে জুলাই একইভাবে অভুক্ত অবস্থায় মেদিনীপুরের ট্রেন থেকে নেমে সোজা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকেছিলেন শেষ মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু সেদিন একখানি দৈনিক পত্র মেলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছিলেন, "আপনার জন্য আমি কিছু করব না—এই খবরের কাগজই আপনাকে দেখবে।" মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসে সেদিন কৌতুক দেখছিলেন জগন্নাথ কোলে, তরুণকান্তি ঘোষ, বীজেশ সেন ও নির্মলেন্দু দে প্রমুখ মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতারা। ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে এসেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সাল।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁরই নিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু দে-কে সম্পাদক পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেই বরখাস্ত পত্রের জবাবে শ্রীদে সভাপতিকেই বরখাস্ত করেছিলেন। শ্রীদে নিজে একখানা পত্র লিখে অজয় মুখোপাধ্যায়কে জানালেন যে সভাপতির আদেশ তিনি মানবেন না এবং সম্পাদক হিসেবে কাজ করে যাবেন। এর আধঘণ্টা পরে শ্রীমুখোপাধ্যায় একটি দৈনিক পত্রের রিপোর্টারের কাছ থেকে সংবাদ পেলেন যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অপর সম্পাদক সুহৃদ রুদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর কুমার সিং হলে একটি "রিকুইজিশন" সভার আয়োজন করেছেন। সে সভায় শ্রীমুখো-পাধ্যায়কে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করা হবে। সেই আধ ঘণ্টার মধ্যে ১১৪ জন সদস্য এই "রিকুইজিশন" সভার আহ্বায়করূপে সই করেছিলেন। সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আধঘণ্টার মধ্যে ১১৪ জন সদস্যের সই কি করে সংগৃহীত হয়েছিল সেদিন। প্রথম সই ছিল প্রফুল্লচন্দ্র সেনের এবং দ্বিতীয় সই ছিল অতুল্য ঘোষের। অতুল্য ঘোষ, নির্মলেন্দু দে, বীজেশ সেন, বীরেন মৈত্র, বিভা মিত্র ও বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় আলাদিনকেও হার মানিয়ে-ছিলেন সেদিন। কিন্তু আলাদিনও হার মানে। সেই আলাদিন হার মেনেছিল অজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

১১ই সেপ্টেম্বর সভা বসল কুমার সিং হলে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রস্তাব আনলেন—"প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এই সভা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিতেছে।" সেদিন একজন মাত্র সদস্য এই প্রস্তাবের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন—তিনি ব্যারিস্টার জি. পি. কর। শ্রীকর উঠে দাঁড়াতেই তাঁকে প্রথমে চেঁচামেচি করে বসিয়ে দেবার

চেষ্টা করা হয়। তিনি খদ্দর পরে সভায় আসেননি বলে সভানেত্রী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত তাঁকে সভা থেকে বের করে দেন। আর একজনও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি শ্রীরাধারমণ কর। তাঁর মাইক কেড়ে নিয়ে তাঁকে টেনে বসিয়ে দিয়েছিলেন বীজেশ চন্দ্র সেন। শ্রীকর দাবি করেছিলেন অনাস্থা প্রস্তাবের ভোট ব্যালটে নেওয়া হোক। সেদিন মাত্র একজন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে, আর ১১০ জন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। সেদিন কুমার সিং হল থেকে একাকী নিঃসঙ্গ বেরিয়ে এলেন অজয় মুখোপাধ্যায়।

সেই সভার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিনয়কৃষ্ণ বাগ হাইকোর্টে একটি মামলা করেন। মামলায় শ্রীবাগের জয় হয় এবং কোর্টের নির্দেশ অনুসারে ২০শে জানুয়ারী ১৯৫৫ সালে সেই কুমার সিং হলেই আবার সভা ডাকা হয়। সেদিন সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রামসুভগ সিং। সভার শুরুতে প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য বিষ্ণু বন্দ্যো-পাধ্যায় অনাস্থা প্রস্তাবটি অসমীচীন বলেন। আর রাধারমণ কর ও সুরেন্দ্রনাথ সরকার আবার বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু কোন বিচারের বাণীই সেদিন আমল পায় না। রবি সিকদার অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন আর সমর্থন করেন দুর্গাপদ সিংহ। এইদিন কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ৪০টি ভোট পড়ে, তিনটি ভোট বাতিল হয়, আর অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ২৯৬টি। আবার কুমার সিং হল থেকে বেরিয়ে এলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার শুরুতে সদস্যদের তিনি বলেছিলেন, "আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তা জানতে পারলাম না, অথচ অনাস্থা ও অপসারণের প্রস্তাব পেশ হল। প্রস্তাব গৃহীত হলে আমার ৪৫ বৎসরের কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাবে। তা যদি উচিত মনে করেন তবে আপনারা তাই করবেন।" সেইদিনই পথে দাঁড়িয়ে অজয়বাবু বলেছিলেন— "একজন সামান্য কংগ্রেসকর্মী রূপে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে দুর্নীতি ও

একনায়কতন্ত্র উচ্ছেদের যে প্রচেষ্টা করে আসছি—তা অব্যাহত থাকবে।"

কংগ্রেস থেকে একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সারা কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করেন অজয় মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের "রিকুইজিশনে" সভার তুই স্বাক্ষরকারী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষ। কিন্তু আজ শুধু তাঁরা নামের অক্ষরে বেঁচে আছেন। আরও যাঁরা সেইদিন অজয় মুখোপাধ্যায়ের নাম মুছে দিতে চেয়েছিলেন—সেই বীজেশ সেন, সেই আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, সেই অশোককৃষ্ণ দত্ত, সেই তরুণকান্তি ঘোষ, প্রবীর জানা, সেই হৃষীকেশ গায়েন, সেই রাসবিহারী পাল, শ্রীমতী আভা মাইতি—তাঁদের অনেকের নামই আজ মুছে যেতে বসেছে।

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সংগ্রামী মানুষ। জীবনে বার বার তিনি পেয়েছেন সিংহাসন, আবার বার বার নেমে এসেছেন সৈনিক রূপে। ছিলেন মেদিনীপুরে একজন সৈনিক—হলেন ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে মন্ত্রী। মন্ত্রী হয়ে ১১ বৎসর কাটিয়ে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "কামরাজ পরিকল্পনায়" স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে আবার হলেন সৈনিক। ৯ মাস পরে ১৯৬৪ সালের জুন মাসে হলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। আবার নেমে এলেন সভাপতি পদ থেকে সৈনিক রূপে। একা। ১৯৫৫ সালের ২০শে জানুয়ারী। পত্তন হলো বাংলা কংগ্রেসের। ১৯৫৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। শ্যাম স্কোয়ারে বাংলা কংগ্রেসের সম্মেলনে আবার হলেন সভাপতি।

এল নির্বাচন। ১৯৫৫ সাল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার লোক নেই। কোন দলই সাহস করে শ্রীসেনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রার্থী দিতে চায় না। অজয় মুখোপাধ্যায় জানালেন, তিনিই দাঁড়াবেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আরামবাগে আর নিজের

কেন্দ্র তমলুকে। দেশের লোক অবাক হল এই দুঃসাহস দেখে। এর আগে একবার ১২ই জুন '৫৫তে অজয় মুখোপাধ্যায় আরামবাগে গিয়েছিলেন বাংলা কংগ্রেসের শাখা পত্তন করতে। সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বসুমতী সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। দুইজনেই প্রচণ্ড ঝড় দুর্যোগে পৌরসভার ময়দানে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানিয়েছিলেন —রাজ্য থেকে অতুল্য-প্রফুল্ল চক্রের অবসান ছাড়া দেশের মঙ্গল নেই। কিন্তু সেই আরামবাগে আর একদিন ঝড় জলে অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের নির্বাচনী সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপরে আর এক সভায় অতুল্য ঘোষ সেই একই ময়দানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, বাংলা কংগ্রেস আর অজয় মুখোপাধ্যায়কে বঙ্গোপসাগরে তিনি ফেলে দেবেন। হায়! অজয় মুখোপাধ্যায় আরামবাগে দাঁড়িয়ে আরামবাগের গান্ধীকে সাগরে ফেললেন—যে সাগরের তল নেই—যে সাগরের কুল নেই। আর অতুল্য ঘোষ হিন্দুস্থান টাইমসের কার্টুনে পরিণত হলেন, যে কার্টুনে দেখানো হয়েছে—অজয়ে বান এসেছে—অতুল্য ঘোষ ডুবে যাচ্ছেন—শুধু হাতের কালো চশমাটা তুলে ধরেছেন।

"মুক্তি চাই মুক্তি চাই—মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই।" সেই মুক্তি এল ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল তখন একে একে বের হতে আরম্ভ করেছে।

নির্বাচনে বামপন্থীরা এক হতে পারেনি—দুই ফ্রন্ট একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান শত্রু কংগ্রেসকে ছেড়ে একে অপরকে হারাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ঢাকুরিয়াতে সোমনাথ লাহিড়ীর জামানত জব্দের হুমকীও এসেছিল। নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তাই সংশয় ছিল সকলের মনেই। রাজনৈতিক পণ্ডিতেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—শেষ পর্যন্ত ঐ কংগ্রেসই জিতবে, তবে মেজরিটি খুবই কমে যাবে।

ভোট গ্রহণের পর অতুল্যবাবু একগাল হেসে সাংবাদিকদের

'গোপন খবর' দিলেন—কংগ্রেসই মন্ত্রীসভা গঠন করবে আর মুখ্যমন্ত্রী হবেন প্রফুল্ল সেন।

কিন্তু বাংলা দেশের ভোটদাতারা সব রাজনৈতিক পণ্ডিতদের একেবারে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিলেন। একের পর এক নির্বাচনের ফল আসছে আর কংগ্রেস ভবনের বীর পুরুষদের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অসম্ভব সম্ভব হল! বাঁকুড়ায় অতুল্য বাবু ধরাশায়ী হলেন, প্রফুল্লবাবু আরামবাগে। কংগ্রেসের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভের আশাও শূন্যে মিলিয়ে গেল।

আর অমনি বাঁধভাঙা বন্যার মত কলকাতা ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তায়। কানা বেগুন আর কাঁচকলার মহোৎসব শুরু হয়ে গেল। কংগ্রেসী মহাবীরেরা ইঁদুরের গর্তে ঢুকলেন। বামপন্থী নেতারা বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত। অনৈক্য সত্ত্বেও নির্বাচনের ফলাফল এরূপ দাঁড়াবে তাঁরা যেন ভাবতেও পারেননি। জনসাধারণ থালায় করে ক্ষমতা তাঁদের সামনে তুলে ধরেছে। এই ক্ষমতা তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু এক শর্তে—সবাইকে এক হতে হবে। নেতারা তখন দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় দুলছেন। কারুর মনে দ্বিধা—শেষ পর্যন্ত বাম কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলাবো? বাম কমিউনিস্টদের কট্টর অংশ চাপ দিচ্ছেন—কোন ক্রমেই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়া চলবে না, বড় জোর অ-কংগ্রেসী কোয়ালিশনকে সমর্থন করা যেতে পারে, এর বেশী কিছুতেই নয়।

বাংলাদেশের জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত কট্টরদের এই আপত্তি টিকল না। জ্যোতি বসু আগেই প্রকাশ্যে বলেছিলেন, অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের জন্য পি. ইউ. এল. এফ.-এর সঙ্গে হাত মেলাতে তাঁরা দ্বিধা করবেন না। এবারে এতকাল চরমপন্থী বলে পরিচিত হরেকৃষ্ণ কোঙারও তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন। কট্টরদের তখনকার মত হার হল বটে—কিন্তু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভেদের

বীজ তখনই উপ্ত হয়ে গেল আর এরই ফলশ্রুতি পরবর্তীকালে পার্টির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থীদের বিদ্রোহ—যুক্তফ্রন্টে চিড় ধরানোতে যার ভূমিকা কম নয়।

আপাতত অবশ্য কোয়ালিশন গঠনের পথে সব বিঘ্ন অপসারিত হল। নির্বাচনে যে দুই বামপন্থী ফ্রন্ট ইউ. এল. এফ. ও পি. ইউ. এল. এফ. একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছেন সেই দুই ফ্রন্টের নেতারা আলোচনায় বসলেন। এই আলোচনায় একটা মুখ্য ভূমিকা নিলেন হুমায়ুন কবীর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপদ যাবার পর থেকে কবীর সাহেব মনে মনে গুমরে মরছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেস ছাড়েন নি, আশা ছিল অন্তত লোকসভার কংগ্রেস মনোনয়নটা তিনিই পাবেন। কিন্তু যখন বুঝলেন সে গুড়ে একবারে বালি—অতুল্য ঘোষ মনোনয়ন তাঁকে কিছুতেই দেবেন না—তখন হঠাৎ তিনি কংগ্রেস ছাড়লেন। অজয়বাবু তার আগেই (মে মাসে) বাংলা কংগ্রেস গড়েছেন। কবীর সাহেব এসে ভিড়ে পড়লেন বাংলা কংগ্রেসে (সেপ্টেম্বরে)। সরল বিশ্বাসে অজয়বাবু তাঁকে দু হাতে বুকে টেনে নিলেন। কিন্তু কবীর সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। অজয়বাবুর বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে বাংলা কংগ্রেসের মনোনয়নে তিনি যথেষ্ট সংখ্যক নিজের লোক ঢুকিয়ে রাখলেন। পরবর্তীকালে এদের সাহায্যেই তিনি ভাঙন আনলেন বাংলা কংগ্রেসে।

কবীর সাহেব প্রাক-নির্বাচনী আলাপ-আলোচনাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি তখন বাম কমিউনিস্টের যে কোনও দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত। শঠ-চূড়ামণি হুমায়ুন কবীর বুঝেছিলেন নির্বাচনে না জিততে পারলে পশ্চিম বাংলার এবং সেই সূত্রে ভারতের রাজনীতিতে তিনি এখন যে ভূমিকা নিতে পারছেন তা কখনও নিতে পারতেন না। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে পশ্চিম বাংলায় বাম কমিউনিস্টদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন ছিল সর্বাধিক এবং তাদের

সংগঠন ছিল সবার চেয়ে জোরদার। তাদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশে নির্বাচন জেতা কঠিন। আর নির্বাচনে না জিততে পারলে কবীর সাহেব তাঁর প্রভুদের কাছ থেকে যে কাজের ভার পেয়েছেন (পরে তিনি সে দায়িত্ব কিছুটা পালনও করেছিলেন) তা কিছুতেই সমাধা করতে পারবেন না। তাই ইউ. এল. এফ.-পি. ইউ. এল. এফ. ঐক্য আলোচনা ভেঙে যাবার পরে অনেক কেন্দ্রে তিনি বাম কমিউনিস্টদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করতেও পেছপা হন নি।

নির্বাচনী প্রচার অভিযানেও কবীর সাহেবের ভূমিকা নেহাৎ গৌণ ছিল না। তাই কোয়ালিশন আলোচনায় কবীর সাহেব যখন আগ বাড়িয়ে এসে উদ্যোগ নিলেন তখন কেউ সন্দেহ করতে পারেন নি যে তাঁর মতলবটা মোটেই সাধু ছিল না। প্রথম খটকা লাগলো যখন কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই কবীর সাহেব খবরের কাগজের রিপোর্টারের কাছে হুম করে বলে বসলেন—মুখ্যমন্ত্রী হবার পক্ষে প্রফুল্ল ঘোষই যোগ্যতম ব্যক্তি। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখেই বোধহয় কথাটা বলেছিলেন কবীর সাহেব। প্রফুল্লবাবুর উচ্চাশার কথা তাঁর অজানা ছিল না—তাই তাঁর প্রস্তাব কারোর কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না জেনেও বোধহয় এই কারণেই টোপটা ফেলেছিলেন হুমায়ুন সাহেব। সেই থেকেই হুমায়ুন-প্রফুল্ল হরিহর আত্মা, এবং পরে এই মিতালী কবীর সাহেবের খুবই কাজে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অজয়বাবুই মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য সকলের মনোনয়ন লাভ করলেন। ঠিক হল জ্যোতি বসু হবেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। দুই ফ্রন্ট এবং তার বাইরের আরও দু-একটি দল নিয়ে গঠিত হল যুক্তফ্রন্ট। অজয়বাবু নেতা এবং জ্যোতিবাবু সহকারী নেতা নির্বাচিত হলেন।

২রা মার্চ অজয়বাবু, জ্যোতিবাবু, সোমনাথ লাহিড়ী, হেমন্ত বসু প্রমুখ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন।

রাজভবনের গেটে বিপুল জনতা তাঁদের অভিনন্দন জানাল।

মন্ত্রী হলেন হেমন্তকুমার বসু। মন্ত্রী হবার পরদিন অর্থাৎ ৩রা মার্চ সকালবেলা খাওয়া দাওয়া করে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়ে রওনা হলেন মহাকরণ অভিমুখে।

আবার ১৯৫৫ সালের ২২শে নভেম্বর। ২১শে নভেম্বর রাত্রে ছিলেন বীরভূম জেলায় দুবরাজপুরে। সাড়ে সাতটার খবরে রেডিওতে শুনলেন তিনি আর মন্ত্রী নেই। রাত্রের গাড়িতে রওনা হয়ে সকালবেলা হাওড়া স্টেশনে নেমেছেন। দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী। পূর্তমন্ত্রীর গাড়ী পূর্বনির্ধারিত সময়সূচীমত পূর্তমন্ত্রীকে হাওড়া থেকে নিতে এসেছে। হেমন্তকুমার বসু গেট থেকে বেরুতেই সরকারী ড্রাইভার (পাঞ্জাবী ভদ্রলোক) বললেন, "স্যার, গাড়ী নিয়ে এসেছি।" শ্রীবসু হেসে বললেন, "এ গাড়ীতে তো আর যাওয়া যাবে না, আমি তো আর মন্ত্রী নেই।" পাঞ্জাবী ড্রাইভার নাছোড়বান্দা। বিগত ৯ মাস এই আপনভোলা লোকটিকে নিয়ে তিনি নিজেও প্রায় নিজেকে ভুলে গিয়েছিলেন। এই ড্রাইভার ভদ্রলোক ছিলেন একদা আই. এন. এ'র লোক। তাই নেতাজীর সহকর্মীকে পেয়ে তিনি সবকিছু ভুলে বৃদ্ধকে আগলে নিয়ে বেড়িয়েছেন।

পূর্তমন্ত্রী হেমন্তকুমার বসু এক নূতন ধাঁচের, নূতন জাতের মন্ত্রী। এই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে, এই মহাকরণে অনেক মন্ত্রী এসেছেন অনেক মন্ত্রী গেছেন—কিন্তু এমন চরিত্রের, এমন আচরণের মন্ত্রী কেউ কখনও দেখেনি। পূর্তমন্ত্রী হিসাবে যেদিন ঘরে ঢুকেছেন সেদিন থেকে দরজাও দিয়েছেন খুলে। কোন কারণে কখনও যদি দরজা বন্ধ দেখেছেন সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিয়েছেন। মন্ত্রীর ঘরে প্রবেশে মানুষের আনাগোনায় সামান্য বাধা সৃষ্টি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেছেন। একইরকম আচরণ। বিগত বিশ-ত্রিশ বছর রাজবল্লভ স্ট্রীটের বাড়ীতে অথবা শ্রীকৃষ্ণ লেনে অথবা শ্যামপুকুর স্ট্রীটের

বাড়ীতে ভাঙা চেয়ারে বসে যেভাবে জনগণের সঙ্গে মিশেছেন, জনগণের দুঃখ-ব্যথা-বেদনার ভাগীদার হয়েছেন—মহাকরণে বসেও তাই।

তখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী। হেমন্ত বসু ডাঃ রায়ের বাড়ীতে গেছেন। ডাঃ রায় পাশে বসা একটি ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, "হেমন্ত, একে তুমি কতদিন চেনো?" হেমন্ত বসু ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কে ও? না; আমি তো ওকে চিনিনা।" ডাঃ রায় হেমন্ত বসুরই লেখা একখানা চিঠি বের করে বললেন, "এই যে তুমি এতবড় ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিয়েছ?" ডাঃ রায়ের সামনে উপস্থিত ছেলেটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হেমন্ত বসুকে বলল, "এই যে সকালে আমি গেলাম, আপনি আমাকে·· ···।" ততক্ষণে হেমন্ত বসু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। সামলে নিয়ে বললেন, "ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, চিনি-চিনি।" ডাঃ রায় হেসে বললেন, "হেমন্ত, তোমার চেনার বহরটা একটু কমাও। আমি তো আর পারি না।"

এক বাড়ীওয়ালা এসে ধরল, "আমার ভাড়াটে কয়লার দোকানদার। তার অত্যাচারে তো আর বাঁচিনা।" চিঠি লিখে দিলেন হেমন্তবাবু। পরদিন এসে দোকানদার হাজির, "দাদা, সামান্য কয়লার দোকান করে সংসার চালাই। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে— দেখুন বাড়ীওলা নানাভাবে আমাকে তাড়াবার মতলব করছে। আপনি যদি রক্ষা না করেন—" কর্পোরেশনের একই লোকের কাছে চিঠি গেল হেমন্ত বসুর। একটি চিঠি বাড়ীওলার পক্ষে অন্যটি ভাড়াটের পক্ষে। কিন্তু যাঁর কাছে চিঠি গেল তিনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বাড়ীওলা-ভাড়াটের ঝগড়া মিটিয়ে দুজনকে ফিরিয়ে দিলেন।

কংগ্রেসের একজন প্রখ্যাত নেতা সকালবেলা হেমন্ত বসুর বাড়ী গিয়ে হাজির। অশোক ঘোষ বসে আছেন, তাই কংগ্রেস নেতা মুখ খুলছেন না। হেমন্ত বসু বারে বারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন কিন্তু সেই প্রবীণ কংগ্রেস নেতার এক কথা, "সকলে চলে যাক, তারপর

বলব।” তখন হেমন্ত বসু বললেন, “ওতো অশোক, যা বলার বলো না—ওর সামনে বললে কিছু দোষ হবে না।” অনেক কিন্তু কিন্তু করে তিনি বললেন, “হেমন্তদা, আপনাকে আমায় একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে।” “তোমাকে সার্টিফিকেট দিতে হবে? তুমি কে?” ভদ্রলোক অবাক—দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সহকর্মী তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন ‘তুমি কে’। তবু তিনি বললেন, “আমি অমুক।” হেমন্ত বসু বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো জানি, তা তোমাকে আমি কী সার্টিফিকেট দেব?” “সার্টিফিকেট দেবেন যে আমি বি. এ. পাশ।” “সে কি? আমি কি ইউনিভার্সিটি? আমি সার্টিফিকেট দেব কি করে!” ভদ্রলোক বললেন, “আপনাকে সার্টিফিকেট দিতে হবে। আমি জাতীয় বিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেছিলাম। তাহলে আমার…… …চাকরীটা হয়।” হেমন্তকুমার বসু বললেন, “আমি লিখলেই তুমি বি. এ. পাশ হবে? তোমার চাকরী হবে?” ভদ্রলোক বললেন, “হ্যাঁ—আমায় কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বলেছে যদি আপনি লিখে দেন তাহলে তারা আমাকে গ্র্যাজুয়েট বলেই অ্যাকসেপ্ট করবে। আমার তাহলে চাকরীটা হবে।” “ও, তাই বল।” হেমন্ত বসু লিখে দিলেন। চাকরী হয়ে গেল ভদ্রলোকের। অনেক বড় পোস্ট। ব্যক্তিটিও খুব নামকরা। তাই নামটি আর উল্লেখ করা হল না। অথচ তাঁর নিজেরই এক ভাইপো যখন একটি সরকারী চাকরীর চেষ্টায় তাঁর কাছে যায়, তিনি তাকে বলেন, “হয় তুমি চাকরী কর অথবা আমি মন্ত্রী থাকি। দেশে আরও ঢের বেকার আছে, তুমিও তাদেরই একজন।”

দশটি পোস্ট ভ্যাকান্সি। হেমন্তকুমার বসু সিলেক্‌শান কমিটির মেম্বার। তিনি কম করে নিজেই রেকমেণ্ড করেছেন কুড়িজনকে। যে ভাবে হোক হেমন্ত বসুর কাছে পৌঁছতে পারলে হয়, দুঃখের কথা অভিযোগের কথা বলতে পারলে হয়। তারপর তাঁকে দিয়ে যদি

কোন কাজ হয় তবে সেই কাজ তিনি করবেনই। অজস্র মানুষ ঠকিয়েছে—অজস্র মানুষ জালিয়াতি করেছে। হেমন্ত বসুর এক কথা—"অভাবে পড়ে মানুষ আমার কাছে এলে আমি কাউকে ফেরাতে পারব না।"

মন্ত্রী হয়েও তাই। মন্ত্রী হয়ে প্রথম রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মন্ত্রীদের ঘরের শীততাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রগুলি খুলে ফেলবার হুকুম দিলেন—"সব হঠাও—হাসপাতালের রোগীদের কাছে পাঠিয়ে দাও। এতকাল যদি মাঠে ময়দানে ঘুরে মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে পেরে থাকি, মন্ত্রী হয়েও তা পারব। এয়ারকুলারের কোন দরকার নেই।" মন্ত্রীর ঘর হাট হয়ে থাকে—অ্যারিস্টোক্র্যাট ও ব্যুরোক্র্যাট অফিসাররা প্রমাদ গোনেন। আপনভোলা ঢিলেঢালা মানুষটি দশটি ফ্ল্যাট পনেরজনকে দেন বটে, একটা ফ্ল্যাট তিনজনকেও দিয়ে দেন, কিন্তু অফিসারদের ফাইলটি হাতে এলেই তখন অন্য মানুষ। একটু ভুল, একটু বৈষম্য চোখে পড়লেই চেপে ধরেন। যাঁরা ভাবেন ঐ তো মেছোহাটায় বসে কাজ করছেন—এই সুযোগে ফাইলটা সই করিয়ে নিজের কাজ হাসিল করে আনি, তাঁরা কিন্তু ধরা পড়ে যান। আবার এই মানুষ দরকারমত সোজা হাজির হন গিয়ে অফিসারদের টেবিলে। একদিন দলের অন্যতম প্রবীণ নেতা ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য গিয়ে ধরলেন হেমন্ত বসুকে—"হেমন্তদা, এভাবে তো কাজকর্ম চলে না, এইভাবে রাজ্যসুদ্ধ মানুষ যদি আপনার কাছে আসে তাহলে তো আর কথা শেষ হয় না।" হেমন্ত বসু বললেন, "কানাই, আমি জনগণের মন্ত্রী, দলের নই। দলের নেতা আমি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বাইরে। এখানে নয়।" এই হলেন হেমন্তকুমার বসু। সম্ভবত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কখনও নিজের গাড়ীকে ওভারটেক করতে দিতেন না—মন্ত্রী হয়েও না।

নিঃশত্রু নায়ক হেমন্ত বসু

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে এক নবযুগের সূচনা হল। এই নবযুগের যাঁরা ভগীরথ তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন হেমন্তকুমার বসু। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ সাল—সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট হস্টেলের তিন নম্বর ঘরে যেখানে বসে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠনের প্রথম পরিকল্পনা হয়, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন হেমন্ত বসু, হুমায়ুন কবীর, ত্রিদিব চৌধুরী, জ্যোতি বসু, নলিনাক্ষ সান্যাল, সোমনাথ লাহিড়ী, অশোক ঘোষ, অমর চক্রবর্তী, যতীন চক্রবর্তী। এখানে বসেই ঠিক হয় নির্বাচনে যে দুটি ফ্রণ্ট লড়াই করেছিল তারা এক হয়ে যাবে। এই বৈঠকের পর যে যুক্ত বিবৃতিটি প্রথম প্রচারিত হয় সেই বিবৃতিতে পাঁচজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে তৃতীয় স্বাক্ষরকারী ছিলেন হেমন্তকুমার বসু।

২৫শে ফেব্রুয়ারী এক সর্বদলীয় অর্থাৎ কংগ্রেসবিরোধী বারোটি দলের বৈঠক বসল ভারত সভা হলে। এই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে অজয় মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাবিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অজয়বাবুর নাম প্রস্তাব করেন হেমন্তকুমার বসু—আর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন জ্যোতি বসু। মন্ত্রিসভা গঠিত হল। ২রা মার্চ প্রথম শপথ নিলেন ছয়জন মন্ত্রী—হেমন্তকুমার বসু তৃতীয় মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। মন্ত্রী হিসাবে হেমন্তকুমার বসু খুঁটিনাটি ব্যাপারে কখনই খুব বেশী মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর ডাক পড়ত ঠিকই।

১৯৫৫ সালের ২রা অক্টোবর অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগে দৃঢ়-সংকল্প। কে তাঁকে ফেরাবে সেপথ থেকে? সেদিন যুক্তফ্রণ্ট শরিক-দলগুলিকে দুজন ব্যক্তির উপর সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতে হয়েছিল। একজন শ্রীসতীশ সামন্ত, অপরজন শ্রীহেমন্তকুমার বসু। ২রা অক্টোবরের অনেক আগেই অজয় মুখোপাধ্যায় কী করতে যাচ্ছেন সেকথা বলেছিলেন হেমন্তকুমার বসুকে। মুখ্যমন্ত্রী একদিন হেমন্ত-

কুমার বসুকে নিজের ঘরে ডাকলেন। ডেকে বললেন, তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে চান। তিনি সি পি এম-কে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গড়তে চান। হেমন্তকুমার বসুকে বললেন, "আপনাকে থাকতে হবে আমার সঙ্গে।" ১রা অক্টোবরের আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ সম্পর্কে অনেক কানাঘুষো, অনেক বিবৃতি পাল্টাবিবৃতি প্রকাশিত হলেও হেমন্তকুমার বসু এই জটপাকানো ব্যাপারের মধ্যে নিজে কখনও থাকতেন না। বোঝবার চেষ্টা করতেন না এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার। অজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব শুনে সোজা ছুটলেন ফরোয়ার্ড ব্লক দপ্তরে। সোজা অশোক ঘোষকে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। উত্তেজনায় তখন তিনি কাঁপছেন। সরল ও সাদা পথের যাত্রী হেমন্তকুমার বসু চুপি চুপি ও আস্তে আস্তে কোন কথা বলতে এবং শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না। মন্ত্রী হয়ে যিনি কোনদিন কোন অবস্থায় ঘরের দরজা বন্ধ করেন নি—এই'দিন কিন্তু অশোক ঘোষকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। অশোক ঘোষ এসব কথা অনেক আগে থেকেই জানতেন। তিনি বলেছিলেন, "আপনি অজয়দাকে গিয়ে বলুন, আমরা এসবের মধ্যে নেই।" হেমন্ত বসু আবার দেখা করলেন অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বললেন, "নাঃ আমরা এসবের মধ্যে নেই।" সেইসঙ্গে বললেন, "তুমিও ওপথ থেকে ফিরে এসো। যদি কখনও দরকার হয় তখন যা করার সকলে মিলে একসঙ্গেই করা হবে।"

২রা অক্টোবর যেদিন রাত আটটায় অজয় মুখোপাধ্যায় রাজভবনে গিয়ে পদত্যাগ করবেন সেইদিন শেষ চেষ্টা হিসাবে অজয় মুখোপাধ্যায়কে ফেরাতে পাঠানো হল হেমন্তকুমার বসুকে। হেমন্তকুমার বসু দীর্ঘ সময় কথা বললেন অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেদিন দুজনের মধ্যে কী কথা হয়েছিল সেকথা অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে অজয় মুখোপাধ্যায় ২রা অক্টোবর পদত্যাগ করেন নি। অজয় মুখোপাধ্যায়

হেমন্তকুমার বসুকে কী চোখে দেখতেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মেলে ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হেমন্তকুমার বসুর জন্মদিনের সভায়।

ভারত সভা হল—হেমন্ত বসুর জন্মদিনের সভা। এই প্রথম খুব আড়ম্বরের সঙ্গে হেমন্ত বসুর জন্মদিন পালন করা হল। সকলে আসছেন, মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। এলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। অজয় মুখোপাধ্যায় হেমন্তকুমার বসুকে মালা পরাবেন—সব কাগজের ফটোগ্রাফাররা ক্যামেরা প্রস্তুত করে দাঁড়িয়ে আছে। অজয় মুখোপাধ্যায় হেমন্তকুমার বসুর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন—একসঙ্গে অনেকগুলো ফ্ল্যাশবাল্ব জ্বলে উঠলো—কিন্তু জ্বললো না শুধু বসুমতীর ফটোগ্রাফার বিনয় মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরার বাল্ব। কিন্তু তারপরই ঘটলো বিস্ময়কর ঘটনা। তমলুকের সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, গৈরিক বেশ ও নিরামিষভোজী ব্রহ্মচারী অজয় মুখোপাধ্যায় মাথা নীচু করে দুখানি হাত রাখলেন হেমন্তকুমার বসুর পায়ে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের পদধূলি নিলেন, আর বিনয় মুখোপাধ্যায় এবার আর ব্যর্থ হলেন না। একখানা দুর্লভ ছবি ধরে রাখলেন তাঁর ক্যামেরায়। পরদিন বসুমতী কাগজে বড় করে ছবি বেরুল—অজয় মুখোপাধ্যায় হেমন্তকুমার বসুর পদধূলি নিচ্ছেন।

যাক্—আবার যুক্তফ্রন্ট ভাঙার ইতিহাসে ফিরে আসা যাক।

১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। অধিবেশনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টকে হটাবার খুব যে একটা জোরালো চেষ্টা হয়েছে তা নয়। আসলে নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে পরাজিত কংগ্রেস তখনও নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব কাটাতে পারেনি। অতুল্য ঘোষ আর প্রফুল্ল সেনের অনুগামীদের মধ্যে মুখদেখাদেখি বন্ধ। ঘোষগোষ্ঠী বলে বেড়াচ্ছে সেনগোষ্ঠীর অপশাসনের জন্যই এই হাল হয়েছে। অপর পক্ষে সেনগোষ্ঠী অভিযোগ করছে অতুল্যবাবুই যত নষ্টের গোড়া। কংগ্রেস সংগঠনকে তাঁর প্রভাবমুক্ত করতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কংগ্রেস

ভবনের সামনে বিক্ষোভ পাল্টাবিক্ষোভ চলছে। অবস্থা এমন চরমে উঠল যে কংগ্রেস সংগঠনে কিছু রদবদল করতে হল। অতুল্যবাবু প্রদেশ কংগ্রেসের প্রকাশ্য কর্তৃত্ব থেকে সরে গেলেন, সেনগোষ্ঠী একেই জয় বলে ধরে নিয়ে উল্লসিত হলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই নিদারুণ মনোভঙ্গের আঘাত তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

কংগ্রেসের নিজের শিবিরে যখন এইরকম ছত্রভঙ্গ অবস্থা তখন যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর আঘাত হানা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেন্দ্রেও তখন কংগ্রেসের সংসদীয় দলে অন্তর্বিরোধ। ফলে কেন্দ্র থেকেও কোন চেষ্টা নেওয়া তখন সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারের অযোগ্যতার ফলেই খাদ্যসংকট যেভাবে আসছিল—তার মুখোমুখি হতেও তারা ভয় পাচ্ছিল।

তবু মার্চ মাস কিন্তু একেবারে নির্বিঘ্নে কাটলো না। বাগমারী শিখ গুরুদ্বারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে গেল তাতে যুক্তফ্রন্টবিরোধী ষড়যন্ত্রের আরো দুটি কেন্দ্র দৃষ্টিগোচর হল। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকার পুলিশের অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করেছিল। ফলে পুলিশেরও একটা অংশ বরাবরই রাজ্যের যুক্তফ্রন্টের উপর খাপ্পা ছিল। হাওড়া হাটের একটা ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জনৈক মন্ত্রীর উপরই আক্রমনোদ্যত হয়। এপ্রিল মাসে নকশালবাড়ীতে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির উগ্রপন্থী এক অংশ মুক্ত অঞ্চল গঠনের ঘোষণা করায় রাজ্যে যুক্তফ্রন্টের এক দারুণ বিপদ নেমে আসে। পিকিং রেডিও থেকে এই উগ্রপন্থীদের উৎসাহ ও উসকানী দেওয়া হতে থাকে। নকশালবাড়ীর ঘটনা একদিকে যেমন মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করল—তেমনি যুক্তফ্রন্টের মধ্যে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করল। এই সময় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের দু-একজন কলকাতায় এসে যুক্ত-

ফ্রণ্টের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের ইন্ধন যোগালেন। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ অজয় মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল ঘোষের পুরনো সহকর্মী। তিনিও কলকাতা ও দিল্লীতে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাঙনকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেন। মে মাসে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লী গেলেন। উঠলেন আচার্য জে বি কৃপালনীর বাড়ীতে। এখানে অতুল্য ঘোষ ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ ও বেশ কিছু আলাপ আলোচনা হল। মে মাসের শেষ সপ্তাহে অজয় মুখোপাধ্যায় দিল্লী গেলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রশাসন বহির্ভূত বেশ কিছু আলাপ আলোচনা করলেন। মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধী একটু সতর্ক করেই দিলেন শ্রীমুখোপাধ্যায়কে। জুন মাসে অজয় মুখোপাধ্যায় আবার যখন দিল্লী গেলেন তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের গোয়েন্দা রিপোর্ট শ্রীমুখোপাধ্যায়কে দেখালেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে অস্ত্র আইনের সম্প্রসারণের সম্মতি দিয়ে এলেন দিল্লীতে বসেই। এ নিয়ে মন্ত্রিসভায় বিরোধ গেল আরো বেড়ে। সরকারের শ্রমনীতি যুক্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীন বিরোধকে আরো একধাপ এগিয়ে দিল।

এই সময় কলকাতায় এলেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী। মন্ত্রিসভার মধ্যে মনকষাকষি, নকশালবাড়ীতে উগ্রপন্থীদের বাড়াবাড়ি, পিকিং রেডিওর উন্মাদ প্রচার—সবটা মিলিয়ে অজয়বাবুর মন বিষিয়ে উঠেছিল। সুচেতা কৃপালনীর সঙ্গে আলোচনার পরই শ্রীমুখোপাধ্যায় মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের কথা ভাবতে শুরু করেন। অজয় মুখোপাধ্যায় একটি কথা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন, অতুল্য ঘোষকে বাদ দিয়ে যদি কংগ্রেস সংগঠনকে পুনর্গঠিত করা হয় তবে তিনি নতুন কিছু ভাবতে রাজী আছেন।

যুক্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীন সংকট যখন চরমে, অজয় মুখোপাধ্যায় যখন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সুচেতা কৃপালনী প্রমুখের মাধ্যমে কংগ্রেস সম্পর্কে নরম মনোভাব গ্রহণ করেছেন, সেইসময় রাজ্যপাল হয়ে এলেন অবসরপ্রাপ্ত ঝানু আই সি এস শ্রীধরমবীর। শ্রীধরমবীর বিখ্যাত শিল্পপতি লালা শ্রীরামের নিকটাত্মীয়। ধরমবীরের আগমনের পরেই রাজ্যের যুক্তফ্রণ্ট বিরোধী চক্র-চক্রান্ত আরো দানা বেঁধে ওঠে। শ্রীধরমবীর প্রচলিত রীতি-নীতি ও নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে জেলা শাসকদের সম্মেলন ডাকলেন—আলাদা ভাবে নির্দেশ দিতে লাগলেন। জুলাই মাসে খাদ্যসঙ্কট তীব্র হয়ে উঠলো। ডক্টর ঘোষ যুক্তফ্রণ্টের অনেকগুলি শরিক দলের বিরোধিতা সত্বেও জেলা কর্ডনিং শিথিল করেছিলেন, লেভির কড়াকাড়িও হ্রাস পেয়েছিল, স্থানীয় খাদ্যসংগ্রহ অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। গ্রামের জোতদাররা ধানচাল লুকিয়ে রেখে এই খাদ্যসংকটকে এমন জায়গায় নিয়ে গেল যার ফলে চালের দাম কিলো প্রতি পাঁচ টাকা পর্যন্ত ওঠে। খাদ্য সংকট যখন চরমে তখন রাজ্যে উগ্রপন্থীদের তাণ্ডবও চরমে উঠেছে। সামগ্রিকভাবে রাজ্যে এমন একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল যাতে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা আছে বাহ্যত এটা মনে হত না। এবার "যুক্তফ্রণ্ট বিরোধী ষড়যন্ত্রের ইতিহাস" গ্রন্থ থেকে এই সময়ের কিছু বিবরণ তুলে ধরছি :—

"আগস্ট মাসে রাজ্যে খাদ্য সংকট চরমে পৌছল।

ইতিমধ্যে প্রফুল্ল ঘোষ মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তাই যতবারই পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য সরবরাহে টালবাহানার জন্য যুক্তফ্রণ্টের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করা হচ্ছিল ততবারই আগ বাড়িয়ে ঘোষ মহাশয় কেন্দ্রীয় সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট দিচ্ছিলেন। রাজ্য সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী যখন খাদ্যের দাবীতে ধরনা দেবার জন্যে দিল্লী গেলেন তখন প্রায় প্রকাশ্যেই তিনি তাঁদের উপহাস করলেন।

ফলে প্রফুল্ল ঘোষের বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভার ভিতরে ও বাইরে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিল। প্রফুল্ল ঘোষের পদত্যাগের দাবিও উঠল মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে। মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা তখন জানতেন না তাঁরা প্রফুল্ল ঘোষের হাতেই খেলছেন। তিনি তখন পদত্যাগপত্র পকেটে করেই ঘুরছেন, কোন অজুহাত পেলেই মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে ন'জন নির্দলীয় সদস্যকে তিনি দলেও টেনেছেন। তাঁরা ১০জন মিলে যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে গেলে মন্ত্রিসভার পতন অবধারিত। আর সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদটা কংগ্রেসীরা কি আর তাঁকে দেবে না?

ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রান্তি দলের শাখা গঠন নিয়ে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কবীর গোষ্ঠীর বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছে। কবির গোষ্ঠী বাংলা কংগ্রেসের সংগঠন হিসেবে আই-এন-টি-ইউ-সি'র কালী মুখার্জীর সহায়তায় একটি কমিটি খাড়া করে তাকেই ভারতীয় ক্রান্তি দলের পশ্চিম বাংলা শাখা বলে দাবি করতে থাকে। কবিরের উদ্দেশ্য এক ঢিলে দুই পাখি মারা—ক্রান্তিদল থেকে অজয় মুখার্জীকে দূরে রাখা এবং তথাকথিত বি-কে-ডি গোষ্ঠীর সাহায্যে যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটিয়ে প্রভুর কর্ম সমাধা করা।

এই ভাবে একদিকে যখন আধা-প্রকাশ্য আধা-গোপন ষড়যন্ত্র চলছে ঠিক তখনই আগস্ট মাসে এমন দুটি ঘটনা ঘটল যার ফলে যুক্তফ্রন্টের সংকট চরমে উঠল।

২রা আগস্ট রাইটার্স বিল্ডিংসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জীকে সরকারী কর্মচারীরা অপমান করে এবং ১৪ই আগস্ট কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলের 'বয়'রা মুখ্যমন্ত্রীকে খাদ্য পরিবেশন করতে অস্বীকার করে।

মুখ্যমন্ত্রী এই সব ঘটনায় ব্যথিত হয়ে শয্যা গ্রহণ করেন। শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী তখন ইন্দিরা গান্ধীর দূত হয়ে অজয় মুখার্জীর

পাশে বসে তাঁর কান ভাঙাতে শুরু করলেন। প্রাক্তন মুখ প্রফুল্ল সেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌরীন মিশ্রকে পাঠালেন অজয়বাবুর মনকে দুর্বল করে দেবার জন্য। সিকিম সীমান্তে চীনা আক্রমণ, নকশালবাড়ি, মাও সে তুঙ-এর ছবি নিয়ে শোভাযাত্রা, ঘেরাও, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে অশান্তি ইত্যাদির কথা বলে তাঁকে কংগ্রেস সমর্থনে অ-কমিউনিস্ট সরকার গঠনের জন্য প্রায় নিমরাজী করে ফেলা হল। শ্রীমুখার্জি ভেঙ্গে পড়লেন।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকটের সুরাহা করার অজুহাতে দিল্লী গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী ডাঃ ঘোষ সুচেতা কৃপালনীর বাড়ীতে হরেকৃষ্ণ মহতাব, হুমায়ুন কবীর, আচার্য কৃপালনী, এস এন দ্বিবেদী, সুরেন ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটাবার জন্য পৃথক এক চক্রান্ত করতে থাকলেন। কেন্দ্র এবং কংগ্রেস পরিকল্পনা করল যদি অজয়বাবুকে দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে না ভাঙা যায় তাহলে ডঃ ঘোষকে কাজে লাগান হবে।

অতঃপর সেপ্টেম্বর মাসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন স্বয়ং মাঠে নামলেন। গোপনে তিনি শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজ্যপাল ধর্মবীর দুজনকে এক ভোজসভায় ডাকলেন এবং সেখানে শ্রীমুখার্জির পদত্যাগ ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবসান ঘটাবার চক্রান্ত পাকা হল। অজয়বাবু তাঁর একটি শর্তে দৃঢ় রইলেন। তা হল কোয়ালিশনের আগে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস থেকে অতুল্য-চক্রকে বিতাড়িত করতে হবে। কারণ অতুল্য-চক্রের বিতাড়নের দাবিতেই তিনি একদিন কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেস গঠন করেছিলেন।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকেই প্রফুল্ল সেন ও অতুল্য ঘোষের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়েছিল। নির্বাচনে পরাজয়ের পর তা খোলাখুলি বিরোধে পরিণত হল। রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠন অতুল্য

ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের অনুচরদের মধ্যে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শ্রীপ্রফুল্ল সেন দেখলেন এই সুযোগে তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারবেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আদা কাঁচকলার সম্পর্ক জানাই ছিল। শ্রীসেন অতএব পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খতম করার জন্য এবং অজয় মুখার্জির শর্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে অতুল্য-চক্রকে বাদ দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠনের পরামর্শ দিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তৎক্ষণাৎ অতুল্যবিরোধী বলে সুপরিচিত শ্রীগুলজারিলাল নন্দকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সংস্কারের জন্য কলকাতায় পাঠালেন।

শ্রীনন্দ কলকাতায় আসছেন খবর পেয়ে শ্রীপ্রফুল্ল সেন একাধারে কংগ্রেস সংগঠনের উপর তাঁর নিজস্ব প্রভাব দেখাবার জন্য, অন্য-দিকে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে সাহস যোগাবার জন্য ১৮ই সেপ্টেম্বর 'খাদ্য অভিযান' সংগঠিত করলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষের অনুচরদের অধি-কাংশই বোধগম্য কারণে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর ২৪শে সেপ্টেম্বর শ্রীনন্দ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অ্যাডহক কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ দিল্লী থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ করে জানালেন যে, শ্রীনন্দের কাজ কংগ্রেসের সাংগঠনিক ধারার বিরোধী। কারণ ও ধরনের অ্যাডহক কমিটি গঠন ঘোষণার ক্ষমতা একমাত্র ওয়ার্কিং কমিটির অথবা কংগ্রেস সভাপতিরই আছে। অন্য কারোর নেই।

এদিকে শ্রীনন্দ ও শ্রীসেনের মধ্যে কথাবার্তার পর স্থির হয় যে ২রা অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিনে শ্রীমুখার্জি পদত্যাগ করবেন এবং ইতিমধ্যে শ্রীনন্দ মাদ্রাজে কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অ্যাডহক কমিটি গঠনের ঘোষণা জারী করতে রাজি করবেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর অজয়বাবু দিল্লীতে গেলেন এবং সেখানে প্রধান

মন্ত্রী ও অন্যান্যরা তাঁকে এই চক্রান্তের জালে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ফেললেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর শ্রীমুখার্জি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলে সারা সহরে একটা থমথমে ভাবের সৃষ্টি হয় এবং শ্রীমুখার্জি পদত্যাগ করতে চলেছেন এই মর্মে গুজব রটে যায়। কিন্তু কোথাও এ সংবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। শ্রীমুখার্জিও এ সম্পর্কে হাঁ অথবা না ভালমন্দ কিছুই বলতে রাজী হন না।

এদিকে গুজব ক্রমশ বাড়তে থাকে। যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে অস্বস্তি দেখা দেয়। অবশেষে ৩০শে সেপ্টেম্বর অজয়বাবুর দাদার শ্রাদ্ধবাসরে সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগপত্র পেশ না করার জন্য অনুরোধ জানান।

কদিন আগে থাকতেই যুক্তফ্রণ্টের অনেক নেতা এসে কথা বলছিলেন হেমন্ত বসুর সঙ্গে। সকলের ধারণা হেমন্তদা অজয়বাবুকে ধরলে অনেক বেশী কাজ হবে। অশোক ঘোষ ও বিশ্বনাথ মুখার্জি দুইজনেই বললেন, "হেমন্তদা, আপনি একবার কথা বলুন অজয়দার সঙ্গে।" প্রথমে তিনি রাজী হননি। হেমন্তদা বললেন, "অজয়কে আমি কি বলবো, তা ছাড়া জান তো এই সব কথাবার্তা বলায় আমি খুব পটু নই।" তবু হেমন্ত বসুকেই কথা বলতে হ'ল অজয় মুখার্জির সঙ্গে। মহাকরণে অতি নিভৃতে দুজনে বসলেন। আলোচনা হ'ল দীর্ঘ সময়। অজয়বাবু বললেন, "আমি আর পারছি না।"

হেমন্তবাবু বললেন, "যদি যেতে হয় তবে তুমি একা কেন, আমরা সকলে যাব—এক সঙ্গে এসেছি এক সঙ্গে যাব। একা কিন্তু তুমি কিছু কোরোনা।"

১লা অক্টোবর বাংলা কংগ্রেস ও সংযুক্ত গণফ্রণ্টের সদস্যরা পৃথক পৃথক ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বোঝাতে থাকেন। অতঃপর অজয়বাবুর বহু সংগ্রামের সাথী ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা শ্রীসতীশ সামন্ত (এম পি) তাঁকে এ কাজ থেকে নিরস্ত হবার জন্য

পীড়াপীড়ি করেন। মুখ্যমন্ত্রী পরিবারের বিভিন্ন সদস্যও তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেন।

এই অবস্থায় অজয়বাবু অবশেষে সমস্ত ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনার জন্য বাম কমিউনিস্টদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজী হলেন। বৈঠকে বাম কমিউনিস্ট নেতারা অজয়বাবুর কাছে নিজেদের পার্টির কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে তাঁকে যে ভুল বোঝানো হয়েছে তা জানিয়ে দেন এবং ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অজয়বাবু তাঁর মত পরিবর্তন করলেন।

২রা অক্টোবর। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জয়ন্তী উৎসব। সারাদিন ধরে চারিদিকে রামধুনের সুর শোনা যাচ্ছে। কিন্তু যাদের সেদিন সবচেয়ে বেশি অভিভূত হবার কথা সেই কংগ্রেস নেতাদের কিন্তু এতে কোন উৎসাহ, কোন আকর্ষণ নেই।

কোচিনে নৌবাহিনীর বার্ষিক মহড়ার অনুষ্ঠানে যোগ দেবার কার্যসূচী বাতিল করে দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচ্যবন রেডিও খুলে বসে আছেন একটি বিশেষ সংবাদ শোনার জন্য। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গুজরাট সফরে বেরিয়েছিলেন—কান পেতে আছেন আকাশবাণী থেকে সেই বিশেষ ঘোষণাটির জন্য। সদাচারী শ্রীনন্দ টেলিফোনের সামনে বসে। কলকাতায় জরুরী পি পি লাইন বুক করা হয়েছে প্রফুল্ল সেন ও ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নামে।

এদিকে কলকাতায়, চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে সন্ধ্যা ৭টায় রাজ্যের সংসদীয় কংগ্রেস দলের এক জরুরী বৈঠক ডাকা হয়েছে। প্রায় ৮টা পর্যন্ত কংগ্রেস ভবনের নেতারা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের ঠাণ্ডা ঘরে বসে জটলা করছেন। কেউ কেউ ইতস্তত ঘর-বার করছেন। ৮টা ৫ মিনিটের সময় শ্রীবিজয় সিং নাহার উত্তেজিত ভাবে প্রফুল্ল সেনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে প্রবেশ করেছেন।' পরক্ষণেই তিনি ক্ষিপ্রবেগে সভাকক্ষের দিকে চলে

গেলেন। প্রফুল্ল সেন মহাশয় উপস্থিত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বললেন, একটু পরেই খবর দিচ্ছি !…জরুরী বৈঠক উপলক্ষে যে খানা পিনার ব্যবস্থা হয়েছিল, ইতিমধ্যে সংসদীয় সদস্যরা তাঁর সদ্ব্যবহার শুরু করে দিলেন। যে কোন মুহূর্তে 'খবরটা' আসবে, এই আশায় কংগ্রেস ভবনে একটা চাপা উল্লাসের আবহাওয়া বিরাজ করছে।

'খবরটা' এল। রাত ১০টা ৫ মিনিটে শ্রীবিজয় সিং নাহার (পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী) প্রফুল্লবাবুর ঘর থেকে বিরস বদনে এসে হতাশার সুরে সাংবাদিকদের বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন নি।'…আকাশবাণীতে বিশেষ ঘোষণা প্রচারিত হল না। নেতারা রেডিও বন্ধ করে দিলেন।

সাংবাদিকরা প্রফুল্ল সেনের কাছে ছুটলেন। সেন মহাশয় বললেন, 'আমার কাছে কোন খবর নেই।' এরই মধ্যে দিল্লী থেকে নন্দজীর টেলিফোন এসে গেছে। প্রফুল্লবাবুর কাছে শ্রীনন্দ খবরটা জেনেছেন, এবং বেশ কিছু কড়া কথারও আদান প্রদান হয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, সেন মহাশয় ও তরুণকান্তি ঘোষ বিমর্ষ-ভাবে ঠাণ্ডা ঘরের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছেন। অন্য সবাই একে একে বিষণ্ণ বদনে সভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সাংবাদিকরা রাত ১১টা অবধি রাজভবনের ফটকে অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল মুখ্যমন্ত্রী পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ী চলে গেছেন। সাংবাদিকেরা ছুটলেন বেলভেডিয়ারে তাঁর বাড়ীর দিকে। অজয়বাবু সহাস্যে জানালেন, 'না, জনসাধারণের কাছে আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি, আমি পদত্যাগ করিনি।'

এইভাবে ষড়যন্ত্রের এক অধ্যায়ের উপর যবনিকা পড়ল। সেদিন যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রিসভার খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে অজয়বাবুর পদত্যাগ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, পর্দার অন্তরালে

কি ঘটছে না ঘটছে তা তাঁর জানা নেই। কিন্তু একক বৃহত্তম দল কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কেবল মাত্র তার সমর্থন নিয়ে সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা গঠনের তিনি বিরোধী। তিনি বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে অকংগ্রেসী দলের কোয়ালিশনে সরকার গঠিত হলে তিনি আপত্তি করবেন না। কিন্তু সংখ্যালঘু সরকার গঠনে তাঁর কোন উৎসাহ নেই।

হুমায়ুন কবীর কিন্তু সেদিন অজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ সম্বন্ধে 'সুনিশ্চিত' ছিলেন। সেদিনই সন্ধ্যায় ওড়িশার প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ও ভারতীয় ক্রান্তি দলের অন্যতম হোতা ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব কলকাতায় এসে পৌঁছলেন আর ভুবনেশ্বরে এস এস পি নেতা রবি রায় এক বিবৃতিতে জানালেন, হুমায়ুন কবীর গুলজারিলাল নন্দর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা করছেন।

পরদিন (৩রা অক্টোবর) থেকেই যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নতুন চক্রান্ত আরম্ভ হল। হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস ও যুক্তফ্রণ্ট বিরোধী ক্রান্তি গোষ্ঠীর কোয়ালিশন সরকার গঠনের উদ্যোগ শুরু হল। এদিন রাত ১০টায় হুমায়ুন কবীর ও ডঃ মহতাব রাজ্যপাল ধরমবীরের সঙ্গে দেখা করেন। ধরমবীর কবীর সাহেবের পুরনো বন্ধু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকা কালে ধরমবীর-পুত্র ইন্দুবীরকে ইণ্ডিয়ান অয়েলে চাকরী দিয়েছিলেন কবীর। অতএব সুবিধেই হল। প্রায় দু'ঘণ্টা তাঁদের আলোচনা চলে। সকালে কবীর ও মহতাবের সঙ্গে প্রফুল্ল সেনেরও এক বৈঠক হয়। তারপর বাংলা কংগ্রেসের অজয়বাবুর নেতৃত্ব-বিরোধী সদস্যরা মধ্য কলকাতার এক দফ্‌তরে মিলিত হলেন। এই সদস্যরা আহত মর্যাদার মনোভাব প্রকাশ করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করেন যে, "মন্ত্রিসভা থেকে কমিউনিস্টদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হঠাতে হবে। নইলে কমিউনিস্টরা দেশকে খেয়ে ফেলবে।" তাঁরা কংগ্রেসের

সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা আবার রাত ৮টায় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোস্টেলে হুমায়ুন কবীরের ঘরে এক সভায় মিলিত হন। ডঃ ঘোষ, কবীর ও মহতাব রাজভবনে ডঃ ঘোষের বাসগৃহে আর এক দফা আলোচনায় বসেন। ডঃ ঘোষ এদিন টেলিফোনযোগে দিল্লীতে নন্দজীর সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন। আলোচনা শেষ হবার পর কবীর ও মহতাব দেখা করেন রাজ্যপালের সঙ্গে। এই দিনই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের অতি উচ্চপদস্থ কয়েকজন অফিসার কলকাতায় আসেন। এঁদের উপস্থিতিতে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর জন্য কেন্দ্রীয় চক্রান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেন্দ্রও পশ্চিম বাংলাকে রক্তস্নান করানোর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, ৬ই অক্টোবর দিল্লীতে তার একটি খবর পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর একটি রিপোর্ট তৈরী করে রেখেছিলেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা উচ্ছেদের চক্রান্তের এই রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছিল, এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে যদি কোন ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান হয় তবে তা দমন করার জন্য পুলিশ ও মিলিটারির তাণ্ডব চলবে, এবং পশ্চিম বাংলার বহু লোক নিহত হবে।

সমস্ত চক্রান্ত যখন চারিদিকে জানাজানি হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে, তখন হুমায়ুন কবীর একদিন (৫ই অক্টোবর) যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যকে জানালেন যে, ডঃ ঘোষ ও তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য ষড়যন্ত্র করছেন বলে ডান ও বাম কমিউনিস্ট পার্টি যে অভিযোগ এনেছে তা সর্বৈব মিথ্যা। কবীর সাহেব পরদিনই দিল্লী রওনা হন। ৭ই অক্টোবর ভূপালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, "পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে কোন সরকার নেই।" রাজনৈতিক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা

কবীর বলেন তাঁর ক্রান্তি দল কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করবে, এবং আগামী এক দশক ধরে কেন্দ্র ও রাজ্যে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পশ্চিম বাংলার অবস্থার অবনতি হলে, কবীর সাহেব ছ'মাসের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন পছন্দ করবেন বলে জানান। তারপর মধ্যবর্তী নির্বাচন হলে তাঁর ক্রান্তিদল একাই লড়বে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন জেলা শাসকদের কাছে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মতো গুরুত্ব দিয়ে ধানচাল সংগ্রহের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য এক নির্দেশ দিলেন। ১৭ই অক্টোবর জানা গেল হুমায়ুন কবীর বাংলা কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করার জন্য চিঠি তৈরী করেই রেখেছেন। ওই দিনই বাংলা কংগ্রেসের নলিনাক্ষ সান্যাল, হরেন মজুমদার, গঙ্গাধর প্রামাণিক, আমির আলি মোল্লা, চণ্ডীপদ মিত্র, হৃষীকেশ হালদার ও জয়নাল আবেদীন সহ ন'জন সদস্য দলত্যাগ করলেন। এঁরা কিন্তু ২৩শে অক্টোবর যুক্তফ্রণ্টের অন্যতম আহ্বায়ক সুধীন কুমারের কাছে এই মর্মে চিঠি দিলেন এঁদেরকে যেন যুক্তফ্রণ্টেরই পৃথক শরিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

১৮ই অক্টোবর হুমায়ুন কবীর দিল্লীতে বসে পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন করার জন্য ওকালতি শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, "গত সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিম বাংলার জনগণ রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষে রায় দিয়েছে। পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার টিকে থাকতে পারে না, এবং যে কোন কারণেই হোক, যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পক্ষে জনগণ রায় দিয়েছে বললে সত্যের অপলাপ হবে"—বলে তিনি ঘোষণা করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করার ব্যাপারে তিনি জোর দেন। যেহেতু ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে সকলে পছন্দ করে না সেই জন্য অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। অজয়বাবু যোগ্য

ব্যক্তি বলে মুখ্যমন্ত্রী হননি—ইত্যাদি নানা মন্তব্য সেদিন করেছিলেন কবীর সাহেব। তাই ডঃ ঘোষকে সামনে রেখে কবীরের যুক্তফ্রন্ট বিরোধী অভিযান। আর এই অভিযানের পেছনে সমস্ত জোতদার, মজুতদার ও শিল্পপতিদের সংঘবদ্ধ শক্তি।

১৯শে অক্টোবর যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিরাজস্ব বিভাগ সিদ্ধান্ত নিল যে মাঠ থেকে ধান তোলার সময় জোতদার-বর্গাদার বিরোধ দেখা দিলে পঞ্চায়েতের খামারে ধান তোলা হবে। পরের দিনই যুক্তফ্রণ্টের এক সভায় ঠিক হয় যে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যথারীতি কাজ চালিয়ে যাবে, জোতদাররা প্রকাশ্যেই আমন সংগ্রহকে বানচাল করার যে চক্রান্ত চালাচ্ছে ও হুমকি দিচ্ছে তার মোকাবিলা করার জন্য সরকার যদি দৃঢ় ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে সংগ্রহ নীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা আছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই দিনই মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে রেলমন্ত্রী শ্রী পুনাচার এক বৈঠক হয় কলকাতায়। সেখানে ঠিক হয় যে, রেলে চালের চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর ২১শে অক্টোবর লেভি দেওয়ার আগে ধান বিক্রী বা দাদন নিষিদ্ধ করে মন্ত্রিসভায় এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সর্বপ্রকার কঠোর ব্যবস্থা যখন পাকা, তখন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ও জোতদারদের মিলিত উদ্যোগ শুরু হল। রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা ও জোতদাররা সম্মিলিত ভাবে পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে 'কৃষি-সেনা' গড়ে তুলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমন সংগ্রহ নীতি ব্যর্থ করে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হল। সঙ্গে সঙ্গে তারা ভাগচাষীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্তও চালাতে শুরু করল। কৃষি সেনারা ব্যাপকভাবে গ্রামে গ্রামে চাষীদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করল যে, শহরের বাবুদের জন্য এককণা ধানও দিও না। সরকারী লোকেরা

ধান নিতে এলে তাদের মেরে গ্রাম থেকে বের করে দাও। ভয় নেই, জোতদারদের লাঠিয়ালরা তোমাদের পাশেই থাকবে। ২৪ পরগণার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে, কংগ্রেস ও জোতদাররা মিলিতভাবে গ্রামে গ্রামে সভা করে লেভি না দেবার জন্য সকলকে উত্তেজিত করতে শুরু করল। গ্রামে গ্রামে কুখ্যাত সমাজবিরোধী ব্যক্তি এবং লাঠিয়ালদের নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনীও গঠন করা হল। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় সংগঠন তৈরী হয়ে গেল। এই সব প্রতিরোধ বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য শুধু গ্রাম নয়, শহরাঞ্চল থেকেও অর্থসংগ্রহ করা হল।

'২৪শে অক্টোবর যুক্তফ্রণ্টের এক সভায় ফ্রন্ট নেতারা শ্রমিকদের প্রতি মালিকপক্ষের প্রতিশোধমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, যেহেতু শ্রমিক-মালিক লড়াইয়ে শ্রমিকপক্ষ দুর্বল, যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সহানুভূতি তাই শ্রমিকের পক্ষেই থাকবে। আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন বলে শিল্পপতি ও কংগ্রেস নেতারা যে চীৎকার শুরু করেছেন সে বিষয়ে কেউ কেউ বলেন যে—আইন শুধু শ্রমিকদের জন্য নয়; মালিকদের জন্যও; কিন্তু মালিক পক্ষ বহু ক্ষেত্রেই আইন ভঙ্গ করেছেন। শ্রমিকদের আন্দোলনে কোথাও কোথাও কিছু বাড়াবাড়ি হলেও সেটাই বর্তমান শিল্প-সমস্যার একমাত্র কারণ নয়।...এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে ধান তোলার পর সর্বপ্রথম লেভির ধান দেওয়া বাধ্যতামূলক করার এবং বিরোধের ক্ষেত্রে বর্গাদারদের জোতদারের ভাগ সরকারী হেফাজতে জমা দেবার অধিকার দিয়ে এক অর্ডিন্যান্স জারী করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর মন্ত্রিসভার সঙ্গে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের এক আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ধান চাল সংগ্রহের লক্ষ্য এবার পূর্ণ করতেই হবে। এজন্য প্রয়োজন মতো যে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেই সরকারের দ্বিধা করা চলবে না। ধান চাল সংগ্রহ ও কর্ডনের জন্য

কেন্দ্রীয় পুলিশ নিয়োগ করা হবে। আটক আইন প্রবর্তন করা হবে।…ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ তখন বলেছিলেন, খাদ্যকে সমস্ত দলীয় ও উপদলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। · ধান চাল সংগ্রহ নিয়ে অক্টোবর মাসের শেষ মন্ত্রিসভা বৈঠকে ডঃ ঘোষ কর্ডন তুলে দেবার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, ১৮ একর পর্যন্ত জমির মালিকদের লেভী-মুক্ত করা হোক। মন্ত্রিসভায় তিনি তাঁর প্রস্তাব ভোটে দিতে বলেন। মন্ত্রিসভার ১৯ জন সদস্যের মধ্যে সেদিন ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন। ডঃ ঘোষের প্রস্তাব সমর্থন করেন মোট চারজন (তাঁর মধ্যে তিনি নিজে একজন)। সভাশেষে ডঃ ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার কাছে কোন খবর নাই—আই ক্যানট্ ম্যানুফ্যাকচার স্টোরি ফর ইউ'। একগাল হেসে তিনি হাত নেড়ে বলেন, 'মন্ত্রিসভায় যা ঠিক হবে, আমারও তাই মত'।

এদিকে জব্বলপুরে এ-আই-সি-সি অধিবেশনে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের অ্যাড্হক্ কমিটির সমাধি হল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস শুদ্ধিকরণের পুরোহিত প্রফুল্ল সেনকে বুঝিয়ে দিলেন যে—অ্যাডহক্ নিয়ে মিছিমিছি হল্লা করে কংগ্রেসের ভিতরের বিবাদ বাড়ানো আদৌ বিজ্ঞতা বা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। বরং কংগ্রেসের এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো দরকার। হুমায়ুনের কাছ থেকে কথা পাওয়া গেছে, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই বাংলাদেশে এক বিরাট রাজনৈতিক সংকট দেখা দেবে। সেই সংকটের সুযোগ কংগ্রেসকে নিতেই হবে। হুমায়ুন কবীর ২৯শে অক্টোবর কলকাতায় ফিরে এলেন। প্রফুল্ল সেন ফিরে এলেন পরের দিন। অতি সুকৌশলে অ্যাডহক সংক্রান্ত বিবৃতির ধূম্রজাল ছড়িয়ে রেখে তিনি যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পরিকল্পনাটি গোপন রাখলেন। · কবীরের প্রতিজ্ঞা, এবারের চক্রান্ত সফল করতেই হবে। জুলাই মাসের ষড়যন্ত্র সফল না হওয়ার অন্যতম কারণ তিনি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী হবার স্বপ্ন

দেখেছিলেন। কিন্তু এবারে তাঁর কেন্দ্রীয় সরকারে মন্ত্রিত্বের চাকরী ঠেকায় কে!

প্রফুল্ল সেন ও ডঃ ঘোষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার গুরুদায়িত্ব কবীর সাহেব নিজেই নিলেন। নিজেদের উদ্দেশ্য যাতে বাইরে ফাঁস না হয়ে যায় সেজন্য কবীর-ঘোষ চক্র ক্রান্তিদল সম্পর্কে নানা বিবৃতি ও জল্পনার একটা প্লাবন সৃষ্টি করলেন। চক্রান্তকারীদের সকলেরই কথাবার্তায় এমন একটা ভাব প্রকাশ পেল যাতে মনে হয় যে, প্রফুল্ল সেনের যেন কালীপূজোর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা ছাড়া অন্য কোন কাজই নেই; ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ যেন দেশের মানুষের খাদ্য চিন্তাতেই মগ্ন; আর কবীর সাহেব যেন ক্রান্তিদল ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারছেন না। অথচ তলে তলে সমস্ত কাজই প্রায় সমাপ্ত — কী করে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংকট সৃষ্টি করা যাবে, কী করে আশু ঘোষের বাড়ীতে টাকা ও স্ফুর্তির সামগ্রী ছড়িয়ে যুক্তফ্রণ্টের লোভী সদস্যদের আটকে রাখা হবে, কী করে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটানো যাবে এবং জোতদার মহাজন মজুতদার ও শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষিত হবে।

এদিকে মন্ত্রিসভা শিল্পে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য, কলকারখানা খোলার জন্য শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে কথা বলছে। ধানচাল সংগ্রহের ব্যাপারেও সমস্ত রকম ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। ২৭শে অক্টোবর ঘোষণা করা হয় যে আমন সংগ্রহের জন্য উদ্বৃত্ত এলাকায় কর্ডনিং দায়িত্ব জেলা শাসকদের। যে কোন ব্যক্তি ধান চাল সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করবে, তার বিরুদ্ধেই—সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ করা হবে বলে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০শে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে বিভিন্ন জেলায় সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশ পাঠানো হয় আটক আইন প্রয়োগ

করার জন্য। স্বরাষ্ট্র দপ্তর আশঙ্কা প্রকাশ করে, ধান সংগ্রহের ব্যাপারে কায়েমী স্বার্থের প্রতিরোধ তীব্রতর হতে পারে এবং সেজন্য বেশ কিছু লোককে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হবে।

৩১শে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে এক জরুরী বার্তা পাঠিয়ে ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার জন্য এক বিশেষ ক্ষমতা দাবী করে, রেল ইয়ার্ডে হাজার হাজার মন ডাল খালাস না করে ফেলে রেখে ব্যবসায়ীরা বাজারে যে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, তার মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে ভারত রক্ষা আইনের অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার চেয়ে পাঠায়।···ঐদিন সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতি বানচাল করার জন্য গ্রামাঞ্চলে কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে যে প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে সে সম্বন্ধে ডঃ ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ এ ব্যাপারে এখনো যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছে না।' অথচ মন্ত্রিসভার বৈঠকে যখন মেদিনীপুরে ধান চাল সংগ্রহের দায়িত্ব সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় নিতে চেয়েছিলেন, তখন ডঃ ঘোষ সেই বৈঠকে বসেই মন্তব্য করেন যে বিশ্বনাথের ওপর দায়িত্ব দিলে 'হি উইল মেক এ মেস অব দ্য হোল থিং।'···

ডঃ ঘোষের চোখমুখ দেখে বা কথা শুনে কোনদিন টের পাওয়া যায়নি যে তাঁর মতো "সত্যবাদী", গান্ধীবাদী ও অহিংসা নীতির ধ্বজা-ধারী লোক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খুন করার জন্য ছুরিতে সান দিচ্ছেন (অথচ রাজনৈতিক জীবনে পুনর্বাসনের জন্য ডঃ ঘোষের বামপন্থী দলগুলির কাছে চিরঋণী থাকা উচিত ছিল। সত্যি কথা বলতে কি—কিছুদিন আগেও সাধারণ লোক জানতই না ডঃ ঘোষ বেঁচে আছেন কিনা)। অবশ্য একটা কথা সকলেই জানত যে ডঃ ঘোষ লেভী, কর্ডন, রেশনিং ব্যবস্থা, ধান চালের ব্যবসায় রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদির বিরোধী। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় থাকাকালীন তিনি কেবলমাত্র মার্ক্সবাদীদের

পার্টি সম্বন্ধে কয়েকবার বলেছেন যে, যারা প্রকাশ্যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের ও খাদ্যনীতির নিন্দা করে তাদের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করা উচিত। একদিন আবার তিনি হাসতে হাসতে একথাও বলেন যে, যারা আমার নিন্দা করে তারা বোধহয় অহিংসার নীতিতে আমার নিষ্ঠা কতখানি তারই পরীক্ষা করে।

১লা নভেম্বর ছিল কালীপূজো। এদিন যুক্তফ্রন্টের এক বৈঠক ছিল। খাদ্য সংগ্রহ নীতির জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে জেলায় জেলায় খাদ্য সংগ্রহের কাজ সম্পর্কে রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাত্যহিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রণ্ট সেদিন মন্ত্রিসভাকে একটি সাবকমিটি গঠন করার জন্য সুপারিশ করেন। ২রা তারিখে মন্ত্রিসভায় আমন সংগ্রহের নীতি চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হয়। এদিন খাদ্য সাব-কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভায় উঠতেই ডঃ ঘোষ উত্তেজিত হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে যান।···

৩রা নভেম্বরের দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।······দার্জিলিং থেকে রাজ্যপাল ধর্মবীর কথা বলতে চান।···রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ পশ্চিমবাংলার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ তাঁর পদত্যাগপত্র সরাসরি রাজ্যপালের কাছে এক বিশেষ দূত মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। (পরে একদিন বিজয় সিং নাহার কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিকদের বলেন, "আপনারা তো খুব বড় সাংবাদিক, খোঁজ নিন তো সত্যি ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র রাজ্যপালের কাছে পৌঁছেছিল কিনা!" মৃদু হেসে তিনি পরক্ষণেই বললেন, "রাজ্যপাল অবশ্য অজয়বাবুকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন যে তিনি ডঃ ঘোষের পদত্যাগ-পত্র পেয়েছিলেন।") রাজ্যপাল সেদিন টেলিফোনে মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন যে, "আমি কালই (৪ঠা নভেম্বর) কলকাতায় ফিরছি, আপনার সঙ্গে কথা বলব।"······সেদিন রাতেই কলকাতায় জানা

গেল যে ডঃ ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে আরও ১৮জন এম-এল-এ যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন। তাঁরাও নাকি তাঁদের যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের সংবাদ রাজ্যপালকে জানিয়েছেন।…সেদিন গভীর রাতে রাজ্যপালের নির্দেশে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে সমস্ত জেলা কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। আশঙ্কা ছিল, ডঃ ঘোষের পদত্যাগের ফলে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হল সেই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

রাতে ডঃ ঘোষের পদত্যাগের খবর শুনেই কিছু সাংবাদিক ছুটলেন ডঃ ঘোষের রাজভবনের কোয়ার্টারে, বেলভেডিয়ারে মুখ্যমন্ত্রীর বাসস্থানে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডঃ ঘোষ তখনও তাঁকে কিছু জানান নি ; ডঃ ঘোষের কোন চিঠিও তিনি পাননি। রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলার আগে তিনি ডঃ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না বলে জানান। মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করলেন, "তবে ডঃ ঘোষের অন্ততঃ একটা টেলিফোন করে আমাকে জানান উচিত ছিল যে তিনি পদত্যাগ করেছেন।"…ডঃ ঘোষ সেদিন রাত্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেন নি। সাংবাদিকরা "এক মিনিটের জন্য" ডঃ ঘোষের সঙ্গে দেখা করার জন্য বারবার খবর পাঠান। প্রথমে জবাব এল, দেখা হবে না, তিনি ব্যস্ত। মিনিট কয়েক পরে আবার জবাব এল, দেখা হবে না, তিনি শুয়ে পড়েছেন। রাত তখন দশটা বেজে দশ মিনিট। পশ্চিমবাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ উপানন্দ মুখোপাধ্যায় ডঃ ঘোষের কোয়ার্টার থেকে নেমে এলেন। সাংবাদিকদের দেখে তিনি চমকে উঠলেন। "কি খবর মিঃ মুখার্জী,—আপনি এত রাতে এখানে, কী ব্যাপার ?" আই-জি উত্তর দিলেন—"বিজয়ার পর দেখা হয়নি, তাই দেখা করতে এসেছিলাম।"…

ডঃ ঘোষের পদত্যাগের খবরটা দুদিন চাপা ছিল। কালীপূজোর দিন বিকেল পৌনে ৩টার সময় ডঃ ঘোষ তাঁর কোয়ার্টারে রবি চৌধুরীর

হাতে পদত্যাগপত্রটি দেন গ্যাংটকে সফররত রাজ্যপালের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। রবি চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন রণধীর বর্মন।

এঁরা চিঠিটা নিয়ে চলে যাবার পর ডঃ ঘোষ দুজন সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তাদের সব প্রশ্নেরই জবাব তিনি এড়িয়ে এড়িয়ে যান।······পদত্যাগপত্রটি রবি চৌধুরীই নিয়ে যায় রাজ্যপালের কাছে। রবি চৌধুরীর ওপর ডঃ ঘোষের অসীম আস্থা।··· বেশ কিছুদিন আগে পাকিস্তানী গুপ্তচর অভিযোগে মোহিত চৌধুরী, সুনীল দাস ও আরও একজনের নামে মামলা হয়েছিল—অনেকেরই তা বোধ হয় স্মরণ আছে। ঐ দলের আর একজন এই রবি চৌধুরী।

৪ঠা নভেম্বর রাজ্যপাল কলকাতায় ফিরে এলেন। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কার্শিয়াং থেকে, সহকারী নেতা বিজয় সিং নাহার রাজগীর থেকে আগের দিন রাত্রেই ফিরে আসেন। পাটনায় সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে আর এক প্রস্থ আলাপ আলোচনা করে হুমায়ুন কবীরও এসে গেলেন। ৪ঠা তারিখ রাত্রে জাহাঙ্গীর কবীর রানীগঞ্জ থেকে ফিরে এসে সাংবাদিকদের জানালেন, তিনি যুক্তফ্রণ্টেই আছেন।···সেদিন রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী (ডঃ ঘোষ) ও আরও অনেকের সঙ্গেই বিভিন্ন বৈঠকে মিলিত হন। ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র সেদিন গৃহীত হল না। কারণ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় সকলের সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় চাইলেন। রাত্রে যুক্তফ্রণ্টের এক জরুরী বৈঠকে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়।

ডঃ ঘোষ সহ ১৯ জন এম এল এ রাজ্যপালকে এদিন লিখিত ভাবে জানান—"আমরা এ সরকার সমর্থন করি না! নতুন কোয়ালিশন গঠন করতে চাই, যাতে শুধু গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সদস্যরাই

থাকবেন।" যুক্তফ্রন্টত্যাগী সদস্যরা এবং রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চেঁচামেচি শুরু করলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘু হয়ে গেছে—এ সরকারকে এই মুহূর্তে খারিজ করা হোক। রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনও কেউ কেউ চাইলেন। রাজ্যপালও এ বিষয়ে কয়েক জন আইনবিদ্ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে কথা বললেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও উঠল দলত্যাগী মহল থেকে।......যুক্তফ্রন্ট থেকে ঘোষণা করা হল: আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। দলত্যাগীর সংখ্যা যতই দেখানো হোক, বিধান সভায় শক্তি পরীক্ষা হবে।...এত কাণ্ডের মধ্যেও যখন ডঃ ঘোষের কোয়ার্টারে সাংবাদিকরা ও অন্য অনেকে গিয়ে জমায়েত হল তাঁর পদত্যাগের কারণ জানার জন্য, ডঃ ঘোষ তখন জবাব দিলেন, "পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। তাই এখনও পর্যন্ত মন্ত্রী আছি। মন্ত্রী হিসেবে যা বলা সমীচীন নয় তা বলতে পারব না।"

৫ই নভেম্বর থেকে নতুন কোয়ালিশন সরকার নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা, আইনবিদ্ ও সংবিধান বিশারদদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ইত্যাদি শুরু হয়ে গেল। ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে ১৭ জন দলত্যাগী এম এল এ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নাম দিয়ে একটা দলও ইতিমধ্যে (৩ নভেম্বর) গঠন করে ফেললেন। হুমায়ুন কবীর সম্রাটের মতো আচরণ করতে শুরু করলেন। ৫ তারিখে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বললেন, "উনি (ডঃ ঘোষ) শপথ না নেওয়া পর্যন্ত কিছু বলব না। যুক্তফ্রন্ট চলে যাচ্ছে—এর বেশি কিছু বলতে পারব না।"

৬ই নভেম্বর রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে ডঃ ঘোষের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন।

৭ই নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা রাজ্যপাল অবিলম্বে বিধানসভা ডাকার জন্য যে চিঠি দেন তা নিয়ে আলোচনার পর ঠিক করলেন ১৮ই ডিসেম্বর বিধানসভা ডাকা হবে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের চিঠি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজ্যপাল বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, বড় বেশী দেরী হয়ে যাবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বিধান সভায় যুক্তফ্রন্টের গরিষ্ঠতা নেই।···কবীর সাহেব সেদিন এক বিবৃতি দিলেন—পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার শান্তি ও গণতন্ত্রের পক্ষে আপদ স্বরূপ। অনতিবিলম্বে এই সরকারের অবসান বাঞ্ছনীয়।

৯ই নভেম্বর দিল্লী পেঁাছেই ধর্মবীর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের সঙ্গে দেখা করেন। তার আগেই তিনি স্বরাষ্ট্র সচিব এল. পি. সিং-এর সঙ্গে কথা বলে নেন। ডঃ ঘোষ ও ডঃ চন্দ্র প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। ডঃ ঘোষ আলাদাভাবে চ্যবনের সঙ্গে দেখা করেন।······এর পর পাঁচ ছদিন মন্ত্রিসভার অধিবেশনের দিন (১৮ই ডিসেম্বর ধার্য হয়) এগনোর প্রস্তাব এবং যুক্তফ্রন্ট ও তার মন্ত্রিসভার ঘোষিত তারিখ না বদলানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই নিয়েই কেটে গেল। ঠিক এক সপ্তাহ পরে, ১৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবন লোকসভায় ঘোষণা করলেন, কোন মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা-ভাজন কি না—এ সম্পর্কে রাজ্যপালের সন্দেহ হলে তিনি তাঁর বিবেচনা মতো কাজ করবেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যে সাংবিধানিক বিতর্কের প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত চেয়ে এক চিঠি পাঠালেন রাষ্ট্রপতির কাছে। ২০শে নভেম্বর রাষ্ট্রপতির প্রত্যাখ্যানপত্র বহন করে ওয়াই. ডি. আনন্দ কলকাতা পৌঁছলেন। রাত ১০টায় প্রত্যাখ্যানপত্র মুখ্য সচিবের হাতে পৌঁছল। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, আজ থাক, অনেক রাত হয়েছে, চিঠি কাল দেখব।

দিল্লীতে সেদিন মোরারজী দেশাই, চ্যবন ও জগজীবন রাম তাঁদের মত প্রকাশ করলেন—মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করার ব্যাপারে রাজ্যপালকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মতবিরোধ দেখা দিল, ইন্দিরা গান্ধী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্বরণ সিং পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট

মন্ত্রিসভা বরখাস্তের বিরুদ্ধে মত দিলেন। বিরোধীদের বক্তব্য; পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিদেশে প্রচণ্ড রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। কাজেই এখনই ঐ কাজের ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া মন্ত্রিসভা খারিজ করার পরই যে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হবে তা দমন করার ব্যাপারে সৈন্যবাহিনী নিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু তাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সম্মতি নেই।...কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কিন্তু সেই দিনই সিদ্ধান্ত নেয় যে হরিয়ানায় আগামীকাল রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হোক, কারণ দল বদলের অস্বস্তিকর পরিবেশ নাকি আর সহ্য হচ্ছিল না।...মন্ত্রিসভার আভ্যন্তরিক বিষয়ক কমিটি সেদিন পশ্চিম বাংলার ব্যাপারে একমত হতে পারে নি। তাই মন্ত্রিসভা বরখাস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করে দিল্লী থেকে কোন সম্মতি সূচক নির্দেশ পশ্চিম বাংলার রাজ্যপালের কাছে এল না। ধর্মবীরকে জানানো হল যে তিনি একটা মীমাংসা চেষ্টার মনোভাব গ্রহণ করুন। কেন্দ্রের এ সিদ্ধান্ত অনেক নেতার কাছেই বোধগম্য হল না। কারণ, ব্যবস্থা তো পাকা ছিল। বরং একদিন আগেই হবার কথা ছিল। ঠিক হয়েছিল যে ১৯শে নভেম্বর কলকাতার ময়দানে কংগ্রেস আয়োজিত জনসভা আর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সমাধি একসঙ্গে একই সময়ে হবে। কংগ্রেসের জনসমাবেশে বিজয়োৎসব হবে।......ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্টও বিরোধী চক্রান্তকে প্রতিরোধ করার জন্য ২২শে নভেম্বর বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে জনসভা আহ্বান করল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিলে পশ্চিম বাংলা 'অচল' হয়ে যাবে বলে শোনা গেল। হুমায়ুন কবীর এরই মধ্যে একদিন মন্তব্য করলেন, 'একটি কুকুরও ডাকবে না'। কবীর সাহেব দলত্যাগীদের আবার কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কবীরকে জানান যে ডঃ ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করা সম্ভব নয়। অমনি দলত্যাগীদের মধ্যে দ্বিতীয় চিন্তা শুরু হয়ে

গেল—বোধ হয় যুক্তফ্রণ্টে ফিরে যাওয়াই ভাল।…২০শে নভেম্বর অতুল্য ঘোষ দিল্লীতে বসেই খবরটা পেলেন যে পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রণ্ট বাতিল করার প্ল্যান স্থগিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্মসূচী বাতিল করে দিলেন। শেষ মুহূর্তের এই ব্যর্থতায় হুমায়ুন কবীর খুব মুষড়ে পড়লেন। তাঁর চিন্তা দলত্যাগীদের এমনিতেই তো আটকে রাখা যাচ্ছে না, তারা যদি আবার যুক্তফ্রণ্টের প্যারেড গ্রাউণ্ড সমাবেশে যোগ দেয়! সর্বনাশ!!

এদিকে ডঃ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি পাঠিয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে রাজভবনের কোয়ার্টারেই থেকে গেলেন। প্রহরী বেষ্টিত নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে তিনি ঘড়ির কাঁটা দেখতে লাগলেন।

২১শে নভেম্বর যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার এক বিশেষ বৈঠকে রাষ্ট্রপতির প্রত্যাখ্যানপত্র নিয়ে আলোচনা হল। রাষ্ট্রপতিকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়ে একটা জবাবও লেখা হল। ঠিক হল, বিশেষ দূত মারফৎ সে চিঠি সেদিন রাত্রেই দিল্লী পাঠানো হবে।…ঠিক ১৫ দিন আগে ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। আইন অনুযায়ী পদত্যাগপত্র গৃহীত হবার পর ১৫ দিনের বেশী মন্ত্রিনিবাসে থাকতে দেওয়ার নিয়ম নেই। সেদিন বিকেলে এই মর্মে ডঃ ঘোষের কাছে একটি সরকারী চিঠি গেল।…দুপুরে রাজ্যপালের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানতে চাইলেন: 'বিকেল চারটের মধ্যে জানান, বিধান সভার অধিবেশন এগিয়ে আনতে রাজী আছেন কিনা?' বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী জবাব পাঠালেন, 'বৃহস্পতিবার ২৩শে নভেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে মন্ত্রিসভা বসছে, তার আগে কিছু সম্ভব নয়।'

সূর্য অস্ত গেছে। তখনও একদল সাংবাদিক রাইটার্স বিল্ডিংয়ের প্রেস কর্নারে বসে আছেন।

৬টা ৪৫ মিনিটে হোম সেক্রেটারী হন্তদন্ত হয়ে চীফ সেক্রেটারীর ঘরে ঢুকলেন। ফাইনান্স কমিশনার ও মেম্বার বোর্ড অফ্ রেভিনিউ চীফ সেক্রেটারীর ঘরে।···কিছুক্ষণ পরেই চীফ সেক্রেটারী, হোম সেক্রেটারী ও ফাইনান্স কমিশনার রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বেরিয়ে গেলেন। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কোথায় যাচ্ছেন?' জবাব পাওয়া গেল : 'বলব না।'

চীফ সেক্রেটারীর গাড়ী রাজভবনের পাশ দিয়ে চলে গেল। পেছনেই সাংবাদিকদের গাড়ী। চীফ সেক্রেটারীর গাড়ী দুবার নেতাজীর মূর্তির কাছে পাক ঘুরল। তারপর ছুটল আকাশ-বাণীর দিকে। সাংবাদিকদের গাড়ী পিছু ছাড়ে নি। আকাশবাণী ভবনের কাছে আর একপাক ঘুরে চীফ সেক্রেটারীর গাড়ী সোজা রাজভবনের দক্ষিণ দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা ৭টা।

প্রায় পোনে ৮টার সময় যুক্তফ্রণ্টের তথ্যমন্ত্রী সোমনাথ লাহিড়ী রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বেরিয়ে এলেন। একে একে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর আলোগুলো নিভে গেল।

নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় গ্র্যাণ্ড হোটেলের ২০৪ নং ঘরে ক্রান্তিদলের যুক্তফ্রন্ট বিরোধী সদস্যদের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসার ফরমূলা কি হবে সেই আলোচনায় ব্যস্ত। মহামায়াপ্রসাদ ও উদিতনারায়ণ শর্মা সেখানে উপস্থিত। ডঃ মহতাব ও হুমায়ুন কবীর কিছুক্ষণ আগেই চলে গেছেন। কবীরের জরুরী কাজ ছিল। ডঃ মহতাবের সেদিন ছিল জন্মদিন।

রাত ৮টা ১০ মিনিটের সময় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যপালের সীল-মোহর আঁটা জরুরী চিঠি এল। "রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে এবং সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে আমি আপনার মন্ত্রিসভাকে বাতিল করলাম।" অজয়বাবু হাসতে হাসতে মহামায়াপ্রসাদকে বললেন, "ডিস্‌মিস্"।

ঠিক সেই সময়েই রাজভবনের থ্রোন হলে পশ্চিমবাংলার নতুন মুখ্য-মন্ত্রী রূপে ডঃ ঘোষ শপথ নিচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন—হরেন মজুমদার ও আমীর আলি মোল্লা।

শপথ গ্রহণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারী করা হল। শুরু হল ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার। রিজার্ভ ফোর্স থেকে পুলিশ এনে রাজ্যের পুলিশবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হল। পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সামরিক বাহিনীকে তৈরী থাকতে বলা হল।······কংগ্রেস নতুন মন্ত্রিসভাকে লিখিত সমর্থন জানাল। শ্রীআশু ঘোষ ডঃ ঘোষের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, "আজকে ফুলের মালা না হলে মানায় না।" পরক্ষণেই তিনি রাজ্যপালের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললেন, "স্যার, আই হ্যাভ ফিনিশড্ মাই জব্।"···

১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর। অন্যান্য মন্ত্রীরা সেদিন একটু আগেই চলে গিয়েছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে সবার শেষে বেরিয়ে এলেন তথ্যমন্ত্রী সোমনাথ লাহিড়ী। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী তখন কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলে ভারতীয় ক্রান্তি দলের সভাপতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মহামায়াপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলছেন। বাংলা কংগ্রেস আর কবীর গোষ্ঠীর সঙ্গে মিটমাটের একটা শেষ চেষ্টা হচ্ছে। কবীর সাহেব অবশ্য তখনই সব জানতেন—যদিও তাঁর আচরণে তা বোঝা যাচ্ছিল না। "পরে আবার আলোচনা হবে"—এই কথা বলে তিনি চলে গিয়েছিলেন। সেই আলোচনার আর দরকার হয়নি পরে। রাত আটটার সময় অজয় মুখার্জীর কাছে যে চিঠি এলো তা পড়ে মহামায়াপ্রসাদ আর তিনি উভয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সরকারী গাড়ী বিদায় দিয়ে অজয়বাবু হরিদাস মিত্রের গাড়ীতে বাড়ী ফিরে এলেন।

ততক্ষণে রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সশস্ত্র পাহারা। কলকাতাবাসী

বিহ্বল। ব্যাপারখানা কী? উত্তর পাওয়া গেল কিছু পরে আকাশ-বাণীর খবরে। রাজ্যপাল যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা খারিজ করে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ পাঠ করিয়েছেন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে। আরও কিছু পরে বেতার ভাষণে রাজ্যপাল বললেন, সাংবিধানিক কর্তব্য-পালনের জন্যই তাঁকে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বরখাস্ত করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে দোকানপাট বন্ধ, ট্রাম বাস ডিপোয় ফিরে গেছে—রাত নটার মধ্যেই কলকাতায় মধ্যরাতের স্তব্ধতা নেমে এসেছে। রাস্তা নিষ্প্রদীপ। মোড়ে মোড়ে চাপা উত্তেজনা। এরপরই আটচল্লিশ ঘণ্টাব্যাপী হরতালের ডাক।

মনে রাখা দরকার রাজ্যপাল বিধানসভা ডেকেছিলেন ২৯শে নভেম্বর আর যুক্তফ্রণ্টের মুখ্যমন্ত্রী ডাকতে চেয়েছিলেন ১৮ই ডিসেম্বর। অর্থাৎ দুটি তারিখের মধ্যে ব্যবধান মাত্র উনিশ দিনের। আর যে ২১শে তারিখ রাত্রে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বাতিল করা হল, বিধানসভা আহ্বানের তারিখ আরো এগিয়ে দেবার জন্য রাজ্যপালের পীড়াপীড়ির জবাবে ঐ প্রশ্ন যাতে মন্ত্রিসভা ভেবে দেখতে পারে তার জন্য অজয়বাবু সময় চেয়েছিলেন ২৩শে নভেম্বর অবধি।

২১শে নভেম্বর রাতের অন্ধকারে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, হরেন মজুমদার, ডাঃ আমীর আলি মোল্লা শপথ নেবার পর যে সরকারের পত্তন হয় সেই সরকারকে প্রকৃতপক্ষে পরদিন সকাল থেকেই অচল করে দিল বাংলাদেশের মানুষ। ২২শে নভেম্বর একদিকে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হল, আর একদিকে তেমনি বিকেলবেলায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'কাল যাঁরা মন্ত্রী ছিলেন'—যথা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অমর চক্রবর্তী, সেই সঙ্গে সুকুমার রায়, নরেন দাস, স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য, অরুণ ঘোষ নির্মম ভাবে পুলিশের হাতে প্রহৃত হলেন। ঘোড়সওয়ার ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মানুষের রক্তে ভিজিয়ে দিল ব্রিগেড-প্যারেড-গ্রাউণ্ডের সবুজ ঘাস।

২২শে নভেম্বর থেকে শুরু হল সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এক আশ্চর্য প্রতিরোধ সংগ্রাম—যার তুলনা দেওয়া ভার। ২৯শে নভেম্বর বিধান-সভার অধিবেশন বসল। স্পীকার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় এক ঐতিহাসিক রুলিং দিয়ে অবৈধ ঘোষণা করে দিলেন ঘোষ মন্ত্রি-সভাকে। স্পীকার শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক রুলিংয়ে বললেন :

"সম্মানিত সদস্যবৃন্দ! এই সভার অধিবেশন হচ্ছে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে। আমার কাছে এটি দৃশ্যতই স্পষ্ট যে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা এবং তাঁরই পরামর্শে এই সভা আহ্বান—এ সবই সংবিধান বিরোধী ও অবৈধ, কারণ এ সব কিছুই ঘটেছে এই সভার কাছ থেকে সংগোপনে। সমস্ত ব্যাপারটির পূর্ণ ও যথাযথ বিচার সাপেক্ষে এই বিধানসভার কর্মপরিচালনার ১৫নং ধারায় আমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারই জোরে আমি এই বিধানসভাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখলাম।"

১৮ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হল গণতন্ত্র রক্ষার দাবীতে আইন অমান্য আন্দোলন। দাবী :—(১) অবৈধ ঘোষ মন্ত্রিসভার অপসারণ, (২) রাজ্যপালের অপসারণ, (৩) যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, (৪) সমস্ত বন্দীর মুক্তি। সাতদিন ধরে চলল এই আন্দোলন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় প্রথম দিন আইন অমান্যে নেতৃত্ব করলেন আর দ্বিতীয় দিনে নেতৃত্ব করলেন হেমন্তকুমার বসু। সাতদিনের আইন অমান্য আন্দোলনে ৫৩টি জায়গায় প্রায় ৪৫ হাজার ব্যক্তি আইন অমান্য করেছিলেন। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল প্রায় ১০ হাজার জনকে। পুলিশের লাঠি-গুলিতে আহত হয়েছিল ১০৯ জন; যার মধ্যে কয়েকজন সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারও ছিলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী ৯২ দিন শাসনক্ষমতায়

থাকবার পর ডঃ ঘোষ মন্ত্রিসভার পতন হল। একদা যে চোরাপথে দলত্যাগ ঘটিয়ে ডঃ ঘোষ মন্ত্রিসভা গড়েছিলেন সেদিন দলত্যাগই ছিল রাজনৈতিক পুঁজি—আবার দলত্যাগের ফলেই তাঁর সরকারের পতন হল। রাজ্যে কায়েম হল রাষ্ট্রপতির শাসন।

আবার নির্বাচন। ১৯৬৯ সাল। ২৮০টি আসনের মধ্যে ২১৮টি আসন লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে এল যুক্তফ্রণ্ট। হেমন্তকুমার বসু জয়ী হলেন শ্যামপুকুর কেন্দ্র থেকে। এবার আর মন্ত্রিত্বে ফিরে গেলেন না তিনি। হেমন্তকুমার বসুকে দলের পক্ষ থেকে মন্ত্রী নির্বাচনের ভার দেওয়া হল। ক্ষমতায় এল দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট। কিন্তু হায়! প্রথম যুক্তফ্রণ্টের কাল হয়েছিল দলত্যাগ, আর এবার তার কাল হল ছিন্নমস্তা রাজনীতি।

এ হল ছিন্নমস্তা রূপ। ছিন্নমস্তা রূপে দেবী নিজের মুণ্ডু নিজে কেটে ফিনকি দিয়ে বেরুনো রক্ত নিজেই পান করেছেন। রাজ্যের বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট সম্পর্কে এই কথাটাই মনে পড়ে। রাজ্যের যুক্তফ্রণ্টের সঙ্গে সম্ভবত এই ছিন্নমস্তা রূপেরই একমাত্র তুলনা হতে পারে। দেবী বরদাত্রী, দেবী অভয়া বরাভয়া, দেবী দুঃখ-কষ্ট-বিনাশিনী, কিন্তু সেই দেবী আবার ধূমাবতী ছিন্নমস্তা। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সম্পর্কে আজ যে সংশয়, যে ভয়ভীতি, সেই প্রসঙ্গে দেবীর রূপবদলের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক প্রশ্নেরই সমাধান হবে। কিন্তু এই বাহ্যকথায় আজ আর অনেকের মন শান্ত হবে না, কারণ যুক্তফ্রণ্টের সংকট ও আভ্যন্তরিক অবস্থা যেখানে এসেছে সেখানে এই সব প্রতীকের কোন মূল্য নেই বলেই অনেকে মনে করেন। তাঁদের কাছে মূল কথা হল—এখন হবে কী? এরপর কী হবে? এই সহজ কথাটাই সকলে জানতে চান। অবশ্য এই চিন্তার মূলে আছে একটি কথা—সেটা হল, এত যদি যুক্তফ্রণ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতেন যে অনৈক্য ও কোন কোন দলের

মানুষ, বিশেষ করে সংবাদপত্রের পণ্ডিত সাংবাদিকরা এত বেশী করে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে নতুন কোন কথাই আর কারো মনে ধরছে না। গত তিন-চার মাসে কম করে তিরিশ-চল্লিশ বার বলা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট ভাঙলো, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হলো, মিনিফ্রন্ট গঠন হলো, সি পি এম-এর কাছ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে নেওয়া হলো ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল জ্ঞানী, গুণী, ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের সব কথাই মিথ্যে হয়ে গেছে, ভবিষ্যদ্বাণীর একটি কথাও সত্য হয় নি; তবে মানুষের মনে সন্দেহ ও উদ্বেগ বেড়েছে। তাই আজকের প্রশ্ন যুক্তফ্রন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু প্রকৃত সংকট যদি কিছু থাকে তবে সেটা হল যে কারণে যুক্তফ্রন্টের সংকট সেইগুলি দূর হবে কী করে? এতদিন ধরে যে ঘটনাগুলি ঘটে এসেছে সেটা হল— সবকিছুকে ধামাচাপা দেবার রাজনীতি। সংকটের মোকাবেলা না করে, সমাধানে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, শুধু ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। এই ক্রমাগত ঢেকে রাখার চেষ্টায় কোন সুফল হয়নি এবং সামান্য ক্ষত আজ দুঃসহ যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছে। আর এই যন্ত্রণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সর্বত্র।

মানুষ অনেক সময় ঠেকে শেখে, কিন্তু যে মানুষ ঠেকে শেখে না— সে হল বোকা। আবার যে ঠেকে শিখে নিজের ভুল সংশোধন না করে আবার নতুন ভুলের অবকাশ সৃষ্টি করে, হয় সে মতলববাজ নতুবা শয়তান। এই কথা নির্মম হলেও সত্য যে, ১৯৫৫ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনা ও তার পতনের সব কারণই যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি ঠেকে শিখেছিলেন। ১৯৫৫ সালে সরকারের পতন শুধু দলত্যাগ বা ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের কারণে ঘটেছিল এমন নয়। যুক্তফ্রন্ট শরিক দলের অনেকেরও নানা ধরনের প্ররোচনা ছিল। এই যে প্ররোচনা তার মূলে প্রধান শক্তি ছিল যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলির অনৈক্য এবং দলবিশেষের মাতব্বরির মনোভাব। কাজেই সেইদিন

মাতব্বরির মনোভাব হল যুক্তফ্রন্টের প্রধান শত্রু, তবে সেই শিক্ষা তো গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু সেই শিক্ষা কেউ বড় বেশি গ্রহণ করলেন না। নদী পেরিয়ে পাটনীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অনেকে ভাবলেন, নদী পেরিয়ে এসে ক্ষমতায় বসেছি, অতএব পাটনী কোন্ কথা···। কিন্তু চলার পথে নদীও যেমন একটা নয়, আবার পাটনীও একজন নয়। কাজেই একটি নদী পেরিয়ে, একজনকে ফাঁকি দিয়ে সব নদী পেরুনো হয়ে গেল, সব পাটনীকে ফাঁকি দেওয়া হল চিন্তা করার মত বোকামি নেই। অথচ সেই বোকামি পেয়ে বসল যুক্তফ্রন্টের অনেক শরিক দলকে। তাঁরা ভাবলেন বিপুল সংখ্যায় জয়ী হয়েছি, দলত্যাগের কারণে সরকারের পতন ঘটবার সম্ভাবনা নেই। অতএব 'দে গোরুর গা ধুইয়ে', 'লড়ে যাও দাদা লড়ে যাও'। তাই আর কারো মনে পড়লো না যুক্তফ্রন্টকে কিভাবে রক্ষা করা যায়—যুক্তফ্রন্টকে কিভাবে সম্প্রসারিত করা যায়। অর্থাৎ ভোটে জয়ী হয়ে, সরকার গঠন করে যুক্তফ্রন্টকেই অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা দিল। ভোটের সময় যুক্তফ্রন্টই ছিল সব শক্তির আধার ; কিন্তু ভোটের পর সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে মনে করলেন—এখন যুক্তফ্রন্ট হল শুধু একটি নাম, একটি সাপ্তাহিক বৈঠকের স্থান, সেখানে যাবো, বসবো, আলোচনা করবো, কিন্তু তার বেশী নয়। যুক্তফ্রন্ট কী করবে সেটা বড় কথা নয়, পার্টি কি করবে সেইটাই বড় কথা। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের নামে ক্ষমতায় এসে, যুক্তফ্রন্টের নামে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করে, যুক্তফ্রন্টকেই অগ্রাহ্য করা, যুক্তফ্রন্টকেই দুর্বল করার প্রবণতা দেখা দিল। আজকের যে সংকট এই হল তার মূল উৎস। যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে অথবা যুক্তফ্রন্ট থাকবে না, কিংবা যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাবে—এই কথা যাঁরা ভাবছেন তাঁরা পাগল। যাঁরা পথকে নোংরা করে পথিককে চোখ রাঙান অথবা যিনি পথ নোংরা করার বিরোধী—উভয়ের কাছেই পথ অপরিহার্য। সংঘাতের মূল কথাও এই। নইলে

একথা ভাবতে তো সকলেরই অবাক লাগে যে—রাজ্যে যুক্তফ্রণ্ট থাকবে অথচ সেই যুক্তফ্রণ্টকে জেলা, মহকুমা, থানা, ব্লক বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে সম্প্রসারণ করা চলবে না। যুক্তফ্রণ্টের মূল কথা হল সুষ্ঠু জনকল্যাণমূলক প্রশাসন এবং এই প্রশাসন চলবে সরকারী আমলা ভিত্তি করে নয়—জনগণের শক্তি ও সহযোগিতা নির্ভর করে, অথচ সেই যুক্তফ্রণ্টকে সর্বস্তরের শাখায় যুক্ত করা যাবে না। এই নীতি হল স্ববিরোধিতার নীতি, এই নীতি হল ভাবের ঘরে চুরির নীতি। বাউল গানের 'যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না' নীতি। এবং এই নীতিরই ফল আজকের এই ছিন্নমস্তা রূপ। যে রূপ দেখে শিবঠাকুরও শিউরে উঠেছেন। দেবীর কী ভয়াবহ রূপ—নিজের মুণ্ডু কেটে নিজে রক্তপান করেছেন। আজকের যুক্তফ্রণ্ট কী ভয়াবহ অবস্থায় এসেছে—এখানে জনকল্যাণের নামে শপথ নিয়ে শরিক দলগুলি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মুণ্ডু কেটে রক্তপান করছেন। কিন্তু দেবীর এই কি শেষ রূপ? দেবীর এই রূপেই কি সমাপ্তি? এরা কি চিরকালই এইভাবে নিজের মুণ্ডু কেটে নিজে রক্তপান করবে? এই প্রশ্নের জবাব সকলেই পেতে চায়। কিন্তু কী সে জবাব? কে দেবে সেই জবাব? জানি জবাব আছে—জবাব হয় না এমন প্রশ্ন নেই, সমাধান হয় না এমন সমস্যা নেই। কালের রথচক্রে প্রশ্ন আসে, আবার তার মীমাংসা হয়; সমস্যা সৃষ্টি হয় আবার তার সমাধান হয়। এইবার যুক্তফ্রণ্টের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। দেখা যাক কোথায় আছে সমাধানের সূত্র, কোথায় আছে প্রশ্নের উত্তর।

ছিন্নমস্তা রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। আমরা সকলেই জানি পশ্চিমবঙ্গে ১৪টি রাজনৈতিক দলের যুক্তফ্রণ্ট হল সরকারী দল। ওই দলের কার্যকরণেই সরকারের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এই যুক্তফ্রণ্টের দুইজন

আহ্বায়ক আছেন। তাঁরাও বেশ নামী এবং সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী। কিন্তু একথা সম্ভবত অনেকেরই জানা নেই, এতবড় যুক্তফ্রণ্ট সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন—তাঁদের সভায় যেখানে সরকার চালাবার গাইড-লাইন ঠিক হয়—সেই সভার কোন কার্যবিবরণ লেখা হয় না। যুক্তফ্রণ্টের সভার কোন মিনিট-বুক নেই—এমন কি কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সেই সিদ্ধান্তে কাগজে কোন দল সই করেন না—এমন কি সভায় হাজিরারও কোন খাতা নেই। একবার চিন্তা করুন! যুক্তফ্রণ্টের সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কী সিদ্ধান্ত হল সেটা তবু কখনও কখনও একটা চোথা কাগজে লিখে রাখা হয়; কোন পাকা খাতা নেই অথবা কোন্ প্রশ্নে কোন্ দল কী মত দিলেন বা বক্তব্য রাখলেন সেই কথা লিপিবদ্ধ রাখা হয় না। এমন কি যুক্তফ্রণ্টের সভা ডাকার নোটিশ-বই পর্যন্ত নেই। যুক্তফ্রণ্টের সম্পত্তি বলতে কিছু লুজ কাগজ ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি বা দলিল নেই।

এইবার চিন্তা করুন যুক্তফ্রণ্ট চলছে কীভাবে, যুক্তফ্রণ্টের সংগঠন ও দপ্তর চলে কীভাবে।

এর ফল কী হয় সেকথা হয়তো প্রকাশ পায় না। কিন্তু যারা ভিতরের খবর রাখে তারা জানে—এক সভায় এক নেতা এক কথা বলে পরের সভায় ঠিক উল্টো কথা চালিয়ে দেন এবং তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার কিছু থাকে না। এমন ঘটনা অহরহ ঘটে। আবার গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজে রূপ দিতেও একজন এক এক রকম মনগড়া ব্যাখ্যা করে নেন। আবার কোন কোন গৃহীত সিদ্ধান্ত কাজে রূপ দিতে গিয়ে উল্টে দেওয়া হয় অথবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমন সব ঘটনার অজস্র নজীর আছে। এরপরও কি চিন্তা করা যায় যুক্তফ্রণ্ট একটা সংগঠন! যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন! অথচ এই সংগঠনের দুজন আহ্বায়ক রয়েছেন শ্রীসুধীন কুমার ও শ্রীবরদা মুকুট-মণি। যুক্তফ্রণ্টের মূল ভিত্তি যেখানে এত নড়বড়ে, যার মূল

ভিত্তিতেই কোন শক্ত বাঁধুনি নেই, সেখানে বড় ও ভাল কাজ তারাই আশা করতে পারে, যারা মূলো গাছ পুঁতে সেই গাছে আঙুর ফল আশা করে।

এ না হয় গেল যুক্তফ্রন্ট সংগঠনের অবস্থা ; কিন্তু ছিন্নমস্তা রাজনীতি শুধু সংগঠনের কারণেই হয়নি। মনের যদি মিল থাকে, যদি থাকে বিশ্বাস ও সমঝোতা, তবে নাই বা থাকল খাতা কাগজপত্র। যুক্তফ্রন্টের বর্তমান সংকটের মূল কারণ কী এই সম্পর্কে অনেক কথা অনেকে বলে থাকেন, এবং সত্যি কথা বলতে কি, আজ পরিস্থিতি এমন জট পাকিয়ে গেছে যে, অনেকেই আর এক কথায় এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। কারণ কোথা থেকে শুরু অনেকেই যেমন সেকথা ভুলে গেছেন আবার তেমনি একই ভাবে শেষ সম্পর্কেও অনেকে সবকিছু অনিশ্চিতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আমার কিন্তু মনে হয় যুক্তফ্রন্টের শত্রু হল তিনটে 'ভি'। এই তিন ভি হল—'ভায়োলেন্স', 'ভায়োলেশন' ও 'ভিলিফিকেশন'। একদা 'ভি' উপহার দিয়েছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন ও পরে চার্চিল, আর উভয়েই এই 'ভি'-তে ভিক্টরি লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ডুবলো তিন 'ভি'-তে। 'ভায়োলেন্স' হল এক 'ভি' যার মানে হল হিংসা ও হিংস্রতা। 'ভায়োলেশন' হল দু-নম্বর 'ভি' যার অর্থ হল চুক্তি না মানা, কর্মসূচী রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রূপায়ণ না করা। আর তিন নম্বর 'ভি' অর্থাৎ 'ভিলিফিকেশন' হল কুৎসা রটনা, গালিগালাজ করা। এই তিন 'ভি' সমাজদেহ থেকে চলে যাবে একথা অবশ্য কেউ কল্পনা করে না—কিন্তু এই তিন 'ভি'-কে উপজীব্য করে আর যাই করা যাক, সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে একটা সুস্থ সরকার চালানো যায় না একথা সত্য। এই সত্য যুক্তফ্রন্টের নেতারা জানেন না একথা বলতে চাই না। তবে বিকৃত মস্তিষ্ক পাগলকে সামলানো সহজ, নিদেনপক্ষে তাকে হাতকড়া বা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেও

চলে, কিন্তু পাগল যদি সেয়ানা হয় তখনই বিপদ বেশী। সেই পাগলকে হাতকড়াও দেওয়া যায় না আবার স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়াও মঙ্গলের হয় না। আমরা এখন সেই সেয়ানা পাগলের হাতে পড়েছি।

এই সেয়ানা পাগলরা সকলেই জানে ভায়োলেন্স তাদের শত্রু, সেই শত্রুকেই সকলে পরম আদরে বুকে নিল, কণ্ঠলগ্ন করল। হিংসাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় করে কাকে কে কিভাবে দিয়েছেন, কে আগে দিয়েছেন আর কে পরে দিয়েছেন, কে বেশি দিয়েছেন আর কে কম দিয়েছেন তার সূক্ষ্ম হিসাব বা তর্কের মধ্যে না গিয়েও সরকারী হিসাবের সাহায্যেই দেখা যায় যে অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাসে অর্থাৎ ফসল কাটার মরসুমে প্রত্যেকটি দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে একে অপরের সঙ্গে। এই সংঘর্ষ থেকে কেউ বাদ যায় নি—কমবেশী সকলেই সাধ্যমত লড়াই করেছে।** তাই ভায়োলেন্স নিয়ে যে সংকট, সেই সংকট সমস্ত যুক্তফ্রন্ট দলের মন বিষিয়ে দিল। ভায়োলেন্স হল যুক্তফ্রন্টের এক নম্বর শত্রু।

এরপর আসে ভায়োলেশন ও ভিলিফিকেশনের কথা। হিসাব করলে দেখা যাবে, এই ভায়োলেন্স থেকে যুক্তফ্রন্টের কম ক্ষতি হয়নি। ভায়োলেন্স শুধু যে শরিকী লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ এমন নয়। এই ভায়োলেন্স বিস্তারিত হয়েছে জনজীবনের সমস্ত স্তরে। শরিকী সংঘর্ষে হাত পাকিয়ে মস্তানরা তাদের ক্ষেত্র অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। এর ফল টের পাওয়া যাবে সেই দিন, যেদিন বিদ্যাসাগরের প্রথম গল্পের (প্রথম ভাগের) নায়ক মাসির কান কামড়ে দিয়ে সময় থাকতে সংশোধনের সুযোগ না নেওয়ার প্রতিশোধ নিয়েছিল, তেমনি আজকের রাজনৈতিক দলনেতা মাসিদের কানে কামড় পড়বে। যুক্তফ্রন্ট হয়ত ভেঙে যাবে—হয়ত বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারও ভেঙে যাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে মাসিদের কানগুলোও যাবে।

একটি সরকারী হিসাব ব্যাপারটিকে বুঝতে সাহায্য করবে। হিসাবটি দিয়েছেন রাজ্যের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার। আর ওই হিসাবটি যাকে তাকে দেওয়া হয়নি —দেওয়া হয়েছে রাজ্য-মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যদের। শ্রীকোঙার এই হিসাবটি সংগ্রহ করেছেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলাশাসক এবং ডি আই জি, আই বি-র মাধ্যমে। এই হিসাব সমগ্র হিসাব নয়। কেবল দু-তিন মাসের হিসাব এবং এই হিসাব হল ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাসে অর্থাৎ ফসল কাটার মরসুমে হিংসা ও হিংস্রতা এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষের তালিকা নিম্নরূপ :—

সি পি এম—	১০৯ ক্ষেত্রে
সি পি আই—	৪৯ ,,
এস ইউ সি—	১৬ ,,
ফরোয়ার্ড ব্লক—	১৩ ,,
আর এস পি—	১০ ,,
বাংলা কংগ্রেস—	৯ ,,
এম এফ বি—	৩ ,,
এস এস পি—	২ ,,
কংগ্রেস—	২ ,,

তিন মাসে সি পি এম ১০৯টি সংঘর্ষ করলো অর্থাৎ গড়ে একটা দিনও বাদ যায়নি ধান কাটার মরসুমে যেদিন সি পি এম একটি অথবা একাধিক সংঘর্ষ না করেছে। এ যেন এমন, যে দল যত বড় তারা তত বেশী সংঘর্ষ করেছে। এই সংঘর্ষ যে শুধু এক দল এক দলের সঙ্গে করেছে তাই নয়। এই তালিকা দেখলে দেখা যাবে কোচবিহার ও বর্ধমান জেলায় সি পি এম দল নিজের সঙ্গেই নিজে লড়াই করেছে

চারটি ক্ষেত্রে। এইসব সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ২৩জন, আহত হয়েছে ২০১ জন, গ্রেপ্তার হয়েছে ৭৮১ জন। এই যে হিসাব এ হল সরকারী হিসাব। থানার ডায়েরী খাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে, মামলা হয়েছে। এর বাইরেও আরও নিহত, আহত, দাঙ্গাহাঙ্গামা আছে। কাজেই এক বৎসরের হিসাব যদি পূর্ণ করা যায়—তবে এই তালিকা কত হবে সেটা নিশ্চয়ই অনুমান করা কষ্ট নয়।

কথার খেলাপ ও দুমুখো নীতি গ্রহণ যুক্তফ্রণ্টের প্রধান শত্রু। ভায়োলেশন বলতে যেকথা বলতে চাই সেটা হল এই কথার খেলাপ। এই কথার খেলাপ কবে শুরু হল আর কে শুরু করলো সে হিসাব বের করা সহজ নয়। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রধানত দুটো দলিল আছে যা যুক্তফ্রণ্টের শরিক দল মেনে চলেননি। এর প্রথম দলিল—পাঁচ পার্টির বৈঠকে আলোচনা করে ১৮ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সেই কর্মসূচীকে ১৭ পার্টি মেনে নেন। তখন তাকে বলা হয় ১৪ পার্টির দলিল। তারপর সেই দলিলকে আরো সংক্ষিপ্ত করে সাত দফা কর্মসূচীতে পরিণত করা হয়। কিন্তু দেখা গেল ১৮ দফা কর্ম-সূচীই হোক আর ৭ দফা কর্মসূচীই হোক কোনটাই যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলেরা মেনে চললেন না। কিন্তু কে মেনে চললেন না আর কেন মানা হল না সেই সম্পর্কে সূক্ষ্ম হিসাব করা খুবই মুশকিল। হিসাব নেই তা নয়, আর হিসাব করলে আসামী ধরা পড়ে না এমন নয়। তবে তার মধ্যে না যাওয়াই ভাল। তবে মোটা কথায় এইবার দেখা যাক ৭ দফা কর্মসূচী কেন রূপায়ণের চেষ্টা হল না। ১৫ ও ১৬ মে আলিপুরদুয়ারে যে শরিকী সংঘর্ষের শুরু তাই পরিণতি লাভ করে ৩০শে সেপ্টেম্বর বরাহনগরে। শরিকী সংঘর্ষ পাঁচমাস চলেও যুক্তফ্রণ্টের কানে জল আনতে পারলো না এবং প্রকৃতপক্ষে কোন সংকট সৃষ্টি করতে পারল না। সংকট সৃষ্টি হল বরাহনগরে শ্রীশিব ভট্টাচার্য ও শ্রীসুধীর ভট্টাচার্যকে নৃশংসভাবে মারধোর করবার পর।

নিঃশস্ত্র নায়ক হেমন্ত বসু

বরাহনগরের ঘটনার পর সি পি আই যুক্তফ্রন্টের সভা বর্জন করল। যুক্তফ্রন্টের সভা হল না। তখনই প্রথম যুক্তফ্রন্টের বরফ-দেহে তাপ লাগলো। এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে সংকটের যে রূপ ধরা পড়লো সে শুধু দুটি রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ নয়, এর মধ্যে আরো ধরা পড়লো পুলিশের সি পি এম-মুখী ভূমিকা এবং সি পি এম-এর পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের যে কোন কাজকে সমর্থনের প্রবণতা। নিছক মারামারি হলে তা নিয়ে রাজ্যস্তরে সংকট হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি একটা সুদূরপ্রসারী ভয়ার্ত ছায়া দেখতে পেল। যেমন আলিপুর-দুয়ারে প্রকাশ্যে হামলা করলো, সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকরা মিছিল করে আর এস পি অফিস চড়াও হয়ে দপ্তরটি ভস্মীভূত করে দিল, কিন্তু পুলিশ নিতান্ত দর্শকের বেশী কোন ভূমিকা নিল না। পুলিশের এই দর্শকের ভূমিকা নেবার সফল পরিণতি ঘটলো বরাহনগরে। বরাহনগরে সি পি আই কর্মী শিব ভট্টাচার্য ও সুধীর ভট্টাচার্যকে নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে মেরে জখম করা হল। হাত পা ভেঙ্গে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেওয়া হল। মৃত্যু আসন্ন জেনে একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ করেন। সেই জবান-বন্দীতে শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য অপরাধীদের নাম করেন। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করলো না। শ্রীজ্যোতি বসু বললেন, মৃত্যু হচ্ছে জেনে যে জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়েছিল সেই ব্যক্তি জীবিত থাকায় ঐ জবানবন্দীকে মৃত্যুকালীন জবানবন্দীরূপে গণ্য করা যায় না। আর স্থানীয় সি পি এম এই ঘটনা সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন সেটা হল শ্রীশিব ভট্টাচার্য ঘাসের উপর পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন। ঘটনা দীর্ঘ না করে বলতে চাই—শরিকী সংঘর্ষ যা দুই দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারতো সেটা ক্রমে ক্রমে পুলিশ, প্রশাসন ও মন্ত্রীদের জড়িয়ে ফেলল। যেমন এই জাতীয় ঘটনার মধ্যে আর

একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, সেটা হল আক্রান্ত. নিগৃহীত ও নিহত অন্য দলের সমর্থকদের নানাভাবে চিহ্নিত করা। কাশীতে মরলে স্বর্গে যায়, ব্যাসকাশীতে মরলে গাধা হতে হয়। এ যেন সেইরকম। সোনারপুরের কাছে প্রসাদপুরে সি পি আই দপ্তরে হামলা করে তিনজন কৃষককে খুন করা হল কিন্তু সেই খুনের নিন্দা না করে সি পি এম নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বলে দিলেন নিহত তিনজনের মধ্যে দুজনই কুখ্যাত ব্যক্তি, এরা একদা খুনের আসামী ছিল। কুসুমপুরে একজন মহিলাকে প্রকাশ্য পথে বিচার করে তাঁর মাথার চুল কেটে জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো হল। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বললেন, মহিলার চরিত্রে গোলমাল আছে। এই তো কদিন আগে বেলেঘাটায় একজন যুবক খুন হল, শ্রীজ্যোতি বসু বললেন, ও পি ডি অ্যাক্টের আসামী ছিল। এই যে খুনের চেয়ে বড় করে মৃত ব্যক্তির চরিত্র অন্বেষণ করা তার থেকেই সৃষ্টি হল খুনের কিনারা না করবার প্রবণতা। একজন লোক মারা গেলে দায়িত্বশীল মন্ত্রী অর্থাৎ খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা পার্টটাইম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি সব সময় বলেন, ওহে, যে মারা গেছে সে আসামী ছিল, সে ডাকাত ছিল, সে চরিত্রহীন ছিল, তাহলে পুলিশও খুনের কিনারা করতে উৎসাহী হয় না, গা ঘামায় না ; আবার ভাবে মন্ত্রী মশায় যখন এই কথা বলেছেন তখন খুনের কিনারা করলেই তো মন্ত্রী মশায় অখুশী হবেন, অতএব কী দরকার ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে। এর ফলে রাজ্যে দাঙ্গা, সংঘর্ষ, ডাকাতি, খুনের সংখ্যা বেড়ে গেল। কলকাতায় খুনের সংখ্যার পরিসংখ্যান : ১৯৫৯—৪১, ১৯৫৭—৫৭, ১৯৫৮—৫৬, ১৯৫৯—৬৮। পুলিশের গ্রামার মতে ১৯৫৬ ও '৫৭ সালে কলকাতায় কোন রাজনৈতিক খুন হয়নি। ১৯৫৯ সালে হয় ১টা আর ১৯৫৯ সালে ৫টা। কলকাতা বাদে রাজ্যের খুনের হিসাব : ১৯৫৬—৪৪৯, ১৯৫৭—৫৮৪, ১৯৫৮—৫৭৫, ১৯৫৯—৬৪০। রাজ্যে রাজনৈতিক

কারণে খুন হয়েছে ৬৫ জন। যদিও শ্রীভবানী সেন তাঁর একখানা গ্রন্থে, শ্রীসুশীল ধাড়া তাঁর এক বিবৃতিতে এই খুনের বা শরিকী সংঘর্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ২০০ বলেছেন।

যা হোক পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠলে অনেক আলাপ আলোচনার পর শরিকী সংঘর্ষের কারণ ও তা দূর করবার জন্য ১৪ পার্টি এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ১৪ পার্টির দলিলে অনেকগুলি কার্যসূচী নেওয়া হল। কিন্তু এর মধ্যে বাংলা কংগ্রেস রাজ্য কমিটি একটি প্রস্তাব নিল -- যে প্রস্তাবে সরকারের নিন্দা এবং প্রতিকার না হলে আন্দোলন করার কথা ছিল। বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব পড়েই সি পি এম তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সি পি এম প্রথমে ঘোষণা করল বাংলা কংগ্রেস যদি তার প্রস্তাব প্রত্যাহার না করে তবে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি এম কোন যুক্তসভা করবে না। ১৪ পার্টির দলিলে ঠিক হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট যুক্তভাবে রাজ্যে চারটি কেন্দ্রীয় সভা করবে। দুটো সভা কৃষক অঞ্চলে অর্থাৎ সোনারপুর ও কোচবিহারে, দুটো সভা হবে শ্রমিক অঞ্চলে, যথা ব্যারাকপুর ও আসানসোলে। সেপ্টেম্বর মাসের চারটি দিনও নির্দিষ্ট হয়েছিল সভা করবার জন্য। অর্থাৎ সর্বপ্রথম সি পি এম একটা দলের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচী পালনে সম্মত হল না। তবুও টানাটানি চললো। এর মধ্যে আবার ১৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী একটা ফর্মুলা দিলেন—সেই ফর্মুলা ভিত্তি করে সেপ্টেম্বর মাসে তিনদিন পর পর যুক্তফ্রন্টের সভায় বসে নেতৃবৃন্দ সাত-দফা কার্যসূচী গ্রহণ করলেন। এই কার্যসূচীটিও ছিল যুক্তসভার প্রস্তাব। কিন্তু আবার বাংলা কংগ্রেস বাঁকুড়ায় রাজ্যসম্মেলনে মিলিত হয়ে শরিকী সংঘর্ষ রোধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত করলো। এবার আবার সি পি এম নতুন করে ঘোষণা করলো বাংলা কংগ্রেস তার প্রস্তাব প্রত্যাহার না করলে কোন যুক্তসভা হবে

না। আর যুক্তসভা হবে না মানেই সাত দফা কার্যসূচীও গয়ায় গেল। বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব অতিশয় খারাপ, অতি নিম্নস্তরের রাজনীতির, এমন কি যদি বলা যায় যুক্তফ্রন্ট বিরোধী ষড়যন্ত্রের অঙ্গ তবুঁ সি পি এম বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্টের কার্যসূচী বানচাল করে কোন্ রাজনীতিতে? অতীতে এমন কী বর্তমানেও সি পি এম কি অন্য অনেক দলকে জোতদারের দালাল, মিনিফ্রন্টের শরিক, কংগ্রেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী, কায়েমী-স্বার্থের তল্পিবাহক এমনি বহু কথা বলেনি—তার জন্য কোন দল কি যুক্তফ্রন্টের কার্যসূচীতে বাগড়া দিয়েছে? বাংলা কংগ্রেস অন্যায় করে থাকে তার জন্যে সি পি এম তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার করুক—যেটা তারা মোটেই কম করে না—কিন্তু তার জন্য যুক্তফ্রন্টের কার্যসূচী বানচাল হয় কেন? সেই সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্টের যুক্তসভায় যোগদানে অস্বীকার করা এবং বাংলা কংগ্রেসের রাজ্যসম্মেলনে সি পি এম-কে আক্রমণ করতে গিয়ে সমগ্র যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণ করাই হল ভায়োলেশন পর্বের সূত্রপাত। এই ভায়োলেশনই আজ যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

চক্রান্তের গণহিষ্টিরিয়া আর কুৎসার রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ করেছে। হিটলারের স্যাঙাত গোয়েবল্‌স্ মনে করতেন একটা মিথ্যা বারবার বলে যাও, দেখা যাবে সেই মিথ্যা একদিন সত্য হয়ে যাবে। এমন গল্পও পাঠ্যপুস্তকে আছে যে দুর্বৃত্তরা পরামর্শ করে ছাগলটিকে বারবার কুকুর বলে মালিকের বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়ে মালিক যখন তাকে ত্যাগ করে তখন তারা সেটি নিয়ে গিয়ে পরম আহ্লাদে ভোজ লাগায়। আর এই হল গোয়েবল্‌স্ প্রচারের কায়দা। প্রথমে অবিশ্বাস সৃষ্টি করো, তারপর মনোবল ভেঙে দাও, তারপর আত্মসমর্পণে বাধ্য করো অথবা বিলোপের পথে পাঠিয়ে দাও। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট শরিক দলের মধ্যে একে

অপরের বিরুদ্ধে যে কুৎসা প্রচারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে তার মূল কথা হল এই। কিন্তু এর মধ্যেও একটা বিজ্ঞান আছে, সেই বিজ্ঞান হল প্রথমে ছাগলটিকে কুকুর বানাও, তারপর মালিক ফেলে দিলেই ছাগলকে ছাগল জেনেই ঘরে নিয়ে যাও। কথাটা আরো পরিষ্কার করলে এই দাঁড়ায় যে প্রথমে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্ত করে গণ-হিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করো, তার মধ্য দিয়ে চক্রান্তকারীদের নানা রূপে চিত্রিত করে জনসমক্ষে পেশ করো—তারপর যুক্তফ্রন্ট ভাঙলে সেই যুক্তফ্রন্টকে শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট বলে ধরে তুলে নাও এবং মাংস করে খাও।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ছিন্নমস্তা রাজনীতির অন্যতম প্রধান দিক হল—কুৎসা। আমি অবশ্য এ কথা মনে করি না যে, এই কুৎসার রাজনীতিতে কোন একটা দলই শুধু বিষ্ঠা আর অন্য সকলে তামা তুলসী গঙ্গাজল। রকমফেরে এবং অবস্থা ও সুযোগ মত কুৎসার পাঁকে অবগাহন করেন না এমন বড় কেউ নেই, কিন্তু তার মধ্যেও কথা আছে। বলশেভিক পার্টি যদি সি পি এম বা সি পি আই দলের বিরুদ্ধে কুৎসা গায় তবে সেই কুৎসা জনজীবনে তথা ফ্রন্টের শরিক দলে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করে না। কিন্তু কুৎসার রাজনীতিতে যদি সেই দলগুলি থাকে যারা প্রকৃতপক্ষে যুক্তফ্রন্ট রক্ষা ও ভাঙবার মালিক, তাহলে অবস্থা অন্যরকম হতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গে কুৎসার রাজনীতি দুটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো। এক হল রাজ্যের কিছু বড় দল কুৎসা রটনার পথে চক্রান্ত বলে গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করলো আর সেই প্ররোচনার ফাঁদে পা দিল অপর বড় শরিক দল বাংলা কংগ্রেস। সি পি এম যেভাবে কতকগুলি দল সম্পর্কে মিনি-ফ্রন্টের কথা, জোতদার ও কায়েমী স্বার্থের দালাল বলে যুক্তফ্রন্টের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করল একই ভাবে বাংলা কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে গেছে, বর্তমান সরকার অসভ্য বর্বর প্রভৃতি কথা

দিয়ে যুক্তফ্রণ্টের একপেশে মূল্যায়ন করে যুক্তফ্রণ্টের চরম শত্রুদের হাতেই অস্ত্র তুলে দিল। এই একদিকের প্ররোচনা আর অন্যদিকে সেই প্ররোচনার শিকার হওয়া—দুই মিলিয়ে যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলের মধ্যে যে অবিশ্বাস আর আস্থাহীনতা সৃষ্টি হল সেটা মেরামত করা শিবেরও অসাধ্য ছিল। তাই জনগণেরই বোঝা দরকার যুক্তফ্রণ্টের বাসরে লোহার ছিদ্র কোথায়, যে ছিদ্র দিয়ে বিষধর সর্প প্রবেশ করে লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করলো। বাসর রাত না পোহাতে মৃত্যু হল লক্ষ্মীন্দরের। জনগণরূপী বেহুলা যদি প্রাণের লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচাতে চায় তবে তার জন্য প্রয়োজন হবে কঠোর সাধনার—কিন্তু তার আগে বোঝা চাই কোন্ সাপে কেটেছে লক্ষ্মীন্দরকে।

এই সাপ হল কুৎসা, অবিশ্বাস, অনাস্থা। কবে শুরু হয়েছে এই কুৎসার রাজনীতি, কবে শুরু হয়েছে অবিশ্বাসের রাজনীতি, কবে শুরু হয়েছে অনাস্থার রাজনীতি—সেটা একটু স্মরণ করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট রক্ষা ও ভাঙবার সবচেয়ে বড় মালিক হল সি পি এম। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এই দলের ৯ জন মন্ত্রী, ৮৩ জন এম এল এ আর কয়েক লক্ষ সভ্য-সমর্থক হল রাজ্যের যুক্তফ্রণ্ট ভালভাবে চালাবার গ্যারান্টি। তাছাড়া সি পি এম যখন ছাগলকে কুকুর বলে চালায়, সি পি এম যখন চক্রান্তের গণহিষ্টিরিয়ার সৃষ্টি করে বিভ্রান্ত করে, সেইটাই হয় যুক্তফ্রণ্টের সবচেয়ে বড় বিপদ। এই বিপদের কথা এইবার বলবো। প্রশ্ন উঠল—রাজ্যে মিনিফ্রণ্ট হচ্ছে। কায়েমী স্বার্থের দালালি করছে, কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করছে। যুক্তফ্রণ্ট নয়, শ্রেণীভিত্তিক ফ্রণ্ট চাই, যুক্ত সর্বদলীয় সভায় যাবো না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচন লড়তে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী বা যুক্তফ্রণ্টের কোন শরিক দলকে ডাকবো না। আবার অন্য দলের নির্বাচনেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্ট প্রার্থীকে জয়যুক্ত করতে এক মঞ্চে দাঁড়াবো না—এই কথাগুলি

কারা প্রথম বলেছেন—এবং যাঁরা বলেছেন তাঁরা এই কথা বলে যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করেছেন না দুর্বল করেছেন এ কথার জবাবে আসতে হবে। এইসব কথাগুলিই তো যুক্তফ্রন্টের ১৪ দলের লোহার বাসরে ছিদ্র করে ৩২ দফা কার্যসূচীর লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করেছে। জনগণ-বেহুলাকে সেই সর্প চিনতে হবে, সেই লোহার বাসরের ছিদ্র বন্ধ করতে হবে।

রায়না ও টালিগঞ্জ নির্বাচনে সি পি এম জানিয়েছেন যে তাঁরা অন্য দলনেতাদের তাঁদের নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিতে ডাকবেন না। কিন্তু তখনও একটা কাজ হয়েছিল; তা হল একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেছিল যে বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সহ অন্য দলনেতাদের স্বাক্ষর ছিল। অন্য দলকে সি পি এম আহ্বান না করায় সবচেয়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল আর এস পি। অন্যরা যে ক্ষুব্ধ না তা নয়, তবে আর এস পি-র কাউন্সিলার শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় প্রকাশ্য বিবৃতিতে সি পি এম-এর প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন। আজ যুক্তফ্রন্টের কোন যুক্তসভা হয় না বা এক মঞ্চে বসে শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্টের নামে কোন কথা বলেন না—তার শুরু হয় এইখান থেকেই। রায়না ও টালিগঞ্জে সি পি এম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইদিন প্রথম যে যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তিতে আঘাত করেছিল তার জেরই আজ পর্যন্ত চলেছে। কয়েক মাস পরে এল মেদিনীপুরের বিধানসভা আর বসিরহাট লোকসভা নির্বাচন। মেদিনীপুরে কিন্তু সি পি আই বলল আমরা চাই যুক্তফ্রন্টের সভা যুক্তভাবে হোক। সি পি আই সি পি এম-কে মেদিনীপুরের সভায় যোগদানের আহ্বানও জানালো। কিন্তু সি পি এম থেকে বলা হল—না, এক মঞ্চে বক্তৃতা দিতে তাঁরা অক্ষম। তবে হ্যাঁ, সি পি এম মেদিনীপুর নির্বাচনে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে সমর্থন করে একটা প্রচারপত্র

বিলি করলো। মেদিনীপুর জেলার সি পি এম নেতা শ্রীসুকুমার সেনগুপ্তের নামে প্রচারপত্রটি প্রচারিত হয়—যাতে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে 'দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রচারপত্রে আরো বলা হয়েছে যে বাংলা কংগ্রেস সি পি এম-এর নামে গত কয়েক মাস ধরে কুৎসা রটনা করেছে এবং সি পি আই তাকে সমর্থন করেছে। অবশ্য এর পরেও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কেই ভোট দিতে বলা হয়েছে। যাই হোক, বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রণ্টের সভা বর্জন করেছে, কারণ বসিরহাট নির্বাচনে সি পি এম বাংলা কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেনি, বিরোধিতা করেছে। একই অভিযোগ মেদিনীপুর সম্পর্কে সি পি আই-ও করেছে। এদিকে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করেছেন যে, ১৫ মার্চের মধ্যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে মিনিফ্রণ্ট সরকার গঠনের চক্রান্ত হবে। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বা তাঁর দলের মতে অজয়-ডাঙ্গে চক্রান্তকারী, কায়েমী স্বার্থের দালাল, জোতদার পুঁজিবাদদের স্বার্থ-রক্ষাকারী, এমন কি জনস্বার্থবিরোধী।

যুক্তফ্রণ্টের ছিন্নমস্তা রাজনীতির এই হল আর এক রূপ—সেটা হল ভিলিফিকেশন অর্থাৎ কুৎসা বা চরিত্র হনন! অন্য দলের নামে এই বিরতিহীন কুৎসা গাওয়া—এ দোষ শুধু সি পি এম-এরই আছে তা নয়, হিসাব করলে এই রোগের কবলে অনেকেই পড়েছিল। তবু সি পি এম সম্পর্কেই একথা বলতে হয় কেন? এইজন্য যে সি পি এম যে শুধু সবচেয়ে বড় দল তাই নয়—সে নিজেকে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সবচেয়ে বড় হুকুমদার বলে মনে করে। জনগণের রায় তাদের দিকেই সবচেয়ে বেশী বলে দাবী করে। তাই অনেক অমৃতের মধ্যে এই বিষটুকুও তার প্রাপ্য। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের ছিন্নমস্তা রাজনীতির শরিক সকলেই কমবেশী আছেন—যাঁরা নিজের মুণ্ডু কেটে নিজে রক্তপান করছেন।

ছিন্নমস্তা রাজনীতির সায়াহ্নকাল উপস্থিত হ'ল। রাজ্যের রাজনীতির মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণীয় ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে দীর্ঘদিন যে ছিন্নমস্তা রাজনীতি চলছিল তার একটা সফল পরিণতি ঘটতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগে দৃঢ় সংকল্প, আর পদত্যাগ রুখতে একটা দাওয়াই বেরিয়েছে। সেটা হল৷ সি পি এম স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিলে সরকার বাঁচতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্ন উঠতেই বা এই প্রশ্নের পরিসমাপ্তি ঘটার আগেই ছিন্নমস্তা রাজনীতির কী নগ্ন ও বিকট চেহারা ধরা পড়েছে সেটা বোঝা ও জানা দরকার। কারণ যুক্তফ্রন্ট সরকার যাক অথবা থাক এই ছিন্নমস্তা রাজনীতি যে রাজ্যের ও রাজ্যের মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু সেটা বোঝা দরকার।

যে ঘটনাগুলিতে ছিন্নমস্তা রাজনীতি প্রকট হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল মিনিফ্রণ্টের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত স্বয়ং মিনিফ্রণ্ট সরকার গঠনের জন্য বাজারে ঘোরাফেরা করছেন। একই প্রকারে ঘুরছেন শ্রীসুশীল ধাড়া। শ্রীসুশীল ধাড়া যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে, বাবু জগজীবন রামের সঙ্গে দেখা করবেন—তরুণকান্তি ঘোষ আর সিদ্ধার্থ রায়কে পাশে ডাকবেন এর মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই—কিন্তু অবাক তখনই হই যখন দেখি শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত স্বয়ং ছুটে যান আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে বৌবাজারে। তাঁর বক্তব্য বাংলা কংগ্রেস যায় যাক—মিনিফ্রণ্ট করে তাঁরা যেন নির্বিঘ্নে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে রাষ্ট্রপতির শাসনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। শ্রীদাশগুপ্ত শুধু সি পি আই অফিসে রাজ্য মিনিফ্রণ্ট সরকার গড়বার কথা বলে যান তাই নয়, শ্রীসুকুমার রায়কে দেখিয়ে বলেছেন—অজয়বাবু, সুশীল ধাড়া যায় যাক, এই তো বাংলা কংগ্রেস রয়েছে। আবার একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে পি এম এল-এর জনাব নাসিরুল্লা খাঁও শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে

বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলছেন। রাজনীতির কী হাল হল বুঝুন। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তর কাছে অজয় মুখোপাধ্যায় হলেন দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক আর সুকুমার রায় খাতিরের লোক। অবশ্য একইভাবে প্রেমবিতরণ অন্যপক্ষ করছেন শ্রীঅনাদি দাসকে। এই সবের উপরে টেক্কা দিয়েছেন শ্রীজ্যোতি বসু। তিনি নাকি বলেছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তর বাংলা কংগ্রেসের হাতে না ছেড়ে নব কংগ্রেসের হাতে দেব। যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত এই কথা সত্য হলে বুঝতে হবে রাজ্যের ছিন্নমস্তা রাজনীতি একেবারে ঘড়ির কাঁটায় মিলে ঠিক পথেই চলছে। এখন অপেক্ষা শুধু একজনের আগমনের—তিনি শ্রীআশু ঘোষ। গতবার তিনি বাড়ী বন্দক দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের সরকার এই দুই সরকারকে উৎখাত করেছিলেন। তবে আশু ঘোষ আর রবি চৌধুরী মহাশয়কে দেখা না গেলেও সেই কাজে আরো দুজন যে না নেমেছেন এমন নয়। ফরোয়ার্ড ব্লক দপ্তরে গিয়ে যাঁরা বলছেন, অজয় মুখার্জী চলে গেলে আসুন আমরা সরকার গড়ি, দরকার হলে সি পি এম স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা দপ্তর আপনাদের পছন্দ মত নতুন কাউকে দেবার কথা ভাববে, অথবা যাঁরা বলছেন বাংলা কংগ্রেস দলত্যাগ করেছে তবু আমরা এই যুক্তফ্রন্টকেই যুক্তফ্রন্ট বলে চালিয়ে সরকার চালাবো—তাঁরা গতবার আশু ঘোষ ও রবি চৌধুরী যা করেছিলেন তাই করছেন, তবে সেটা একটু মার্জিতভাবে। এঁরা বলছেন বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করলে দশজন বাংলা কংগ্রেস এম এল এ বেরিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাবেন। তাঁরা আশা করেছেন অন্য দল থেকেও দু-একজন এম এল এ পাবেন। সি পি এম এতদিন বলতো যুক্তফ্রন্ট ভাঙলেই মধ্যবর্তী নির্বাচন, কারণ জনগণের রায় হল ১৪ দলের যুক্তফ্রন্টের উদ্দেশ্যে। কাজেই সেই ১৪ দল যদি ভাঙে, তবে আবার জনগণের কাছে যেতে হবে। আপাতত কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়া কোন পক্ষেই ১৪১ জন সদস্য

হওয়া সম্ভব নয়, তবু দুই পক্ষই দিনে, রাত্রে, সকালে, দুপুরে বৈঠক করছেন সরকার গড়তে বা অন্য দলের সরকার গড়া রুখতে।

অবশেষে গরু ও পোকা দুই-ই মরলো। গরুর গায়ে পোকা হতে বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর 'শ্রীসুশীল ধাড়া। পোকার হাত থেকে গরুকে বাঁচাতে প্রমোদবাবু আর সুশীলবাবু একটা খুব সহজ উপায় গ্রহণ করলেন। সেই উপায় হল গরুটিকে মেরে ফেলা। ফলে মরা গরুর গায়ে আর পোকা বাঁচবে না, পোকা-গুলো সব মরে যাবে। প্রমোদবাবু ও সুশীলবাবুর কাছে অনেকদিন থেকেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল ওই পোকা, আর দুজনেই উপায় খুঁজছিলেন পোকা মারার। অবশেষে ১৪ই মার্চ সেই পোকা মারা শেষ করেছেন তাঁরা। এখন দুজনেই নিশ্চিন্ত যে পোকার হাতে তাঁদের জীবন আর বিড়ম্বিত হবে না। কিন্তু গরুটা? এমন যে দুগ্ধবতী কামধেনু তার যে মৃত্যু হয়ে গেল? তা হোক। ওঁরা তো পোকার হাত থেকে বাঁচলেন। কিন্তু জনগণ—যাঁরা গণতান্ত্রিক সরকারের কামধেনুর বাঁটের দুধ শক্তিশালী করেছিলেন, প্রাণরক্ষা করছিলেন, তাঁদের কী হবে? লক্ষ লক্ষ একর চাষের জমি যা কৃষকরা জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে, জমিদার, জোতদার, ভেড়ির মালিকের দুর্গ ভেঙে দখল করে নিয়েছে, চাষ করেছে, একটা ফসল তুলেছে, রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ংভর করে তুলেছে—সেই কৃষকরা এখন কী করবে? পারবে এই চৈত্র বৈশাখে লাঙল দিতে সেই জমিতে? পারবে আউশ, আমন, পাট রুইতে। পারবে ঠেকাতে চৈতন্যপুরের রায়, ২৪ পরগণার নস্কর, সাঁপুই, সরকারদের লাঠির আঘাত থেকে মাথা বাঁচাতে? ঐ যে শ্রমিক, সে পারবে মালিকের ক্লোজার লক-আউট বেআইনী ছাটাই রুখতে? পারবে ঠেকাতে ঘেরাও ধর্মঘট করে দাবী আদায়ের সংগ্রামে পুলিশের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে? ঐ যে শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী যারা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পেতে চলেছিল. যারা দীর্ঘদিন

বরখাস্ত থেকে পুরাতন চাকুরী ফিরে পেয়েছিল অথবা দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর পে-কমিশনের যে রিপোর্ট অল্প কয়েকদিন পরে কার্যকরী হওয়ার কথা—থাকবে তো সব ঠিকমত? পাবে তো সব অধিকার? পরিবর্তন হবে তো কণ্ডাক্ট রুল্‌স্‌-এর, কার্যকরী হবে তো পে-কমিশনের রায়? ঐ যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবার মুখে এসেছিল, হবে তো সেটা? ঐ যে শ্রমিকদের জন্য খেসারতের আইন হচ্ছিল যে অন্যায় ভাবে কাউকে ছাঁটাই করলে শ্রমিক পুরা খেসারতে চাকরি ফিরে পেত, অন্যায় ভাবে চাকুরি থেকে বসিয়ে রাখলে বেতনের প্রায় তিনভাগ পেত, সেই সব আইন ঠিক ঠিক রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে কার্যকরী হবে তো? ঐ যে শহরের সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেবার কথা হচ্ছিল– হবে তো সেই আইন? যাঁরা পোকা মারতে গরু মারলেন এ প্রশ্নের জবাব তাঁদের দিতে হবে।

প্রথম থেকে যদি অজয়বাবু-সুশীলবাবু বলতেন যে আমরা সরকারে থাকতে চাই, সরকার করতে চাই—কিন্তু সি পি এম-এর সঙ্গে নয়। সি পি এম বা কমিউনিস্ট পার্টিকে অজয়বাবু-সুশীলবাবু ১৯৬৭ সালের পর প্রথম দেখেছেন বা চিনেছেন এমন নয়: ১৯৭৭ সালের পর কমিউনিস্ট বিরোধিতা অথবা কমিউনিস্টদের স্বরূপ প্রকাশ করেই তো তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক জীবন সজীব রেখেছেন। নইলে দেশসেবার রাজনীতি—সে তো অনেককাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আজ যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তাঁরা বললেন, আর সি পি এম-এর সঙ্গে নয়। যে কেউ যে কারো সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে কিন্তু এই বিচ্ছেদের পরোয়ানা জারি করা হল এমন একটা সময়ে যখন দলীয় রাজনীতির সিদ্ধান্ত শুধু দলের নয়, রাজ্যের সমগ্র জনজীবনকে বিপথে নিয়ে যায়, সংকটের আবর্তে ফেলে দেয়, তখন সেই সিদ্ধান্ত আর দলের থাকে না। আইনে আত্মহত্যার চেষ্টাও গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হয়।

সেই অপরাধের শাস্তি ও ফল ভোগ করতে হয়। আজ অজয়বাবু-সুশীলবাবু তাঁদের দলের এমন একটা সিদ্ধান্ত কার্যকরী করলেন যাতে যুক্তফ্রণ্টের মৃত্যু বা আত্মহত্যা সম্ভব হল।

হ্যাঁ, জ্যোতিবাবু-প্রমোদবাবুও যে অজয়বাবু-সুশীলবাবুকে ১৯৫৭ সালের আগে চিনতেন না এমন নয়। একদা অজয়বাবুকে জ্যোতিবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'কমিউনিস্টদের বাপান্ত করার জাবদা খাতাখানা কোথায় ?' অজয়বাবু বলেছিলেন 'তুলে রেখেছি।' যদি জ্যোতিবাবু আরও অনেক সময় দিতেন তবে হয়তো খাতাখানা উইয়ে কেটে নষ্ট করতে পারত। কিন্তু তাঁকে সেই সময় না দিয়ে বরং খাতাখানা পেড়ে আনবার জন্যে মই এগিয়ে দিলেন তাঁরা।

সুশীলবাবু বললেন, সি পি এমকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গড়াই তাঁর লক্ষ্য। উদ্দেশ্য যদি মহৎও হয় তবে সেটা তো অনেক আগেই হতে পারত। সেদিন যখন বেলভেডিয়ারের বাড়ীতে বসে অথবা সি পি এম-এর অফিসে গিয়ে প্রমোদবাবুর সঙ্গে সরোজ মুখার্জীর মাধ্যমে সি পি এম-বাংলা কংগ্রেস দাদা-ভাই হয়ে অন্যেরা যারা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর রাখবার জন্য লড়ছিলেন তাঁদের মুখে এঁটো-পাতা ছুঁড়ে দাদা-ভাই মসনদ ভাগ করে নিয়েছিলেন সেদিন কেন মনে পড়েনি আজকের কথা ?

কয়েক মাস আগে রাজ্যের যুক্তফ্রণ্টে যে ছিন্নমস্তা রাজনীতির শুরু হয়েছিল তার শেষ হল যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ও রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েমে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন রাজ্যের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশার মৃত্যু। সবই হয়ত একদিন কালের গ্রাসে বিলীন হয়ে যাবে, কিন্তু এই ছিন্নমস্তা রাজনীতির মধ্যে বিভিন্ন দল যে সোজা নাচ উল্টো প্যাঁচ, নাচতে নেমে ঘোমটা রক্ষার চেষ্টা এবং মল খসিয়ে লোক হাসানো সার করার রাজনীতির চিহ্ন রেখে গেলেন সেটা সহজে ভুলবার নয়।" (ছিন্নমস্তা রাজনীতি : কৃত্তিবাস ওঝা ॥ 'সপ্তাহ')

যুক্তফ্রন্টকে রক্ষার একটা শেষ চেষ্টা হয়েছিল ১৯৫৯ সালের ২৫শে জানুয়ারী। 'শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করুন' এই বলে একটা আবেদন পত্র প্রচার করা হয়েছিল। "আমাদের কর্তব্য" বলে ন'দফা কর্মসূচী প্রচার করা হয়েছিল। প্রচারপত্রে সই করেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, নির্মল বসু, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ১২ জন। এই হল সর্বশেষ যুক্ত আবেদনের দলিল।

কিন্তু ২৫শে জানুয়ারীর পর ২৪ ঘণ্টা না পেরুতেই ২৬শে জানুয়ারী নারকেলডাঙায় ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী দুর্গাপদ সরকারকে পিটিয়ে হত্যা করা হল। এই দিন করিমপুরে বাংলা কংগ্রেসের শিশুপাল দাসকে ছুরি মারা হল। ২৭শে ট্যাংরায় এস্ ইউ সি কর্মীরা আহত হল। চলল ছিন্নমস্তা রাজনীতি। "১৯৫৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটল ২০১টি। শরিকী সংঘর্ষে বিভিন্ন দলের আহত হল ৬৭৩ জন। অভিযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি ২৯২টি ক্ষেত্রে। আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়ায় ২৪ পরগণায় পুলিশকে ভর্ৎসনা করা হল ১০২টি ক্ষেত্রে। তদন্ত বন্ধ ও ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহার করা হল ১০১০টি ক্ষেত্রে।" (১৯৫৯ সালের ১৭ অক্টোবরের যুগান্তর থেকে।)

১৯৫৭ সালে মোট নিহতের সংখ্যা ছিল ১১৫৫ জন। এর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মী ৩৭৩ জন।

এই ছিন্নমস্তা রাজনীতির শেষ পরিণতি দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ও রাষ্ট্রপতির শাসন।

পদত্যাগের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের দেশবাসীর প্রতি আবেদন

—বেতার ভাষণ

(১৬ই মার্চ ১৯৭০—রাত্রি ৮ টা)

পশ্চিমবঙ্গের ভাই-বোনেরা,

আজ এক অসাধারণ অবস্থার মধ্যে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। একটানা পঞ্চাশ বছর ধরে আপনাদের সেবা করে আসছি। সে সেবা নিঃস্বার্থ কিনা, আপনাদের সন্তোষজনক কিনা—সে বিচার আপনারাই করবেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর কংগ্রেস কর্মী হিসাবে দেশ সেবা করার পর কেন কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম তাও আপনাদের অজানা নেই। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা কংগ্রেস গড়েছিলাম। প্রগতিশীল বামপন্থী দলগুলির সাথে হাত মিলিয়ে ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে নেমেছিলাম। তারপরের কাহিনী যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন, তার অপসারণ, প্রতিবাদে জনগণের সংগ্রাম, তাঁদের জয়ে পুনরায় অন্তর্বর্তী নির্বাচন—এ সবই আপনারা জানেন। ১৯৬৯ সালের এই নির্বাচনে আমরা চৌদ্দটি রাজনৈতিক দল একটি ৩২ দফা কর্মসূচী নিয়ে আপনাদের ভোট প্রার্থী হয়ে বলেছিলাম যে আমরা যেন একটি মাত্র দল। আরও বলেছিলাম নির্বাচনে আমাদের হাতে দেশ সেবার ভার দিলে আমরা এই কর্মসূচীকে রূপায়িত করার সাধ্যমত চেষ্টা করব। নির্বাচনে আপনারা আশাতীত ভাবে আমাদের সমর্থন করেছেন, আমরাও সরকার গঠন করে কয়েকটি দফার কাজ সম্পূর্ণ করেছি, কয়েকটি দফার কাজ হাতে নিয়েছি। কিন্তু দু-তিন মাস যেতে না যেতেই এক সর্বনাশা পরিস্থিতির উদ্ভব হল, যুক্তফ্রণ্টের দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ দেখা দিল এবং আজও চলছে দাঙ্গা, লুঠ, গৃহদাহ, সম্পত্তি নাশ, জখম, হত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি।

দলে দলে মারামারি ছাড়া সাধারণ নাগরিকের উপরও অনুরূপ অত্যাচার চলছে। সভ্য শাসনের ন্যূনতম নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে। যুক্তফ্রণ্টের কার্যসূচীর ২৬নং দফায় আছে—"যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমাজ বিরোধী ও অপরাধমূলক কাজের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।" ২৯নং দফায় আছে—"যুক্তফ্রণ্ট সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকারকে মর্যাদা দেবে ও রক্ষা করবে।" কিন্তু আজ এই সব অপরাধ সমানে চলছে, এই সব অধিকার নিষ্ঠুর ভাবে পদদলিত হচ্ছে। আজ রক্ষকই হয়েছে ভক্ষক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন প্রতিকার নেই। অসহায় নরনারী ছোট বড় সরকারী কর্মচারীর কাছে, পুলিশের কাছে, এমন কি মন্ত্রীদের কাছে গিয়েও কোন প্রতিকার পাচ্ছে না। তাদের নীরবে অত্যাচার সহ্য করা কিংবা অভিসম্পাত দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমন কি মুখ্যমন্ত্রী হয়েও আমি এদের বাঁচাতে পারছি না। যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে এই সব অত্যাচার বন্ধ করার বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। এ অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর গদী আঁকড়ে পড়ে থাকা মানে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং মহা অপরাধ করা বলে মনে করি। তাই আজ পদত্যাগ করলাম। অত্যাচার থেকে তাঁদের বাঁচাতে যদি নাও পারি—অন্তত তাঁদের দুঃখে সমদুঃখী, ব্যথায় সমব্যথী হতে তো পারব। ভবিষ্যতে এরূপ অত্যাচারের পুনরনুষ্ঠান যাতে না হতে পারে সেজন্য জনগণকে সজাগ ও সক্রিয় করার চেষ্টা করব। আজ প্রণাম জানাই আমার সেব্য ও নমস্য জনগণকে।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় (মুখ্যমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ)

শুরু হল রাষ্ট্রপতির শাসন। ১৯৫৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী 'বাংলা বন্ধ”-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই দিন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের শুরুতে সাঁইবাড়ির নৃশংস হত্যাকাণ্ড সহ নিহত হল ২১ জন। তারপর রাষ্ট্রপতি শাসনের দিনগুলি হয়ে ওঠে হত্যার খুনে রক্তাক্ত। এই খুন গুপ্তহত্যার রাজনীতি নতুন ভাবে মোড় নেয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জীবন মাইতির, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সুরেন ধর চৌধুরীর, ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা সুরজিত রায় চৌধুরীর হত্যার মধ্য দিয়ে। মহিলারাও রেহাই পান না। ১৯৫৭ সালের ১১ই জানুয়ারী প্রথম একজন মহিলা পুলিশ ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তারপর ৪ঠা অক্টোবর আহত হন কে জি বসুর স্ত্রী। রেহাই পান না শিক্ষক, অধ্যাপক। ১২ই জানুয়ারী বেলুড়ে ক্লাসের মধ্যে খুন হন একজন অধ্যাপক। ২৮শে জানুয়ারী প্রথম একজন নির্বাচনপ্রার্থী খুন হন—ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীসীতাপতি ব্যানার্জী। রাষ্ট্রপতির শাসনে গুপ্ত হত্যা ও খুনের রাজনীতি সম্পর্কে ৩টি লেখা তুলে ধরছি। যথা: ২:শে নভেম্বর ১৯৫৭ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত গৌরকিশোর ঘোষের রচনা "পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী হা হা" থেকে:

"দৃশ্য চোদ্দ: স্কুলের দোতলার ক্লাস থেকে চারটি ছেলে পাইপগান, লোহার রড নিয়ে একটি ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে আনছে।

ছেলেটি চ্যাচাচ্ছে—"স্যার, বাঁচান। বাঁচান। আমাকে খুন করবে। বাঁচাও। কে আছ বাঁচাও। পুলিশে খবর দাও।"

পাইপগানধারী—"চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক সব, যদি বাঁচতে চাও।"

একজন বারান্দায় একটা বোমা ছুড়ল। সবাই ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

ছেলেটাকে ওরা হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা যা পাচ্ছে, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরছে। ছেলেটা দরজা চেপে ধরল। ওরা

টানছে ওকে। ও প্রাণপণে দরজা চেপে আছে—"স্যার, বাঁচান, আমাকে বাঁচান।" একটা ছেলে লোহার রড পিটে ওর হাতের আঙুল ছেঁচে দিল। ওর মুঠো আলগা হয়ে পড়ল। বাঁ-চা-ও বাঁ-চা-ও। ওরা ওকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। ছেলেটা পেচ্ছাব করে ফেলল। বাঁচাও বাঁচাও।

লোহার রড বলল : "আর কোথাও নিয়ে যাওয়ার দরকার কি! এই গেটের বাইরেই শালাকে খতম করে দে।"

একটা ছেলে তার কানে পাইপগান ঠেকিয়ে গুলি করল। তারপর ওকে ফেলে রেখে নিরুত্তেজভাবে বেরিয়ে গেল। ছেলেটা পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ধড়ফড় করল। তারপর ঠাণ্ডা।...

...দৃশ্য চব্বিশ : হাত তুলে একটা লোক এল। বিড়বিড় করে বলল, "আমি মশাই গায়ক। কোন্নো সাতেপাঁচে নেই, বলুন দেখি কী বিড়ম্বনা।"

আরেকজন ঢুকলেন। বৃদ্ধ। হাইপাওয়ারের চশমা। বললেন, "আমি একজন অধ্যাপক, আমার মানসম্মান আছে। এসব কী হচ্ছে। অ্যাঁ।"

নেপথ্য থেকে গর্জন : "হ্যানড্স্ আপ।" বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি গৌরাঙ্গ হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আরেকজন রাগতভাবে ঢুকলেন। বললেন, "আমি রিটায়ার্ড জজ। আমি সব আইন জানি। পুলিশকে এমন যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা কে দিয়েছে, জানতে চাই।"

নেপথ্যে গর্জন : "হাত উঠাও, নইলে গুলি করব।"

রিটায়ার্ড জজ তাড়াতাড়ি হাত তুলে এবং কিঞ্চিৎ নরম সুরে বললেন, "ব্যাটা বড্ড গোঁয়ার। আইনকানুন যে জানেনা তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হয়তো দুম করে গুলিই ছুঁড়ে বসবে। তার চাইতে বাড়ি চলে যাই, জ্যোতিষ নিয়ে বসিগে। কোন্ গ্রহনক্ষত্রের কুদৃষ্টির

ফলে কপালে আজ যে এমন অপমানযোগ ঘটল সেটা ভাল করে মিলিয়ে নেওয়াই তো ভাল, নয় কি ?"

...দৃশ্য পঁচিশ : একজন পুলিশ অফিসার ঢুকলেন। ডান হাতে রিভলভার, বাঁ হাতে পোর্টেবল মাইক্রোফোন। দুমদুম করে দুটো ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলেন। তারপর মাইক্রোফোন মুখে তুলে বললেন, "যে যেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে আছেন সেই অবস্থায় থাকুন সবাই। খবরদার, কেউ নড়বেন না।" রিভলভার তুলে শূন্যে আরো দুটো ফায়ার করলেন তিনি। তারপর আবার মাইক্রোফোন মুখে তুলে বললেন, "আপনারা কেউ নড়বেন না, এখনি পুলিশ কমিশনার আসছেন। জনসংযোগ করবেন।" চারজন পুলিশ চারদিকে রিভলভার উঁচিয়ে এক ব্যূহ রচনা করে ঢুকল—ব্যূহের ভিতরে পুলিশ কমিশনার। ব্যূহের ভিতর থেকেই পুলিশ কমিশনার হাঁক ছাড়লেন, "নবকেষ্ট।"

পুলিশ অফিসার দৌড়ে এসে খটাস করে এক স্যালুট দিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে বললেন, "ইয়েস স্যার।"

পুলিশ কমিশনার : "সব ঠিক আছে ?"

পুলিশ অফিসার অ্যাটেনশন হয়ে : "ইয়েস স্যার।"

পুলিশ কমিশনার : "মাইক দাও।" পুলিশ অফিসার বলল, "অ্যাটেনশন।" চারজন কনস্টেব্‌ল্ চারদিকে মুখ করে অ্যাটেনশন হল। পুলিশ অফিসার যথেষ্ট শক্ত হয়ে এক দো তিন—তিন পা এগিয়ে গেলেন। প্যারেডের ছবি। নবকেষ্ট পা ঠুকে দাঁড়ালেন। একটা স্যালুট দিলেন। মাইক্রোফোনটা রাইফেলের মত একবার বুকের কাছে এনে ওটা কমিশনারের হাতে দিলেন। স্যালুট করলেন। তিন স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড মার্চ করলেন। অ্যাটেনশন, তারপর 'স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ্' হয়ে দাঁড়ালেন।

পুলিশ কমিশনার : "নবকেষ্ট, তুমি একটু এগিয়ে ওই মোড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়াও।"

নবকেষ্ট : "ইয়েস স্যার।"

পুলিশ কমিশনার : "কড়া নজর রাখবে। বুঝেছ ?"

নবকেষ্ট : "ইয়েস স্যার।"

পুঃ কঃ : "একটু এদিক ওদিক দেখলেই ইউ শূট।"

নবকেষ্ট : "ইয়েস স্যার"—বলে স্যালুট দিয়ে রিভলভার বাগিয়ে মার্চ করে বেরিয়ে গেল।

পুলিশ কমিশনার চারজন কনস্টেবলের ব্যূহের ভিতর দাঁড়িয়ে চোঙ্গা মুখে দিয়ে বললেন, "বন্ধুগণ, আজকের আমার এই জনসংযোগের উদ্দেশ্য, আপনাদের একটা কথা দৃঢ়ভাবে জানানো যে পুলিশের মনোবল দারুণ হাই। আমি পুলিশ কমিশনার, আমি একথা পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে জানাচ্ছি যে, পুলিশ ফোর্সের সাহস অটুট আছে। এবং পুলিশের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমরা আগে যেখানে একটা পুলিশ দিতাম, এখন সেখানে দুটো তিনটে পুলিশ দিচ্ছি। আর তাদের হাতে ঢালাও রাইফেল রিভলভার দিয়েছি। দরকার লাগলে বোমাও দেব। এইভাবে আমরা শহরের আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনব। শৃঙ্খলা যে বেশ খানিকটা ফিরেছে তা এখন শহরের রাস্তাঘাটে ঊর্ধ্ববাহু লোকের সংখ্যা দেখলেই বুঝতে পারবেন। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানও আপনাদের সাহায্য করবে। মাত্র তিন মাস আমরা গৌরাঙ্গ মুদ্রা চালু করেছি। প্রথম মাসে ৩৩%, দ্বিতীয় মাসে ৫৭%, এবং এ মাসে, এ মাস শেষ হতে যদিও বারো দিন বাকী আছে এবং সব থানার রিপোর্ট এখনও পাইনি, এরই মধ্যে ৭৮% লোক গৌরাঙ্গ মুদ্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এই অগ্রগতি, আমি তো মনে করি পুলিশ ফোর্সের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহব্যাঞ্জক। নয় কি ? এইবার অস্ত্রের কথা। আগেই আপনাদের বলেছি সব পুলিশের হাতেই আমরা অস্ত্র দিয়েছি। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, রাইফেল রিভলভার তো সবাই চালাতে জানে না। আমরা যারা জানি, বহুদিনের অনভ্যাসের

দরুন তাদের হাতেও আজ আর ভালো টিপ নেই। তাই আমরা সবাই পাইকারীহারে আগামী তিন মাস হাতের টিপ প্র্যাকটিস করে নেব সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সুখের কথা আমাদের প্রশাসনের বিজ্ঞ অফিসারদের আমাদের সমস্যা সম্পর্কে আমরা যখন ওয়াকিবহাল করেছি তখন তাঁরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তা বিচার করে দেখেছেন এবং আগামী তিন মাস অর্থাৎ পুলিশের টিপ প্র্যাকটিসের মরশুমে পুলিশের গুলীতে কেউ মারা গেলে তার কোন তদন্তই হবে না, এই আশ্বাস পুলিশকে দিয়েছেন। আমরা আনন্দিত যে পুলিশকে তাঁরা পুলিশ হিসাবে না দেখে মানুষ হিসাবেই বিচার করেছেন। আপনাদের কাছেও আমার অনুরোধ যে আপনারাও পুলিশকে মানুষ হিসাবেই গণ্য করবেন। এবং জানেন তো মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। তাই আগামী এই তিন মাসে বেচারী আনাড়ী পুলিশ-মানুষেরা হাতের টিপ প্র্যাকটিস করতে গিয়ে যদি রামকে মারতে শ্যামকে মেরে ফেলে, অবশ্যই ভুল করে, তবে তা নিয়ে হৈচৈ করবেন না। কারণ, আমরা তো আপনাদের নিরাপদেই রাখতে চাই।"

মুখ থেকে চোঙা নামিয়ে পুলিশ কমিশনার হাঁক দিলেন: "নবকেষ্ট।" নবকেষ্ট দৌড়ে এসে অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট দিল। তারপর প্যারেডের কায়দাকানুন যথোচিতভাবে পালন করে চোঙাটা পুলিশ অফিসারের হাত থেকে নিয়ে নিল। পুলিশ কমিশনার হুকুম দিলেন: "শ্যূট, শ্যূট টু কিল।"

······দৃশ্য ত্রিশ: গোটাকতক মাস্তান এসে বাসটা ঘিরে ফেলল, এক মাস্তান ড্রাইভারকে বলল, "কি বে, খুব যে নকশা দেখিয়ে ভেগে পড়া হচ্ছে। কালাপূজার চাঁদাটা?" ড্রাইভার দেঁতো হেসে বলল, "কেন দাদারা, কাল যে দিয়ে গেলাম।" মাস্তান বলল, "রসিদ দেখি।" ড্রাইভার রসিদ দেখাল। মাস্তান ঠাস করে ড্রাইভারের গালে এক চড় মেরে বললে, "মজাকি বার করছি। শালা আমাকে ফল্‌স্‌ দিচ্ছ।"

ড্রাইভার চড়চাপড় খেতে খেতে বলল, "এত চাঁদা রোজ রোজ কোথা থেকে দেব ; কতজনকে দেব ?" ড্রাইভারের পেটে এক ঘুঁসি ঝেড়ে মাস্তান বললে, "আবার রংবাজি হচ্ছে।" যাত্রীরা চুপ।

...দৃশ্য চৌত্রিশ : চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। বাঁ দিক থেকে একটা বোমা এসে পড়ল মিছিলে। পাঁচ ছজন পড়ে গেল। কেউ মৃত, কেউ বা আহত। মিছিলের লোকগুলোর কেউ কেউ মৃত ও আহত সঙ্গীদের ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলে গেল, কেউ কেউ বা মাড়িয়ে।

বাঁ দিকে উল্লাসধ্বনি : আরও শ্রেণীশত্রু খতম।

ডানদিকে থেকে কয়েক ঝাঁক গুলী এসে সেই বোবা মিছিলের আরও কয়েকটা লোককে মাটিতে শুইয়ে দিল। মিছিলের বাকি লোকেরা তাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। কেউ কেউ ওদের ডিঙিয়ে গেল, কেউ কেউ বা মাড়িয়ে।

ডান দিক থেকে আওয়াজ উঠল : সিক্স্ রাউণ্ডস্ ফায়ার স্যার, থ্রি স্পট ডেড, থ্রি ইনজিওরড স্যার। ইয়েস স্যার। অল অব দেম আর নোটেড ক্রিমিন্যাল স্যার, ওয়াগন ব্রেকারস্ স্যার। হ্যাঁ স্যার, কয়েকজন নকশালও আছে স্যার।"

...দৃশ্য ছত্রিশ : কলেজের প্রিন্সিপ্যাল উদভ্রান্তের মত এগিয়ে এলেন, বললেন, "ল্যাবরেটারি ভেঙে তচনচ করে ওরা চলে গেল। ওরা সংখ্যায় ছিল বারোজন। আমার কলেজে ? অধ্যাপক ত্রিশজন, ছাত্রসংখ্যা সাড়ে সাতশো, অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা সাতাশ, আর দারোয়ান মালী দশজন।"

প্রধান শিক্ষক উদ্‌ভ্রান্তের মত এগিয়ে এলেন। কাতরভাবে বললেন, "পরীক্ষার হল ভেঙে তচনচ করে দিয়ে ওরা চলে গেল। ওরা সংখ্যায় ছিল দশজন। পাঁচশো ছাত্র পরীক্ষায় বসেছিল।"

খবরের কাগজের এডিটার এলেন, বললেন, "জনসাধারণের বিবেক বলে কিছু আছে নাকি যে, তা জাগ্রত করার জন্য কলম ধরব ?

আসলে কী জানেন, এখন এগেনস্ট কারেন্ট। সকলেরই মোরেল ভেঙে গেছে খবর রাখি তো। এখন কিছু কমিট না করাই ভালো। সময় আসুক, তখন দেখবেন, একেবারে আগুন ছুটিয়ে দেব। বলি, আমি যে লিখব আমার লাইফের গ্যারান্টি কে দেবে? আর মশাই, কাশী মিত্তিরও চিনি আর নিমতলাও চিনি। নিতান্ত মরে আছি, তাই পথটা দেখাতে পারছিনে। হেঃ।"

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল : "ঠিক বলেছেন, আমি যে কিছু করব, আমায় প্রোটেকশন কে দেবে?"

প্রধান শিক্ষক : "তাই তো মশাই, ওসব কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়িনে আমি। আমি শিক্ষাব্রতী, ছাত্রদের কিসে ভাল হয় তাই দেখাই আমার কাজ। আমি তাই কষে এমন সব নোট বই লিখে যাচ্ছি, যা পড়লেই সিওর সাকসেস্।"

…দৃশ্য সাঁইত্রিশ : প্রোফেসর হেলমুট বললেন, "আমরা অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। আমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লক্ষ লক্ষ লোকের রক্ত ঝরেছে। তারা আমাদের চৈতন্য জাগ্রত করার জন্য দধীচির মত আত্মাহুতি দিয়েছে। তবু আমাদের চোখ খোলেনি। আমার অন্তরাত্মায় এই অশুভের ছায়াপাত ঘটেছিল। আমরা জানতাম, আমরা সর্বনাশের দিকে যাচ্ছি। কিন্তু হায়, জেনেও বুঝতে চাইনি। বুঝলেও প্রতিকার করার চেষ্টা করিনি। কোনও রকম নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি। আমরা গণতন্ত্রবাদীরা তখন একেবারে নপুংসক হয়ে পড়েছিলাম।"

উহারা সি. পি. এম : উহারা থানা হইতে আসিয়াছিল

—শ্রী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতকাল। চারিদিকে ভোরের কুয়াশা। স্ত্রী ও কন্যাসহ নিতাই ঘুমাইতেছিল। সমগ্র অঞ্চল লেপমুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন। দরজা ধাক্কাইয়া উহারা বলিল, "খুলুন, আমরা পুলিশের লোক, থানা হইতে আসিতেছি।" আশ্চর্য, মিথ্যা পরিচয় হিসাবে কত কিছুই তো বলা চলিত। কিন্তু উহারা ঠিক এই কথাই বলিল। ভবিষ্যতে যখন ইতিহাস লেখা হইবে তখন এই অমোঘ আত্মপরিচয়ের প্রকৃত তাৎপর্য নিশ্চয় গোপন থাকিবে না। শ্রীমতী জ্যোৎস্না উঠিয়া ছিটকিনি খুলিল। শ্রীমান নিতাইও উঠিয়াছে। তাহার চোখের ঘুম তখনও নিঃশেষে মিলায় নাই। ছিটকিনি খোলার শব্দ পাইবামাত্র উহারা ঝাঁপ দিয়া ভিতরে ঢুকিল। অনেকগুলি পরিচিত মুখ। হাতে পাইপ গান, বোমা। নিতাইয়ের বুকে বন্দুকের নল ঠাসিয়া উহারা গুলি করিল। সম্ভবত সেই গুলিতেই নিতাইয়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

সেই দৃশ্য দেখিল তাহার স্ত্রী ঝুনু, তাহার কন্যা বুলা। বুলার বয়স আড়াই বৎসর, সে আধো আধো কথা বলিতে শিখিয়াছে। সে দেখিল কাল রাতেও তাহার বাবা যে সুন্দর মুখখানি দিয়া বুলার কপালে কত না সোহাগ চিহ্ন আঁকিয়াছিল এই আগন্তুকরা সেই মুখে একটা নল ভরিয়া দিল। তারপর শব্দ। ভাগ্য যে বুলা পুরা কথা বলিতে শিখে নাই। শিখিলে কি বলিত। নিতাইয়ের কন্যা বড় হইয়া যখন কথা বলিবে তখন সে প্রথম কথাটি কি বলিবে ?

কমিউনিস্ট নিতাই মরিল। শ্রেণী শত্রু খতম হইয়াছে। উহারা কি তারপর চলিয়া গেল ? না, কমিউনিস্ট আন্দোলনে মার্কসবাদী অবদান তো শেষ হয় নাই। উহারা সেই মৃতদেহের উপর সেই ঘরে পরপর পাঁচটি বোমা ফাটাইল। বোমার স্পিল্‌নটার গিয়া লাগিল শ্রীমতী জ্যোৎস্নার গলায়, কনুইয়ে, পায়ে। নিতাই দরিদ্র ছিল। ছোট্ট একখানা

ঘরে তাহার সংসার। সামান্য আসবাব, কিছু বইপত্র, পোস্টার লিখিবার কাগজ ও রং তুলি। বোমার দাপটে সব ছত্রাকার হইয়া গেল। ঘরের জানালা তখনও খোলা হয় নাই, বোমার বিষাক্ত ধোঁয়ায় বন্ধ ঘর যেন নরক। নিতাইয়ের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। আহত জ্যোৎস্না মূর্ছিত হইয়া মৃত নিতাইয়ের শরীরকে আঁকড়াইয়া ধরিল। বুঝি অচৈতন্য অবস্থায়ও তাহার ভয় "মার্কসবাদীরা" এই মৃতদেহকে আরও অপমান করিবে। জীবন ও মৃত্যু এই ভাবে সেই মেঝেয় পাশাপাশি পড়িয়া রহিল। কমিউনিস্টের স্ত্রীর রক্ত এইভাবে এক প্রবাহে মিশিল।

পাইপ গান ও বোমার শব্দে ঘুম ভাঙায় পাশের ঘর হইতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বুড়ী মা বৃদ্ধ পিতা ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের কনিষ্ঠ পুত্রটি বেশ কিছু দিন বাড়ীছাড়া। সি পি এম একবার তাহাকে রাস্তায় আক্রমণ করিয়াছিল। বুড়াবুড়ী বুঝিলেন, আজ বাড়িতেই আক্রমণ করিয়াছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ছিল। ছুটির দিন। পুত্র পোর্ট কমিশনার্সে চাকরী করে। পুত্রবধূও প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষিকা। রবিবার সকালে নিতাই চাঁদা তুলিতে ও পোস্টার মারিতে বাহির হইলেও দিনটি ছুটির দিন। বুলার মতোই দুই বুড়াবুড়ী তাই রবিবারের জন্য অপেক্ষা করেন। আজ জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত মুখ দেখিয়া তাঁহাদের সাধের রবিবার শুরু হইল। নিতাইয়ের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহারা দেখিলেন স্বামীর ছিন্ন ভিন্ন দেহ আগলাইয়া আছে হতচেতন ঝুনু। কপালের সিঁদুর চিরতরে মুছিতে হইবে বলিয়াই বুঝি স্বামীর রক্তে হতভাগিনী নিজের সিঁথি ভালো করিয়া রাঙাইয়াছে। প্রতিবেশী বাড়ীগুলির দরজা জানালাও ততক্ষণে খুলিয়া গিয়াছে। তাহারা মানুষ, তাহারা সাধারণ লোক। তাই নিতাইয়ের বাড়ীতে কিছু ঘটিয়াছে বোঝা মাত্র সেই দিকে দৌড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই প্রচণ্ড বাধা পাইল। একটি কিশোর এতৎসত্ত্বেও ছুটিয়া আসিয়াছিল, ধরা পড়িয়া প্রচণ্ড মার খাইল। মার

খাইতে খাইতে মরিয়ার মত পাশের পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ডুব সাঁতারে কিছুদূর যাইবার পর নিশ্বাসের অভাবে ছটফট করিয়া মাথা তুলিতেই সেই কিশোরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উহারা বোমা ছুঁড়িল।

পর দিবস যখন মর্গ হইতে নিতাইয়ের মৃতদেহ আসিল চারিদিকে তখন জনসমুদ্র। ফুলের মালায় নিতাইয়ের মৃতদেহ সজ্জিত। প্রসন্ন মুখ। শ্রীমতী জ্যোৎস্না কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল: "একটি বার চোখ তুলে চাও, আমি তোমার ঝুনু, তোমার ঝুনু…।"

উহারা আসিয়াছিল রাতের অন্ধকারে। বলিয়াছিল, আমরা পুলিশের লোক। থানা হইতে আসিতেছি। চারিদিক ছিল জনমানব শূন্য। আর দিনের আলোয় শত সহস্র চোখের সামনে শ্রীমতী জ্যোৎস্না চিৎকার করিয়া বলিল, "আমি তোমার ঝুনু।" সে যে কমিউনিস্টের স্ত্রী, সেই তো সত্য পরিচয় দিবে।

নিতাইয়ের চোখ আধখোলা। সে যেন শেষবারের মত কমিউনিস্ট আর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট-এর প্রভেদটি দেখিতেছে। সত্য আর মিথ্যার প্রভেদটি দেখিতেছে। ভালবাসা আর কৃতঘ্নতার প্রভেদটি দেখিতেছে। জীবন আর অন্ধকারের প্রভেদটি দেখিতেছে। মাত্র তিন বছরেই তাহার বিবাহিত জীবন শেষ হইয়া গেল।

রাষ্ট্রপতি শাসনে ২০৬ জন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট শহীদ হয়েছেন

রাষ্ট্রপতি শাসনের এগারো মাসে পশ্চিম বাংলায় শ্রেণীসংগ্রাম এবং গণ-আন্দোলনের ময়দানে অত্যাচারের বন্যা বয়ে গেছে। দমন-পীড়নের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ বৃহৎ ধনিক ও শাসক গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের শোষণ অত্যাচার এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত হেনে এগিয়ে চলেছেন। গরীব ও মধ্যবিত্তের এই দুর্জয় অগ্রগতিতে দেশের পুঁজিপতি, জোতদার-জমিদার

এবং কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা ক্ষমতা হারাবার আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে গণ-আন্দোলনের কর্মীদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে। এই আক্রমণেরই জঘন্য রূপ হচ্ছে গণসংগ্রামের কর্মীদের • হত্যা। সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠী, দেশের কায়েমী স্বার্থ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের একাংশ এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে, মদত দিচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনা করছে। নকশালপন্থী-নামধারী যুবকদের, সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তদের, কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা এই হত্যাভিযানে ব্যবহার করেছে।

যেহেতু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গণ-সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছে সেই হেতু এই পার্টির বিরুদ্ধেই তাদের আক্রমণ আজ কেন্দ্রীভূত। শ্রেণীসংগ্রামের গৌরবদীপ্ত এই দু বছরে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ২৮৫ জন কর্মীকে জীবন দিতে হয়েছে হয় শ্রেণী সংগ্রামের ময়দানে নতুবা গুপ্ত ঘাতকদের হাতে! এই ২৮৫ জনের মধ্যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে নিহত হয়েছেন ৭৯ জন এবং রাষ্ট্রপতি শাসনের ১৭ই মার্চ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি এই সময়ের মধ্যে নিহত হয়েছেন ২০৬ জন। যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন পার্টির প্রবীণ নেতা, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, সরকারী কর্মচারী, মহিলা এমন কি পার্টি সমর্থক কিশোরও। সি আর পি ও পুলিশের একাংশ, তিন কংগ্রেস, নকশালপন্থী, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, এস ইউ সি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বিরোধী চক্রগুলির ঘাতক বাহিনী এই হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে।

(গণশক্তি, ৩রা মার্চ)

১৫ই জানুয়ারী মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীএস পি সেনবর্মা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৫৭ সালের

১লা জানুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যের ছিন্নমস্তা রাজনীতির বলি তথা খুন হল ২০১ জন। ২০শে ফেব্রুয়ারী খুন হলেন হেমন্তকুমার বসু। হত্যা, সংঘর্ষ, গুলী, বোমা—এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই চলেছে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি। কোথাও নির্বাচনের পোস্টার লাগাতে গিয়ে কর্মী নিহত হচ্ছেন, কোথাও নির্বাচনী প্রচার কর্মী গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিচ্ছেন। কোথাও নির্বাচনী অফিস ও সভা আক্রমণ হচ্ছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ওপর সর্বশেষ আঘাত—'প্রার্থী খুন'। ইতিমধ্যে খুন হয়েছেন চণ্ডী-তলার ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীসীতাপতি ব্যানার্জী, সিউড়ির নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীযদুগোপাল রায়, উখড়ার বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীদেবদত্ত মণ্ডল, আর এই প্রার্থী খুনের সর্বশেষ বলি শ্রীহেমন্ত-কুমার বসু।

"নির্বাচন প্রার্থী হেমন্তকুমার বসু খুন হলেন—খুন হল গণতন্ত্র—খুন হল সভ্যতা—খুন হলেন পিতা।"

পরিশিষ্ট

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলুন

•সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে শ্রীহেমন্তকুমার বসুর সর্বশেষ ভাষণ

সহযোগী প্রতিনিধি, সহকর্মী ও বন্ধুগণ,

আমরা আজ এক সংকটময় মুহূর্তে এখানে মিলিত হয়েছি। ১৯৬৬ সালে মাদুরাইতে দলের বিগত অধিবেশনের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলে দেশের রাজনীতির চেহারা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। পরিবর্তিত অবস্থায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, কিভাবে আমরা তার সম্মুখীন হব, এই সম্মেলনে তা স্থির করতে হবে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকসন সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিশ্বব্যাপী এমন এক জঙ্গী নীতি অনুসরণ করছে, যার ফলে যে কোন মুহূর্তে বড় রকমের যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে তারা আজও ভিয়েতনামে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। কমিউনিজম প্রতিরোধের নামে তারা বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। পশ্চিম এশিয়ায় ইজরায়েলী আক্রমণের পিছনে তাদের উসকানি রয়েছে। ইজরায়েল বেআইনীভাবে বিস্তীর্ণ আরব ভূমি দখল করে রয়েছে এবং প্রতিদিন আরব দেশগুলির উপর বোমাবর্ষণ করছে। বর্তমানে সেখানে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইজরায়েলের এই কুকর্মের পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে। ইউরোপে এরা আজ 'ন্যাটো' সামরিক জোটকে জোরদার করছে এবং যুদ্ধবাদকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

কিন্তু বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আজ সাম্রাজ্যবাদীদের এই চক্রান্ত প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সর্বত্র তারা সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উপনিবেশবাদের যুগ শেষ হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপে এবং সর্বত্র শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দীর্ঘ দিনের উপনিবেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে এবং

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন্ আমেরিকায় বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু এখনও কয়েকটি দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন রয়েছে। হংকং ও জিব্রাল্টারে ব্রিটিশ উপনিবেশ রয়েছে, ম্যাকাও, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিকে রয়েছে পর্তুগীজ শাসন। এই সব দেশের মুক্তিকামী জনগণ সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদের ভগ্নাবশেষ নিশ্চিহ্ন করার জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষীরা উগ্র বর্ণ বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের পদানত রাখার জন্য ঘৃণ্য ফাসিস্ত কায়দায় চলছে। তবে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে যে জাগরণ হয়েছে, তার ফলে এ কথা নিশ্চয় করে কথা বলা যায় যে শ্বেতশাসনের দিন ফুরিয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান ও মূলধন বিনিয়োগের সুযোগে মার্কিন, ব্রিটিশ এবং কোথাও কোথাও ফরাসী ও জার্মানীর শিল্পপতিরা অনুন্নত দেশে একচেটিয়া শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই সব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করছে।

সাম্প্রতিক কালে সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যারা সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে চায় তারা চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন কোন আচরণে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়েছে। সংকীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত হয়ে চীন সন্ত্রাসবাদের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। চীন এখনও ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে রয়েছে এবং চীন যে ভারতীয় অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে তার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। কিছুদিন পূর্বে চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের জোর সীমান্ত-সংঘর্ষ হয়ে গেছে।

১৯৬৮ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ওয়ারশ গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য দেশ চেকোস্লোভাকিয়ায় যে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে, তা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের নেতৃত্বে পরিচালিত চেক কমিউনিস্ট পার্টিও সরকার যদি সমাজতন্ত্রের পথ থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েও থাকেন, তবু বাইরের সামরিক হস্তক্ষেপ কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। এই ঘটনার ফলে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও এই শিবিরের নেতা সোভিয়েট ইউনিয়নের মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বন্ধুগণ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের যেখানে যে সংগ্রাম চলছে, তার পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে, সর্বতোভাবে সে সংগ্রামকে সমর্থন করতে হবে। পুঁজিবাদীদের আঘাতের বিরুদ্ধে আমরা সর্বদা সমাজতান্ত্রিক

দেশগুলিকে সমর্থন করব। কিন্তু তারা যদি কোন নিন্দনীয় কাজ করে কিংবা সামগ্রিকভাবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কার্যে লিপ্ত হয় তবে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব।

পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শক্তির উদ্ভবকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার বর্তমানে সুস্পষ্টভাবে ভারতবিরোধী নীতি অনুসরণ করছে এবং পুরনো কায়দায় সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপথগামী করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এই ভারত বিরোধী চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে নয়টি রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয় ও লোকসভায় এই দলের আসন সংখ্যা হ্রাসের ফলে দেশের এতদিনের একচেটিয়া কংগ্রেস শাসনের অবসান হয়েছে। ১৯৬৯ সালের 'ক্ষুদে সাধারণ নির্বাচনে' অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের অন্তর্বর্তী নির্বাচনেও কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটেছে। তেইশ বছর ধরে কংগ্রেসী কুশাসনে জর্জরিত সাধারণ মানুষ আজ কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করতে এগিয়ে এসেছে। দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি এবং শ্রমিক ও কৃষকের একটানা সংগ্রামের ফলেই এই জিনিস সম্ভব হয়েছে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসের পক্ষে এককভাবে কেন্দ্রে সরকার গঠন সম্ভব হবে না।

কংগ্রেস আজ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এদের [illegible] একটি দল অপরটির তুলনায় প্রগতিশীল, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। পুঁজিবাদীদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী অন্তর্নিহিত সংঘাতের ফলেই কংগ্রেস দলে এই ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে এবং কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠীই পুঁজিবাদীদের স্নেহধন্য। ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেবার নানা চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই দলের বোম্বাই অধিবেশনের পর এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, সমাজতন্ত্র নয়, পুরনো মিশ্র অর্থনীতিই তারা অনুসরণ করবে।

কায়েমী স্বার্থের কবল থেকে বেরিয়ে আসা এদের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং এই কারণে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য কোন প্রগতিশীল অর্থ-নৈতিক সিদ্ধান্ত এরা গ্রহণ করতে পারে নি।

ব্যাপক ও পর্যাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও ১৪টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ আমরা সমর্থন করেছি এবং ভবিষ্যতেও যদি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কোন ভাল কাজ করেন তবে আমরা তা সমর্থন করব। এবং কংগ্রেসের বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে সর্বস্তরে কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা যায়।

অনেকগুলি রাজ্যে কংগ্রেসের প্রায় অবলুপ্তির ফলে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বামপন্থী দলগুলির সম্মুখে এক নূতন সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছে এবং অপর কয়েকটি রাজ্যে তারা অন্য দলের সঙ্গে একত্রে অ-কংগ্রেসী সরকার স্থাপন করেছে। এই সরকারগুলি জনসাধারণের স্বার্থে কিছু ভাল কাজ করলেও, এই সব সরকারের কার্য পরিচালনায় যথেষ্ট বিক্ষোভের কারণ আছে। অনেকগুলি রাজ্যে আইন সভা সদস্যের দল বদল আজ একটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। জনগণের কল্যাণ চিন্তার পরিবর্তে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ তথাকথিত অকংগ্রেসী সরকারের পিছনে কাজ করেছে। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বাড়াবাড়ির ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের দলীয় স্বার্থে প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করছে এবং তারা তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দিতেও ইতস্তত করছে না।

জনসাধারণ কংগ্রেস সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে অ-কংগ্রেসী সরকার পরিচালিত হচ্ছে তাও তারা চায় নি।

ইদানীংকালে কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আন্দোলন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেসের শক্তি হ্রাস, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং অপর কয়েকটি রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলি যদি মেহনতী মানুষের এই সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ায় এবং নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করে সর্বনিম্ন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হয়, তবে এই সব সরকারের পক্ষে জনগণের স্বার্থে কার্যকরী কিছু করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

কেরলের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, পঞ্চদলের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার জনগণের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তাদের

সংকীর্ণ নীতির জন্য জনগণের দ্বারা কোণঠাসা হয়েছে। অচ্যুত মেনন সরকার যতদিন জনগণের স্বার্থে কাজ করবেন, ততদিন তাঁরা দেশের সকল শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের সংকট এখনও কাটেনি, বরং অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এই সংকট আরও ঘনীভূত হবে। আমরা ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে বারে বারে ঘোষণা করেছি, আমরা বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট সরকার রক্ষা করতে চাই এবং ফ্রণ্ট থেকে কোন দলকে বাদ দেবার চেষ্টা আমরা সমর্থন করব না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, যেভাবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট ও সরকার চলেছে, তাও চলতে পারে না। আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সংকীর্ণ ও ঐক্য বিরোধী আচরণের ফলে যুক্তফ্রণ্টে বর্তমানে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আইন ও শৃঙ্খলার নিশ্চিত অবনতি ঘটেছে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সরকারী যন্ত্রের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে। এই দল মুখে মার্কসবাদের কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে আজ মেহনতী মানুষের সংগ্রামকে জোরদার করার পরিবর্তে অন্য বামপন্থী দলের বিরুদ্ধাচরণের কাজেই সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। পুলিশের পরোক্ষ সমর্থনের জোরে এবং সমাজবিরোধী ব্যক্তি, জোতদার ও কায়েমী স্বার্থের লোকদের সাহায্যে এরা আজ অপর বামপন্থী কর্মীদের ওপর একটানা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমরা ঐক্য রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। কিন্তু কেউ যদি আমাদের কোন কর্মীর ওপর হামলা করে, তবে অবশ্যই আমরা পালটা আঘাত করব।

পশ্চিমবঙ্গে যদি যুক্তফ্রণ্টকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় এবং জনগণের স্বার্থে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কাজ পরিচালনা করতে হয়, তবে আসুন, যুক্তফ্রণ্টের সভায় বসে সকল সমস্যার আলোচনা করুন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করুন। এই পথেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

আমাদের আজ অন্তর্দলীয় বিরোধ বন্ধ করতে হবে। কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী গণ-আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত ও বিচলিত এবং এই আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য আজ তারা বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে। আমাদের সম্মিলিতভাবে এই চক্রান্ত প্রতিরোধ করতে হবে এবং মেহনতী মানুষের আন্দোলনকে আরও সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভারতীয় সংবিধানের পরিবর্তনের জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে—ধনিক

শ্রেণীর স্বার্থে রচিত এই সংবিধান আজ সকল প্রকার প্রগতি ও সমাজ কল্যাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজ্যের জন্য আরও বেশি ক্ষমতা ও আরও বেশি অর্থ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের জন্য আমাদের দাবী জানাতে হবে।

বামপন্থী দলগুলির ঐক্য আজ একান্ত প্রয়োজন। আমরা যদি কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে হঠাতে চাই এবং কেন্দ্রে স্বতন্ত্র, জনসংঘ ও সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর দক্ষিণপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টাকে রুখতে চাই, তবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলির একটি যুক্তফ্রণ্ট গঠন করতে হবে। সর্বনিম্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে এরূপ একটি যুক্তফ্রণ্ট গঠনের দ্বারাই আমরা কেবলমাত্র বর্তমান অবস্থায় জনগণের সম্মুখে একটি কার্যকরী বিকল্প নেতৃত্ব তুলে ধরতে সক্ষম হব।

আমি জানি, সর্বভারতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের পথে অনেক বাধা রয়েছে। তথাপি আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আজ আমি দেশের সকল প্রগতিশীল দলের কাছে আহ্বান জানাই, আসুন, কেবল সরকার গঠনের জন্যই নয়, মেহনতী মানুষের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য কর্মসূচীর ঐক্যের ভিত্তিতে সর্বভারতীয় একটি যুক্তফ্রণ্ট গঠনে উদ্যোগী হোন।

সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল দলগুলি যুক্তফ্রণ্ট গঠনের প্রস্তাব করলেও একথা আমি মুহূর্তের জন্যও ভুলি নি যে, এই জাতীয় ফ্রণ্ট ও সরকার গঠনের দ্বারা জনসাধারণের কিছু উপকার করা গেলেও জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান এই পথে সম্ভব নয়। ভারতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রায় সমাধি রচিত হয়েছে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আরও বেশি সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। প্রতিদিন কিছু কারখানা বন্ধ হচ্ছে এবং হাজার হাজার নর-নারী বেকার হচ্ছে। নতুন কর্ম-সংস্থানের কোন ব্যবস্থাই বলতে গেলে হচ্ছে না। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর, ক্রমবর্ধমান বিদেশী ঋণের ভারে আমরা নুয়ে পড়েছি। পুঁজিবাদের মধ্যে এই সব সমস্যার কোন সমাধান নেই। সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতিই আজ বাঁচার একমাত্র উপায়। এবং বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমাদের মহান নেতা নেতাজী এই শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন। মার্কস ও লেনিনের শিক্ষাও তাই।

ক্ষেত-খামার, কলকারখানা, অফিস-কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যত্র যে সংগ্রাম চলছে, তাকে আরও সংহত, আরও শক্তিশালী করুন এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা দখল তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হোন। বিশ্বের কোথাও আজ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং ভারতেও আমাদের এ ব্যাপারে কোন মোহ রাখলে চলবে না। নির্বাচনে আমরা অংশ গ্রহণ করব, প্রয়োজনমত সরকারের দায়িত্ব নেব, কিন্তু এ সবই সাময়িক ব্যাপার। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

কিছু বন্ধু মনে করছেন, ভারতে এখন সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের সময় উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা এমন সব কাজ করছেন যার ফলে কার্যত বিপ্লবেরই ক্ষতি হচ্ছে। বিপ্লব সাধনকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বপ্রযত্নে তার জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে।

সহকর্মী বন্ধুগণ, চূড়ান্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হোন এবং দলের সংগঠনকে সেইভাবে গড়ে তুলুন।

ভারত আজ এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। কোন্ পথে সে এগোবে? একমাত্র নেতাজীর আদর্শের মধ্যে ভারতের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথ নিহিত রয়েছে। প্রত্যেকেই আজ সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন। এমন কি মোরারজি দেশাই-এর মুখেও সমাজতন্ত্রের বুলি শোনা যাচ্ছে। আসল প্রশ্ন হল: সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ কি? বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র হতে পারে না। ভারতে সমাজতন্ত্রকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়াতে হবে। এখানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হলে এই দেশের বিশেষ অবস্থার কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। নেতাজীর আদর্শের মধ্যেই আমরা কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র, বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদ, এই তিনটি নীতির একত্র সমাবেশ দেখতে পাই।

নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লককে আজ দেশের সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শের কথা প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, দলের নিঃস্বার্থ ও সংগ্রামী কর্মীরা নেতাজীর পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন এবং দেশকে তার মূল লক্ষ্য সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে পারবেন।

বন্ধুগণ, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আপনাদের কাছে এই আহ্বান জানিয়ে যাই, সম্মেলনের এই কয়দিন বিভিন্ন সমস্যার ওপর গভীরভাবে বিবেচনা করুন এবং তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করুন। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ আপনাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার ভরসা আছে, দেশের সম্মুখে সঠিক পথের সন্ধান তুলে ধরতে আপনারা সক্ষম হবেন।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

নেতাজী জিন্দাবাদ।

জয় হিন্দ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

নেতাজী জন্মদিবস উপলক্ষে হেমন্তকুমার বসুর সর্বশেষ রচনা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকল সংগ্রামে জ্বলন্ত প্রেরণা স্বরূপ। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শাসন অবসানের আন্দোলনে দেশবাসীকে তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ধনিক শোষণের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথনির্দেশ করেছেন। স্বাধীনতা ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র,—জাতির স্বাধীনতা ও ব্যক্তির স্বাধীনতা।

দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদী নেতৃত্বের আপোসমূলক নীতির ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যেদিন শুদ্ধগতি হবার উপক্রম হয়েছিল, সেদিন সুভাষচন্দ্রের আপোসহীন সংগ্রামের কার্যক্রমই দেশবাসীকে পথের সন্ধান দিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সারা দেশ সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। গান্ধীজির নেতৃত্ব এই সংগ্রামী চেতনার গতি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে এবং তারই পরিণতি গান্ধীজি তথা উর্ধ্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতান্তর ও ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন। আপোস নয়, ভিক্ষা নয়, শোষকের শুভবুদ্ধি উদয়ের ভরসার অপেক্ষা নয়, শত্রুর সঙ্গে আপোসহীন সংগ্রামই মুক্তির একমাত্র পথ—সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বামপন্থী সংগ্রাম প্রচেষ্টা, '৪২-এর বিপ্লব, আজাদ হিন্দ ফৌজের

সংগ্রাম ও পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের শ্রমিক নৌ-সৈন্য পুলিশের অভ্যুত্থানের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা এসেছে। শান্তিপূর্ণ পথে, অহিংসার সাহায্যে এই স্বাধীনতা আসেনি। দক্ষিণপন্থা নেতৃত্বে সুবিধাবাদী আপোস প্রচেষ্টার ফল দেশ-বিভাগ ও বিদেশী পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণ।

নূতন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন নেতাজী দেখেছেন। স্বাধীনতার পর ভারতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছাবার কোন সম্ভাবনা নেই। শোষক ধনিক শ্রেণী স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ত্যাগ করবে, এ আশা করা ভুল। একমাত্র বিপ্লবের সাহায্যেই সমাজতন্ত্র অর্জন সম্ভব। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র। মেহনতী মানুষের সংগঠনকে মজবুত করে বিপ্লবের পথে ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই আজকের দিনে নেতাজীর আদর্শ অনুসরণের পথ।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নেতাজী কঠোর সংগ্রাম করেছেন এবং অসীম দুঃখ ও কষ্টের পথ অনুসরণ করেছেন। দাসত্বের মত পাপ আর কিছু নেই; এই দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি জীবন পণ করেছেন। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকার এক বিরাট বিস্ময়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন প্রচেষ্টায় নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরবের অবদান চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। চীনের বর্বর আক্রমণের ফলে ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব আজ বিপন্ন। মত ও পথের পার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্র দেশ চীনা হানাদারদের বিতাড়ন ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে এসেছে। স্বাধীনতা রক্ষার এই পবিত্র যুদ্ধে নেতাজীর জীবনাদর্শ, বীরত্ব ও সংগ্রাম কৌশল আমাদের পথের নিশানা হবে। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং নেতাজীর অগ্নিগর্ভ বাণী দেশবাসীকে মরণপণ অভিযানে অনুপ্রাণিত করবে।

বর্তমান বৎসরে নেতাজীর শুভ জন্মদিবসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। স্বামীজির আদর্শে নেতাজী তাঁর জীবন গড়ে তুলেছেন। যে বিবেকানন্দ বিপ্লবী আন্দোলনের উৎস ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণা এবং যিনি দরিদ্র নিপীড়িতের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন ও আজ থেকে সত্তর বৎসর পূর্বে নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছেন, সেই বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের জীবনের আদর্শ। স্বামীজির ব্যক্তিত্ব, সাহস ও আদর্শ-নিষ্ঠা নেতাজীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্বামীজি ও নেতাজীর আদর্শ

আমাদের নূতন সমাজ গঠনের ভিত্তি হোক। নেতাজী দেশবাসীকে লক্ষ্যে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। তাঁর আহ্বান: "তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব।" আজ ডাক এসেছে এই আহ্বানে সাড়া দেবার।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান পুরোহিত মুক্তি-যোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন স্মরণীয় ২৩শে জানুয়ারী।

জননেতা সুভাষচন্দ্রের জীবন কাহিনী রূপকথার মত রোমাঞ্চকর। আজ বলতে দ্বিধা নেই যে নেতাজীর পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোন নেতা সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপী এতখানি বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পারেন নি। সারা দুনিয়াব্যাপী এত শ্রদ্ধাও অর্জন করতে পারেন নি।

ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক পর্যন্ত এই দীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবনগাথা সারা দুনিয়ার মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। তাঁর নেতৃত্ব দেবার নির্ভুল ক্ষমতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য সারা দেশ তাঁকে নেতার আসনে বসাতে কোন দ্বিধা করেননি।

ত্যাগ, সংযম, লোভহীনতা ও কৃচ্ছ্রসাধনার ভেতর দিয়ে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করার কাজে লিপ্ত রেখেছেন। কেবল মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন সবসময় একটা বৃহৎ কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, দেশের মঙ্গলের জন্য একটা মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে।

তাই তো আমরা দেখতে পাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন দেশ-মাতৃকার সাধনায় উৎসর্গীকৃত। ছাত্রজীবনেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ওটেন সাহেবের ঔদ্ধত্যের ও হীন বক্তব্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড প্রতিবাদ তৎকালীন ইংরাজদের অসভ্য উক্তিগুলিকে যেমন সংযত করতে পেরেছিল তেমনি যুব-সমাজের কাছে নির্ভীক এক নেতার আত্মপ্রকাশকে সুনিশ্চিত করেছিল। জাতীয়তার বিরুদ্ধে বিরূপ আচরণের যেমন তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন তেমনি গণদেবতার পূজারী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গীকৃত সুভাষচন্দ্রকে তাই আই সি এস চাকুরির মোহপাশে বেঁধে রাখা যায় নি। তিনি সে পদ প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রের বহু বীরত্বময় সংগ্রামের কাহিনী সমগ্র ভারত আজও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে। বিশেষ করে ১৯৩০ সালে কলকাতা

কর্পোরেশনের মেয়র থাকাকালীন সময়ে সুভাষচন্দ্রের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে।

১৯৩৯ সাল ভারতের জাতীয় জীবনে এক চরম সন্ধিক্ষণ। সারা দুনিয়াতে তখন যুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। একটা বিরাট মহাযুদ্ধের আভাস নেতাজী বহু পূর্বেই পেয়েছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেসের তৎকালীন আপোসমুখী নেতৃত্বকে চরম আন্দোলনের পথে আগুয়ান হতে আহ্বান জানান। ১৯৩৮ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবেও তিনি ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যাবার জন্য চরম প্রস্তাব করেছিলেন। আবার তিনি কংগ্রেসকে বললেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়েই বিপর্যস্ত বৃটিশ শক্তিকে ভারত থেকে তাড়াবার সুযোগ নিতে হবে। যুদ্ধকালীন অবস্থাকে আমাদের কাজে লাগাতেই হবে।

কিন্তু সেদিনকার আপোসমুখী নেতৃত্ব তাঁর সেই চরম প্রস্তাবে সাড়া দিল না। নেতাজীর অতুলনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় হলো তৎকালীন 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত। ইতিহাস আজ নেতাজীর ভাবদৃষ্টিকে সত্য প্রমাণ করে স্বীকার করেছে যে ১৯৪২ সালে যুদ্ধকালীন সময়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হলো যে ক্রিপস্ প্রস্তাবের ব্যর্থতার পর গান্ধীজিই গ্রহণ করেন নেতাজীর পূর্বতন ভারত ছাড়ো প্রস্তাবটি।

চিরবিদ্রোহী নেতাজী কিন্তু সেদিন অনেক দূরে। ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে।

বৃটিশ সরকারের সদা জাগ্রত প্রহরী এড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের কথা আজ আর কারো অবিদিত নয়। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা কাবুলের পথে তাঁর বার্লিন গমন, জার্মানী ও ইতালীতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ইউরোপে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন, তাতে সফল হবার সম্ভাবনা কম দেখে জার্মান ইউ-বোটে ভারত মহাসাগরে আগমন ও মালয়ে পদার্পণ এবং সেখানে এক শক্তিশালী ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে তাঁরই নেতৃত্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ ফৌজ সংগঠন এবং কোহিমার সংগ্রাম ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসানের সূচনা করেছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আন্দোলন ও সংগ্রামের খবর দেশের ভিতর প্রতি স্তরের মানুষের মনকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করল। যুবসমাজ মৃত্যুভয় ভুলে গিয়ে বৃটিশ

শাসকদের শেষ আঘাত হানবার জন্য এগিয়ে এলো। সমগ্র ভারতবর্ষে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। বোম্বাইয়ে, করাচীতে নৌবিদ্রোহ, কলকাতায় রসিদ আলী দিবসে ছাত্রদের প্রচণ্ড সংগ্রাম, সবই আজাদ হিন্দের আন্দোলনেরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৃটিশ চালিত ভারতের সেনাবাহিনীর ভিতর এই প্রথম ভাঙ্গন দেখা দিলো। লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বীর সেনানীদের বিচার সমগ্র ভারতে যে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলো তাতে ইংরাজ শাসকরা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন—এবং আজাদী সেনানীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। আজাদ হিন্দের আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, '৪২ সালের গণ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইংরাজকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেছিলো। তারই ফলে '৪৭-এর ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসের নিকট বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করল।

পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পর দেশে শ্রেণীহীন শোষণহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠাই নেতাজীর ব্রত ছিল।

সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয় জনতার হাতে তুলে ধরবার মঙ্গল ব্রত ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে সমাজতান্ত্রিক। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পরিণতিই সমাজতন্ত্র এটা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নীতিই সুভাষচন্দ্রকে তৎকালীন আপোসমুক্তি, ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিলো। এবং যার ফলে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিলো।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তাঁর বক্তৃতায় তিনি দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন, "আপনাদের জানা প্রয়োজন আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্য দুটি। প্রথমটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এটি জাতীয় বিপ্লব। অপরটি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, এটি সমাজ বিপ্লব। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমস্ত আপোসহীন সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী শক্তিকে সংহত রূপ দিতে এবং দ্বিতীয় ধাপে শোষণহীন এক সমাজ কায়েম করতে গিয়ে তিনি যে কার্যপন্থা ঘোষণা করেছিলেন ('বামপন্থার অর্থ' কাবুল, ১৯৪১) তা হলো, (১) একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, (২) দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ভারী শিল্পোৎপাদন, (৩) উৎপাদন ও বণ্টনের সামাজিকীকরণ, (৪) ধর্মের বিষয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা, (৫) সকলের সমান অধিকার, (৬) ভারতীয় জনগণের সকল অংশের ভাষাগত ও সংস্কৃতি-

গত স্বাধীনতা ও (৭) স্বাধীন ভারতে নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমতা ও সামাজিক ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হতে আজ পর্যন্ত দেশে কি হয়েছে ও কি হয়ে চলেছে, তার ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয় বলেই সেদিক থেকে বিরত থেকে শুধু প্রতিটি মানুষকে আজ নেতাজীর আদর্শকে ও পরিকল্পনাকে সার্থক করবার জন্য আহ্বান জানাই। আহ্বান জানাই সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটাবার জন্য। শ্রেণীসমস্যার সম্পূর্ণ ও চিরতরে অবসান ঘটিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে নেতাজীর স্বপ্নকে সফল করতে হবে।

ভারতে শ্রেণীহীন, শোষণহীন, নেতাজীর আদর্শের সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হউক—আজকের দিনে এই আমাদের সবাইকার কাম্য। নেতাজীর জীবনের মূল স্বপ্নকে সার্থক করে তোলাই আমাদের ভারতবাসীর আজকের সবচাইতে বড় কাজ।